

আমাদের চিনচর্চা

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

সূচি

আমাদের চিনচর্চা

ভৌগোলিক ও মানসিক নৈকট্য সত্ত্বেও বাঙালি ও চিনাদের মধ্যে ভাবের ও ভালোবাসার দূরত্বের সম্বন্ধে আমরা আজও তেমন মাথা ঘামাইনি।

অবশ্য চিনা সভ্যতা সম্পর্কে একটা চাপা শ্রদ্ধা মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে বহুদিন ধরেই লক্ষ করা যায়। সেইসঙ্গে প্রচারিত রয়েছে এক-আধজন বৌদ্ধ শিক্ষকের কথা যাঁরা দুর্গম গিরি কান্তার মরু পেরিয়ে একসময় ভগবান বুদ্ধের বাণী দুর্লঙ্ঘ হিমালয়ের অপরপারে সুদূর চিনে প্রচার করেছিলেন।

সাধারণ বাঙালিদের কাছে বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্করের কথা অজানা না হলেও তাঁর বিচিত্র জীবনকথা ও রোমাঞ্চকর ভ্রমণের বিবরণ তেমনভাবে জানা নেই। কোনো বাঙালি লেখকও একালে তাঁর বিচিত্র জীবনকথাকে তেমনভাবে ভুবনসন্ধানী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ করে তোলেননি। সে তুলনায় বৃহৎবঙ্গের বিশ্ববন্দিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এবং সেখানকার চৈনিক সাধক ও গবেষকদের কথা আমরা একটু বেশি জানি। সেইসঙ্গে আরও জানি চিনদেশের পরিব্রাজকদের জীবনকথা ও তাঁদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর কথা।

বুদ্ধের সময় থেকে বৃহৎবঙ্গের যেসব সন্ন্যাসী তথাগতের বাণী প্রচার ও মানবসেবার জন্য জীবন তুচ্ছ করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, ধৈর্য ধরে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথাগুলি সংগ্রহ করলে পৃথিবীর নানা দেশ, বিশেষ করে চিন সম্বন্ধে আমরা কত কথা জানতে পারতাম, প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি কত বিস্তৃত হতে পারত। এইসব ভুবনবিজয়ী ভারতীয় প্রচারকরা নতুন দেশের নতুন কথাগুলি

নিজের মতো করে আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেননি তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তাঁদের তুলনায় চিনের আগন্তুকরা কি ভারতসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে অনেক এগিয়ে আছেন?

মাঝামাঝি পথে আমার ভাবতে ইচ্ছে করে, ভারতের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দূতদের হারিয়ে-যাওয়া রচনাগুলি ঠিকমতন উদ্ধার করতে আমরা তেমন চেষ্টা করিনি। এরজন্য বিশ্বের নানা স্থানে, বিশেষ করে চিনে যে বিপুল অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন তাও হয়নি। আরও একটা কারণ হতে পারে, যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় যেসব দুর্লভ রচনা অতি যত্নে রক্ষিত হয়েছিল তা একসময় বিদেশের আক্রমণকারীরা অকারণে ধ্বংস করে আমাদের অতীতচর্চাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়ে। অচলাবস্থা থেকে শান্তভাবে বেরিয়ে এসে পুরনো ঘটনাবলীকে আবার সাজিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু ধৈর্যসাধ্য প্রচেষ্টাকে আমরা আজও তেমন গুরুত্ব দিতে উৎসাহী হইনি। পৃথিবীর অন্য সবায়ের মতন ইদানীং আমাদের নজর কেবল বিদেশ বাণিজ্য থেকে কত বিদেশি মুদ্রা উপার্জন হল তার ওপর।

আমাদের চিনচর্চার ক্ষেত্রেও বোধহয় একই ঘটনা ঘটেছে। বিরাট বিরাট দুর্বোধ্য গ্রন্থমালার মধ্যে হাজার হাজার বছরের এক তুলনাহীন সম্পর্কের ইতিবৃত্ত উদ্ধারের পথে আমরা যাইনি। এমনকি চিনের সঙ্গে আমাদের রোমাঞ্চকর আদানপ্রদানের একটা সহজবোধ্য বিবরণও আমাদের সামনে নেই।

চিনের সঙ্গে আমাদের বিস্ময়কর আদান-প্রদানের সবচেয়ে বোধযোগ্য বিবরণটি পেয়েছি জনৈক চিনা অধ্যাপকের কাছ থেকে। এই ভাষণটির রচনাকাল ১৯২৪, উপলক্ষ কবি রবীন্দ্রনাথের চিনভ্রমণ। চিনযাত্রী রবীন্দ্রনাথ সেবার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মানুষের ছোট্ট দলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দলে ছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ, বিশ্বনাগরিক লিওনার্ড এলমহার্স্ট প্রভৃতি।

মঙ্গলবার ১৮ মার্চ ১৯২৪ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে

চিনযাত্রার উদ্দেশে কলকাতা রওনা হন।

গবেষক প্রশান্তকুমার পাল তখনকার আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে আরও কিছু বিবরণ দিয়েছেন। "পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের চিনভ্রমণ ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের খরচ বহন করিবেন। কবির অন্যান্য দেশ ভ্রমণের ব্যয় ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের পাথেয় খরচ নির্বাহার্থ বাবু যুগলকিশোর বিড়লা দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।... শ্রীযুত নন্দলাল বসুর পথ খরচ আংশিক বিশ্বভারতী ও আংশিক ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উন্নতিকামী ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য হইতে নির্বাহ করা হইবে।" *এলমহার্স্ট ও গ্রেচেন গ্রিনের খরচ ডরোথি স্ট্রেট প্রদত্ত সুরুল* ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। লিমডির রাজকুমার নিজ ব্যয়ে সহযাত্রী হয়েছিলেন। সেবার ঠিক ছিল রবীন্দ্রনাথ চিন ছাড়াও জাপান, ইন্দোচিন, কাম্বোডিয়া, শ্যাম ও জাভা ভ্রমণ করবেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত চিন ও জাপান ছাড়া অন্য দেশগুলি ভ্রমণ সম্ভব হয়নি।

আউটরাম ঘাট থেকে ২১ মার্চ ১৯২৪ ইথিওপিয়া জাহাজে চিনের পথে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আগের দিনে রবীন্দ্রনাথ আলিপুরের এক সভায় বলেন, বয়স বাড়ছে, স্বাস্থ্যও ভালো নয়, দূর ভ্রমণ তাঁর কাছে কষ্টকর, তবু এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, এই ভ্রমণ চিন ও ভারতের মধ্যে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

বিশিষ্ট যাত্রীদের নিয়ে ১২ এপ্রিল সকালে জাহাজ চিনের সাংহাই বন্দরে পৌঁছয়।

১৩ এপ্রিল রবিবার দুপুরে সাংহাই-এর শিখ গুরুদ্বারে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভারতবর্ষ থেকে যারা এসেছে, ঋষিদের প্রেমের ধর্ম ও তাদের মহত্ত্ব প্রচার করতে যারা এসেছে তারা ভারতবর্ষের সঙ্গে চিনকে বহুরকম আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধেছে, যা জগতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কোনো বাণিজ্যের শক্তি নেই, রাষ্ট্রের শক্তি নেই, তেমন করে প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে পারে।...চিনে ভারতবাসী যারা এসেছে তাদের কাজ, সেবা এবং আদর্শ দেখে চিনাবাসী যেন কৃতজ্ঞচিত্তে ভারতের নাম স্মরণ করে।

একই দিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা হয় কয়েকজন শিক্ষিত চিনা মহিলা ও পুরুষের। যুবসমাজের প্রতিনিধি ফু সী-মো বলেন, রবীন্দ্রনাথ এসেছেন চিনের এক সঙ্কটজনক সময়ে যখন সে নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের দোলাচলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে—তিনি আশা করেন রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, গভীর দর্শন ও সজীব কবিতা তাকে সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে।

প্রত্যুত্তরে কৌতুকের সুরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন কবি ছাড়া আর কিছু নন—কারণ তিনি গান লিখে সময় নষ্ট করেছেন যখন তাঁর উচিত ছিল চিনের জন্য বক্তৃতা রচনা করা। কবিরা বসন্তবাতাসের মতো অর্থহীন যাওয়া-আসা করে থাকে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যহীনতার জন্য পৃথিবীর কোনো লোকসান হয় না।...বহু শতাব্দী জুড়ে এদেশে বণিকরা এসেছে, সৈনিকেরা এসেছে। এসেছে আরও কত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি—কিন্তু তাঁর আগে আরও কোনো কবিকে আমন্ত্রণ করার কথা কেউ ভাবেনি।

প্রয়াত প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনীর নবমখণ্ডে আমরা দেখছি, বাংলা নববর্ষের প্রথমদিনে ১৪ এপ্রিল ১৯২৪ আমাদের কবিগুরু সাংহাইতে। তিনি বেশ উৎসাহী, "এদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হবে।"

ওইদিনেই রবীন্দ্রনাথ চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী হাংচৌ পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গীরা নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে প্রাচীন বৌদ্ধমঠ দেখতে যান। কথিত আছে, বোধিজ্ঞান বা হুইলি নামে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী এই ঐতিহাসিক বৌদ্ধমঠের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ১৬ এপ্রিল ১৯২৪ চিনের কয়েক হাজার ছাত্রকে বললেন, "তিনিও পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধি হিসাবে একই প্রীতির বাণী বহন করে এখানে এসেছেন। সেই ভক্ত এখানে এসে একটি পাহাড় দেখে মনে করেছিলেন, তাঁর দেশের গৃধ্রকূট পাহাড়টি যেন উড়ে চলে এসেছে—এমনই তার সাদৃশ্য। তাঁরও এখানকার পাহাড় গাছপালা দেখে একই কথা মনে হচ্ছে, হৃদয়বিনিময়ের অসুবিধার কারণ শুধু ভাষার পার্থক্য।"

ফু সী-মোকে রবীন্দ্রনাথ (২০ এপ্রিল) নানকিং-এর এক হোটেলে বলেন, "তোমরা যে বেড়াপাকে পড়েছ, তা থেকে কেবলমাত্র কোনরকমে মুক্তি পেতে চেষ্টা না করে সেই মুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষকে মস্ত শিক্ষা দিতে পার যদি নন-ভায়োলেন্ট নন-কোঅপারেশন নীতি তোমরা একবার প্রয়োগ করে দেখ : যারা তোমাদের কাপুরুষের মত ঘিরে লুট করছে, মারছে—তাদের শিক্ষা যদি তোমাদের হাতে হয়—তাহলে সমস্ত পৃথিবী তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

রবীন্দ্রনাথ সেবার চিনের ছাত্রদের বলেন, প্রাচীন ভারত ব্যবসায়ীদের বা সৈন্যদের পাঠায়নি, পাঠিয়েছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের এবং সেই সঙ্গে তার শ্রেষ্ঠ উপহারসমূহ। অর্থাৎ পথ নির্মাণই ছিল প্রাচীন ভারতের ব্রত—ব্যবসার জন্য নয়, ক্ষমতার জন্য নয়, দূরদেশের ভ্রাতাদের অন্তরে পৌঁছনোর জন্য। আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে দূর অনেক সহজে নিকটে চলে এসেছে, কিন্তু পারস্পরিক সহজ সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্য গেছে হারিয়ে। এটি সবসময়ই ক্ষতিকর যখন আমরা কাছাকাছি আসি অথচ মিলিত হই না।

শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবেন, এই ভ্রমণ থেকে চিন যদি ভারতের কাছে এবং ভারত যদি চিনের আরও কাছে চলে আসে—কোনো রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক কারণে নয়, কেবল 'for disinterested human love and for nothing else.'

পরবর্তী পর্যায়ে দেখছি, চিনা যুবকরা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে তেমন ভালোভাবে নেননি। এক পরাজিত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ছাপানো প্রচারপত্র বিলির মধ্যে তাঁরা বিশিষ্ট অতিথিকে নানা সভায় ধিক্কার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আবশ্য এই বিরোধিতাকে গুরুত্ব দেননি, "বয়সের বিপুল দূরত্ব" থেকে তিনি চিনা ছাত্রদের আশীর্বাদ জানিয়েছেন। ছাত্রদের কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা, নতুন যুগকে তাঁরা কোন অর্ঘ্য প্রদান করবেন? তিনি শুনেছেন, তাঁরা বস্তুবাদী, তাঁদের আশাকে কোনো স্বপ্নলোকে

পাঠাতে চান না।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সভায় যেসব নিন্দামূলক ইশ্‌তেহার প্রচার হতো তার কিছু বাংলা অনুবাদ এখন সহজলভ্য। কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে কাজে লাগতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকজন জাপানির সাহায্যে এগুলির বক্তব্য জানতে পারেন।

শিশিরকুমার দাশ ও তান ওয়েনের প্রদত্ত বাংলা অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি :

১. প্রাচীন চিনের সভ্যতার কাছে আমরা যথেষ্ট পেয়েছি, আর পেয়ে কাজ নেই। এই সভ্যতা মানুষকে শোষণ করে রাজাকে বড় করেছে, মেয়েদের পদানত করেছে, পুরুষকে দিয়েছে সব অধিকার, তোষণ করেছে অভিজাত সামন্তদের। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই সভ্যতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। তাই আমরা তাঁর বিরোধিতা করি।

২. আমাদের কৃষি চাষীর ক্ষুধা নিবারণে অক্ষম, আমাদের শিল্প কুটিরশিল্প মাত্র, আমাদের নৌকা, আমাদের যানবাহন দিনে কয়েক মাইলের বেশি যেতে অসমর্থ, আমাদের ভাষা, আমাদের লিখন পদ্ধতি এখনও আদিম, আমাদের পথঘাট, আমাদের শৌচাগার, আমাদের রন্ধনশালা পৃথিবীর চোখে হাস্যকর। অথচ রবীন্দ্রনাথ বস্তুসভ্যতার আধিক্যের জন্য আমাদের তিরস্কার করছেন। তাই আমরা তাঁর প্রতিবাদ করতে বাধ্য।

৩. রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন আত্মিক সভ্যতা তার ভয়াবহ রূপ আমরা প্রাচীন চিনে দেখেছি—অকারণ যুদ্ধ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, মিথ্যাচার, বঞ্চনা, লালসা, নির্লজ্জ বেশ্যাবৃত্তি, লুব্ধ ধনীর রক্ত পান, বাপ-মাকে খাওয়ানোর জন্য ধার্মিক সন্তানের নিজের শরীরের মাংস কেটে দেওয়া, পরাজিতের মাথার খুলিতে মদ্যপানের উল্লাস, পা বিকৃত করে মেয়েদের সুন্দরী বানাবার চেষ্টা। এই প্রাচীনের দিকে ফিরতে বলছেন রবীন্দ্রনাথ।

৪. চিনের বর্তমান দুর্দশার কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিকদের ঔদাসিন্য। তার ফলেই জঙ্গী শাসক ও বিদেশী শক্তি আমাদেব নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন আমরা নাকি ঐসব ব্যাপারে

বড় বেশি বিব্রত। তার মানে জাতীয়তার দরকার নেই। সরকারের দরকার নেই। দরকার শুধু আত্মার সন্ধান।

৫. আমাদের দেশে ইন এবং ইয়াঙ্ তত্ত্ব ছিল, তাও ছিল, কনফুশিয়ান তত্ত্ব ছিল। এখন এসেছে 'হারমনিয়াস ভার্চু সোসাইটি', 'স্পিরিচ্যুয়াল কালচার অ্যাসোসিয়েশন' এবং খ্রীষ্টতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ব্রহ্মের কথা—আত্মার মুক্তির কথা। এই অকর্মণ্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি। আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি।

স্টিফেন হে-র গ্রন্থে শেষাংশটি আর-একটু বিস্তৃত : 'Therefore we protest, in the name of all the oppressed peoples, in the name of all the persecuted classes, against Mr. Tagore, who works to enslave them still more by preaching to them patience and apathy. We also protest against the semi-official literati who have invited Mr Tagore to come to hypnotize and drug out Chinese youth in this way, these literati who use his talent to instill in Young China their conservative reactionary tendencies.'

১৩ মে ১৯২৪ ক্ষিতিমোহন সেন বিদেশ থেকে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন :

"...চীনের ছোকরাদের মধ্যে এসে পড়েছি—এরা ঘোরতর যন্ত্রনেশায় মত্ত। সবই এদের মেশিন যন্ত্র—ও তারই পূজা করছে--এবং রাজনীতির ঘুরপাক থেকে উচ্চতর স্বর্গ এদের নেই।. ."

রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন, পূর্ব ঘোষণামত রবীন্দ্রনাথ ১৮ মে ১৯২৪ পিকিঙে আসেন। আকস্মিকভাবে পিকিঙ ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী তাঁর কাছে কিছু শোনার আবেদন জানান।

এঁদেরই মতো কিছু তরুণ-তরুণীর অভব্যতায় বিরক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত তিনটি বক্তৃতা বাতিল করে পিকিঙ ত্যাগ করেছিলেন।

কয়েকদিন পরে হ্যাংকৌতে যুব ছাত্রদের একসভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিনে আসার দুটি কারণ ব্যক্ত করেন—প্রথমত চিনের যুবকদের সঙ্গে

পরিচিত হওয়া ও দ্বিতীয়ত ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ থাকার জন্য চিনের পুরানো সভ্যতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ। কিন্তু কবির ভাষণ শেষ হওয়ামাত্র একদল ছাত্র চিৎকার করতে থাকেন—পরাধীন দেশের দাস, ফিরে যাও ; আমরা দর্শন চাই না। বস্তুবাদ চাই।

রবীন্দ্রনাথের চিনে পৌঁছনোর আগে অধ্যাপক লিয়াঙ শি চাও যে অনবদ্য মুখবন্ধটি লিখেছিলেন আমার কাছে তা চিন-ভারত সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ রচনা। কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে এই লেখক যমজভ্রাতা ভারত ও চিনের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ছবিটি এঁকেছেন তা এককথায় তুলনাহীন। দুই দেশের সম্পর্ক হাজার হাজার বছরের, কিন্তু সম্রাট অশোকের আগের পর্ব সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না।

অধ্যাপক শি চাও স্মরণ করেছেন, সম্রাট অশোক বিদেশে যেসব মিশনারিদের পাঠিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন অবশ্যই চিনে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে দশজনকে জেলে পোরা হয়েছিল এবং রাজকীয় আদেশে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল।

পরবর্তী আটশ বছরের ইতিহাস কিন্তু গৌরবোজ্জ্বল। এই সময়কালে সাঁইত্রিশজন সম্মানিত ভারতীয় অতিথির কথা জানা যায়। ২৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ১৮৭ জন চিনা. এর মধ্যে ১০৫ জনের নাম চীনা ঐতিহাসিকরা সযত্নে সংগ্রহ করেছেন। ভারত থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ধর্মরক্ষ, বুদ্ধভদ্র ও জিনভদ্র।

বিশ শতকের বিভ্রান্তিকর সময়ের উল্লেখ করে অধ্যাপক শি চাও বলছেন, এখন যেসব 'সুসভ্য' জাতির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হচ্ছে তারা আমাদের মাটি ও সম্পদ কেড়ে নিতে চায়, তারা আমাদের রক্তরঞ্জিত কামানের গুলি উপহার দিতে আগ্রহী, তাদের কলকারখানায় যেসব জিনিস তৈরি হয়ে আমাদের দেশে পাঠাচ্ছে তার ফলে সাধারণ লোকের রুজি-রোজগার বন্ধ হওয়ার মুখে। কিন্তু ভারত-চিনের ভ্রাতৃত্ব কখনও ওই পথে যায়নি। সম্পর্কের রেশ টেনে চিনা অধ্যাপক ভারতকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার আসনে বসিয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, বড় ভাই

ইতিহাসের নানা পর্যায়ে ছোটভাই চিনকে কি দিয়েছে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—ভারত দিয়েছে 'অ্যাবসলিউট ফ্রিডম' ও 'অ্যাবসলিউট লাভ'-এর শিক্ষা ও দীক্ষা। সাত হাজার বৌদ্ধ মহাগ্রন্থের উল্লেখ করে অধ্যাপক শি চাও বলেছেন, এই সাত হাজার খণ্ড থেকে মূল শিক্ষা : To Cultivate sympathy and intellect, in order to attain absolute wisdom, and absolute love through pity.

অসাধারণ এই বক্তৃতায় চিনের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ, সাহিত্য এবং আর্ট-এ ভারত যা উপহার দিয়েছে তা তুলনাহীন। ভারতীয় ঋষিরা এই জ্ঞান বহন করে এনেছেন নানা শিল্পকীর্তি ও গ্রন্থের মাধ্যমে। ভারত থেকে ফেরার সময় চিনা পণ্ডিতরাও নানা জিনিস সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। যেসব বই অনুবাদ হয়েছে তার মাধ্যমে আমরা ভারতীয় 'প্রজ্ঞার' সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

ভারতের স্থাপত্যবিদ্যাও যে চিনকে প্রভাবিত করেছে তারও স্বীকৃতি রয়েছে শি চাও-এর বক্তব্যে! স্পষ্ট বলা হচ্ছে, প্যাগোডা জিনিসটি পুরোপুরি ভারতীয়, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক হবার আগে প্যাগোডা ব্যাপারটা চিন জানতোই না। বেজিং-এ স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনটি একটি প্যাগোডা, এটি তৈরি হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্যেও ভারতের ঋণ স্বীকার করতে দ্বিধা ছিল না তাঁদের যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে চিনে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁদের প্রকাশ্য স্বীকৃতি : "We probably owe the very foundation of our Chinese painting to Indian influence"

পণ্ডিতরা সবিনয়ে স্বীকার করছেন পাথরের ওপর খোদাই এনগ্রেভিং আমাদের ছিল, কিন্তু ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য বৌদ্ধধর্ম আসবার আগে আমাদের জানা ছিল না।

নাটকের কথাও একইরকম। সবচেয়ে প্রাচীন অপেরা পো চুর পিছনে আছে পাতো বলে এক দেশ। এই দেশের খোঁজ পেয়েছেন পরবর্তীকালের গবেষকরা, তার অবস্থিতি দক্ষিণ ভারতে। যে দুটি বই অনুবাদের মাধ্যমে চিনের হৃদয় স্পর্শ করেছিল তার একটি হলো শাক্যমুনির জীবনকথা। লেখক বিখ্যাত এক ভারতীয় কবি, চিনে তাঁর

পরিচয় মা মিং বলে, আসল ভারতীয় নামটা জানা যায়নি। শুধু কাব্য নয়, চিনা উপন্যাসের আদিতেও তো ভারতবর্ষ।

বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ওষুধ-পত্রেও ভারত ও চিনের যৌথ প্রচেষ্টা যে চিনকে সমৃদ্ধ করেছে তা পণ্ডিতরা সবিনয়ে স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের চিন ভ্রমণের সময় অধ্যাপক লিয়াং শি চাও-এর প্রারম্ভিক মন্তব্যটি আমার মনে হয় আমাদের দেশের সকলের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। সুদূরের চিনকে সকলের খুব কাছে আনতে এই রচনাটি আজও তুলনাহীন।

এবার রবীন্দ্রবিরোধিতার আরও একটু খবর নেওয়া যাক। আগে ঠিক হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার (12-15 May 1924) প্রতিদিন সকালে একটি করে বক্তৃতা করবেন, কিন্তু প্রতিবাদের আলোকে ঘোষণা করা হলো, সোমবারের পরে বাকি বক্তৃতাগুলি তিনি বাতিল করে দিচ্ছেন।

প্রায় দু'হাজার তরুণতরুণীদের সামনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "প্রাচ্যের তরুণ প্রজন্ম প্রায় সর্বত্র আধুনিকতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তারা ধরে নিয়েছে পাশ্চাত্যের জীবনধারাই আধুনিক। সেই আচরণ ও ঘনিষ্ঠতার মধ্যে তারা খুঁজছে আধুনিক হবার পথ। তারা বিশ্বাস করে যে, যাকে আধুনিকতা বলা হচ্ছে তার মধ্যেই রয়েছে প্রগতির সম্ভাবনা ও স্বাধীনতা—এর নামই যৌবন ও জীবন।"

এরপরে রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে জানা দরকার, আধুনিকতা কোনো বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ নয়, তা নিহিত আছে বিশেষ এক সত্যে—যার অভাবে আধুনিকতম নকশা ও চাকচিক্য সত্ত্বেও তা প্রকৃতপক্ষে সেকেলে ও বিনষ্টির সম্মুখীন। কালের গতিকে বুঝতে না পেরে এই কারণেই অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে।"

এরপরে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, "যা গভীর ভাবে মানবিক তা কখনও তো পুরনো হয় না। It has the perpetual freshness of imperishable

life. কিন্তু পশ্চিমি ক্ষুধার্ত জাতগুলি গত এক শতাব্দী জুড়ে পূর্ব গোলার্ধের দেশগুলির সম্পদ অপহরণ ও তাদের অপমান করেছে, কি করে বিশ্বাস করা যাবে তারাই জীবনরহস্যের অসীমতার সন্ধান লাভ করেছে। তারা এসেছে এবং বাইরে থেকে গিয়েছে।"

এই বক্তৃতার পরেই ডাক্তারের উপদেশে সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে রবীন্দ্রনাথ পিকিংয়ের বাইরে চলে যান। কবির তখনকার মনোভাব স্পষ্ট করে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ১৩মে ১৯২৪ লেখেন," চীনের ছোকরাদের মধ্যে এসে পড়েছি, এরা ঘোরতর যন্ত্রনেশায় মত্ত। সবই এদের মেশিন যন্ত্র—ও তারই পূজা করচে—এবং রাজনীতির ঘুরপাক থেকে উচ্চতর স্বর্গ এদের নেই।"

বহু স্থান ঘুরে, বহু সভাসমিতি করে রবীন্দ্রনাথ চিনের সাংহাই বন্দর ত্যাগ করেন ৩০ মে ১৯২৪। বিদায়ের আগে এক প্রবীণ চীনা বলেছিলেন, "যে-ভারত বুদ্ধকে ও তাঁর ধর্মকে আমাদের উপহার দিয়েছে, সেই দেশেরই আর এক অবতারের মধ্য দিয়ে সেই শাশ্বত সত্য আবার শোনা গেল। এরজন্য আমরা কৃতজ্ঞ ও ধন্য হয়েছি।"

চিনভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঘটনাবিহীন হয়নি। যুবকদের এক সভায় এক সপ্তাহ আগে তিনি বলেছিলেন, তাঁর চিনে আসার দুটি কারণ—প্রথমত, চিনের যুবকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ থাকার জন্য চিনের পুরানো সভ্যতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্রই একদল যুবক উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল : 'পরাধীন দেশের দাস, ফিরে যাও। আমরা দর্শন চাই না, বস্তুবাদ চাই'।

উত্তরে আর একটি সভায় আমাদের কবি জোর করে বললেন, "আমায় তোমরা অসময়ে ডেকেছিলে, তোমাদের মন এখন রয়েছে success—material prosperity at any cost এর রাজ্যে। আমি বলছি, চিরদিন আমাদের মহাপুরুষেরা বলেছেন—যা চাইবে তা হয়তো পাবে—ভালো করেই পাবে, তবু সমূলে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা হয়তো পাবে না।"

চিনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণগুলি এখন একত্রে পাওয়া যায়। এগুলি বারবার পড়ে আমি আজও খুব আনন্দ পাই।

'টু মাই হোস্টস' নামক একটি ভাষণে এশিয়ায় ইউরোপের ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন।

"একসময় বর্বরদের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষে করেছিল এই এশিয়া। তারপর কেমন করে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল জানি না। আমাদের প্রবেশদ্বারে ধাক্কাধাক্কিতে যখন আমাদের ঘুম ভেঙে গেল তখন ইউরোপকে স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। —এই ইউরোপ এসেছিল তার দৈহিক শক্তি ও মেধার ঔদ্ধত্য নিয়ে। এই পশ্চিম তার শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি দিতে আসেনি, এসেছিল আমাদের সেরা সম্পদগুলির সন্ধানে, আমাদের শোষণ করে আমাদের শাসন করবার জন্য। আমাদের সর্বস্ব হরণের জন্য আমাদের বাড়ির অভ্যন্তরে তারা ঢুকে পড়েছিল। ইউরোপ এইভাবে এশিয়া জয় করে। ...আমরাও ইউরোপের প্রতি অবিচার করেছিলাম, কারণ ইউরোপকে আমরা সমান-সমানভাবে সাক্ষাৎ করিনি। সম্পর্কটি ছিল উচ্চের সঙ্গে নিচের। একদিকে অপমান, অন্যদিকে হীনমন্যতা। আমরা ভিখিরির মতন অনেককিছু গ্রহণ করেছি। আমরা তখন ভেবেছি, আমাদের নিজস্ব কিছু নেই। আমাদের মধ্যে ছিল আত্মবিশ্বাসের অভাব। আমাদের নিজস্ব সম্পদগুলি সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম না। এই ঘুম থেকে আমাদের জেগে উঠতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে আমরা ভিখিরি নই। এইটাই আমাদের আশুদায়িত্ব। আমাদের নিজের ঘরেই যে মৃত্যুহীন সম্পদগুলি রয়েছে তা খুঁজে বার করতে হবে। তবেই আমরা রক্ষা পাব, পৃথিবীও রক্ষা পাবে।"

সাংহাই ছেড়ে জাপান যাবার পথে ২৯ মে ১৯২৫ চিনা বুদ্ধিজীবীরা কবিকে এক বিদায় সংবর্ধনা জানান। সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিক্ততা চেপে রাখেননি।

সাংহাইতে তিনি বললেন, তোমাদের কিছু দেশপ্রেমীর ভয় ছিল আমি

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার রেশ তুলে তোমাদের অর্থপ্রীতি ও বস্তুবাদে দুর্বলতা ঢুকিয়ে দেবো। যারা উদ্বিগ্ন এই ব্যাপারে তাদের আমি আশ্বাস দিতে চাই আমার কোনো দুরভিসন্ধি নেই। তাদের গতি শ্লথ করবার শক্তি আমার নেই, তারা যখন বাজারে গিয়ে যে আত্মায় তাদের বিশ্বাস নেই তা বিক্রি করে দিতে চায় তাদের আটকে রাখতেও আমি অসমর্থ। তিনি তাদের আশ্বস্ত করতে চান, একজন অবিশ্বাসীকেও তিনি বোঝাতে পারেননি তার আত্মা আছে বা বস্তুশক্তির চেয়ে নৈতিক সৌন্দর্যের মূল্য বেশি।

৩০ মে ১২২৪ তাঁর জাহাজ সাংহাই-মরু সাংহাই ছেড়ে জাপানের নাগাসাকীর উদ্দেশে রওনা হয়। প্রায় একমাস পরে (২৬ জুন) তিনি জাহাজে আবার সাংহাই বন্দরে ফিরে আসেন। ২৮ জুন তিনি সাংহাই ছেড়ে হংকং-এর উদ্দেশে যাত্রা করেন।

১৯২৯ সালে জাপান ও মার্কিনদেশ ঘুরে রবীন্দ্রনাথ আর একবার সাংহাই আসেন, কবি দম্পতি জু জিমো ও তাঁর স্ত্রী লু জিয়াওম্যান তাঁকে নিজেদের বাড়িতে রাখেন।

চিন-ভারত সংস্কৃতিক আদানপ্রদানের চমৎকার একটা ছবি এঁকেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁর কিছু মূল্যবান রচনায়। প্রথম চাইনিজ তীর্থযাত্রী ফা-হিয়েন কয়েকজন সন্ন্যাসী সহ ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে কোন দুর্গমপথে ভারতযাত্রা শুরু করে গিলগিট উপত্যকায় এসেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। একশ বছর পর আর এক চিনা যাত্রীর বর্ণনাও রয়েছে। তিনি অবশ্য গিলগিট থেকে কাশ্মিরের পথ না ধরে স্বাত উপত্যকা ধরে গান্ধারে পৌঁছেছিলেন। হিউয়েন সাং ভারতে পৌঁছবার (৬২৯ খ্রিস্টাব্দে) কিছু আগে উল্টোপথের যাত্রী নালন্দার ভারতীয় সন্ন্যাসী প্রভাকর মিত্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ইনি পরে চিনের সম্রাটের কাছ থেকে সর্বোত্তম সম্মান পেয়েছিলেন।

আর এক চিনা তীর্থযাত্রী উ-কং ৭৫১ সালে চিন ছেড়ে কূটনৈতিক দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এসেছিলেন।

ইচ্ছে হলে আরও এক হাজার বছর পিছিয়ে যাওয়া যায় সহজেই।

হিউয়েন সাং উল্লেখ করেছেন—বুদ্ধের প্রথম দুই গৃহী শিষ্য মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে এসেছিলেন—এঁদের নাম ত্রপুষ ও ভল্লিক। এঁরা বল্লিক দেশের বণিক। বুদ্ধের সময়েই এঁরা বৌদ্ধগয়ায় বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন। বিদায়কালে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁদের নিজের নখকণা ও চুল উপহার দিয়েছিলেন।

আরও দু'জন প্রাতঃস্মরণীয় প্রচারকের নাম কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন। এঁদের প্রায় একশ বছর পরে আমরা আর এক মহাপণ্ডিতের (১৪৭ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ পাচ্ছি, এঁর নাম লোকক্ষেম। তৃতীয় শতকের আর এক বহুভাষী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম ধর্মরক্ষ, ইনি নাকি ছত্রিশটি ভাষা জানতেন।

তৃতীয় শতকের আর এক স্মরণীয় নাম সেং-হুই (সঙ্ঘমতি), এঁর পিতৃপুরুষরা ভারতবর্ষে সংসার পেতেছিলেন। এই শ্রেষ্ঠীপুত্র একসময় নানকিং-এ আসেন এবং সেখানে একটি সংঘারাম ও একটি স্কুল স্থাপন করেন।

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে কি ধরনের বিপদ আসতে পারতো তার উল্লেখ করেছেন হিউয়েন সাং। তক্ষশিলার খ্যাতনামা বৌদ্ধপণ্ডিত কুমারলতার সুনাম শুনে তাঁকে জোর করে নিজের দেশে আনিয়েছিলেন চিনের এক গুণগ্রাহী নরপতি, নির্দেশ সেখানেই তাঁকে অধ্যাপনা করতে হবে। এই খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন অশ্বঘোষ, নাগার্জুনের সমসাময়িক। এঁর একটি বইয়ের নাম কল্পনামন্দিটিকা।

চতুর্থ শতকে এক এন-আর-আই ভারতীয় পণ্ডিতের নামও পাওয়া যাচ্ছে। এঁর নাম কুমারজীব। ইনি কাশ্মীরে গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। বিদেশে ফিরে গিয়ে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বেদধ্যয়ন করেছিলেন। স্থানীয় নরপতি সো-কিউয়ের দুই পুত্রকে (সূর্যভদ্র ও সূর্যসেমা) তিনি শতশাস্ত্র ও মাধ্যমিকশাস্ত্র পাঠ করিয়েছিলেন।

আরও সব প্রায়বিস্তৃত পণ্ডিতদের নাম ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে আছে। যেমন মগধের ধর্মচন্দ্র। ইনি ৭২০ খ্রিস্টাব্দ চিনা রাজদূতের আমন্ত্রণে চিনে গিয়েছিলেন।

দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধানে ভারত-চিনের গবেষকরা কত কষ্ট স্বীকার

করতেন তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। বৌদ্ধ গবেষক ধর্মক্ষেম মধ্যভারত থেকে যাত্রা করলেন চিনের উদ্দেশে, কারণ মহাপরিনির্বাণসূত্র নামক বইয়ের প্রথম দশটি পরিচ্ছেদ তিনি নিজের দেশে পেলেন না। প্রথমে গেলেন কাশ্মীরে, সেখানে ব্যর্থ হয়ে বইয়ের খোঁজে হাজির হলেন চিনে। প্রিয় বইটির সংস্কৃত অনুবাদ করতে করতে তিনি খবর পেলেন পুরো বইটা একমাত্র তিব্বতে পাওয়া যেতে পারে। খোটানে সেই বই সংগ্রহ করে ধর্মক্ষেম ফিরে গেলেন লিয়াং-চাও-এ। মহাপণ্ডিতের মন ভরে না কিছুতেই, তাঁর সন্দেহ যে-বইটি তিনি অনুবাদ করছেন সেটিও সম্পূর্ণ নয়। সুতরাং আবার খোটানের উদ্দেশে যাত্রা। কিন্তু এবার অঘটন ঘটলো, মাঝপথে খুন হলেন ভারতমাতার এই বিস্মৃত জ্ঞানতপস্বী সন্তান।

পথের ও ভাষার দূরত্ব জয় করে নতুন দেশে গবেষণা বা তীর্থযাত্রা সে যুগে সহজ ছিল না। দূরদর্শীরা এইসব গবেষকদের জন্য ছোট ছোট দোভাষী অভিধান তৈরি করতেন। এমনই একটি বইতে জনৈক ভারতীয় ভিক্ষু এবং কান-চাউ নামে পশ্চিম চিনের এক ভদ্রলোকের কথোপকথন উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা যাচ্ছে না।

"আপনি ভাল আছেন? শরীরে কোনো অস্বস্তি নেই তো?

—আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি।

আপনাব সব ভাল তো?

আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

—আমি খোটান থেকে এলাম।

ভারতবর্ষ থেকে কবে বেরিয়ে এলেন?

—দু'বছর আগে।

খোটানে কোথায় থাকতেন?

—একটা সঙ্ঘারামে ছিলাম।

কোন সঙ্ঘারামে?

রাজার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা করেছি।

এখন কোথায় চললেন?

—চিনটা ঘুরে ঘুরে দেখবো।

আমাদের চিনচর্চা এবং চিনাদের ভারতচর্চার কথা বলতে শুরু করলে শেষ হতে চায় না। সারাজীবন ধরে পাঠ ও বিশ্লেষণ করলেও এর পরিসমাপ্তি নেই। তবে এইসব তীর্থযাত্রার বিবরণ চিনা পরিব্রাজকরা যতটা রেখে গিয়েছেন ভারতীয় শিক্ষাগুরু বা শ্রমণরা ততটা বিবরণ রেখে যাননি। কিংবা তাঁরা যা লিখে গিয়েছিলেন সময়ের স্রোতে তা ধুয়ে মুছে গিয়েছে অথবা লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছে।

ভারত-চিন অনুসন্ধানের আদিতে রয়েছেন সংখ্যাহীন চিনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকরা। প্রথমেই স্মরণ করতে হয় ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাং-কে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তাঁদের ভারতযাত্রা প্রধানতঃ দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেশে যাতে সেইসব মহামূল্যবান বই নির্ভুলভাবে চিনাভাষায় অনুবাদ করা যায়। ফা-হিয়েনের তীর্থযাত্রার শুরু ৪০০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর ষোলো বছরের ভ্রমণকথা বহুযুগ পরে ইংরিজিতে অনূদিত হয়ে আজও পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করছে। ফা-হিয়েন ভাল সংস্কৃত জানতেন এবং মহাসঙ্ঘিকা বলে বিশাল একটি বইয়ের অনুবাদ করেন।

হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণকাল (৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ)। প্রায় সতেরো বছর বিদেশে কাটিয়ে তিনি যখন স্বদেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে ভারতের ৬৫৭টি মহামূল্যবান বই। বিশেষজ্ঞদের তিনি সাদর নিমন্ত্রণ করলেন অনুবাদকর্মে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে। নিজেও এই কাজে ডুবে রইলেন আমৃত্যু। তাঁর দেহাবসান ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ। এইসব ভারতবিদদের কথা আমরা কিভাবে ভুলে গেলাম তা আজও ঠিকমতন খোঁজ করে লিপিবদ্ধ হয়নি।

ভারতসন্ধানে কয়েকজন চিনা

রবীন্দ্রনাথের চিনভ্রমণ কাহিনি (১৯২৩-'২৪) একসময় খুব মন দিয়ে পড়েছিলাম, বুঝে উঠতে পারিনি অমন সম্মানিত অতিথির সভা পণ্ড করবার জন্য চিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কেন এত তৎপর হয়ে

তবে সব দুঃখ ভুলে গিয়েছিলাম কবিগুরুকে স্বাগতম জানিয়ে চিনা অধ্যাপকের রচনা পাঠ করে, যেখানে চিনারা ভারতকে 'নিকটতম এবং প্রিয়তম' ভ্রাতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায় চিন ও ভারতের কয়েক হাজার বছরের সম্পর্কের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত খুবই ভাল লেগেছিল। যতক্ষণ না সেই অস্বস্তিকর অধ্যায়ে আসা গিয়েছিল যেখানে অধ্যাপক মহাশয় স্বীকার করছেন সম্রাট অশোকের সমসাময়িক এক চিনা সম্রাটের রাজত্বকালে চিনে দশজন হিন্দু পরিব্রাজকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সম্রাটের নিষ্ঠুর নির্দেশে প্রথমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল এবং পরে তাঁদের হত্যা করা হয়।

অধ্যাপক লিয়াং শি চাও অবশ্য গর্বভরে বলেছেন, খ্রিস্টের জন্মের প্রথম শতকেই (৬৭-৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ভারতের সঙ্গে চিনের যোগাযোগ ঘটে এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দিতে অন্তত সাঁইত্রিশজন ভারতীয় পণ্ডিত চিনে পদধূলি দেন। এঁদের মধ্যে তিনজন ভুবনবিদিত, নাম ধর্মরক্ষা, বুদ্ধভদ্র ও দীনভদ্র। সেকালের রীতি অনুযায়ী এঁদের একটি করে চিনা নামও হয়েছিল, যথাক্রমে তমোলসা, চুশিয়েন ও শেনতাই। নামযশে এঁরা যে-তিনজন ভুবনবিদিত চিনা গবেষকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন তাঁরা হলেন ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও আই-চিং।

ভগবান বুদ্ধের সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিয়ে পুনায় 'মিথিলা' নামক বাসগৃহে লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় আমাকে মাতিয়ে

রাখতেন। তাঁর মুখেই শুনি, ভগবান বুদ্ধের জীবিতকালেই দু'-তিনজন মধ্য-এশিয়ার ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি যে নখকণা ও কেশাগ্র উপহার দেন তা এই ভক্তরা সযত্নে চিনে নিয়ে যান।

শরদিন্দু আমাকে উপদেশে দিয়েছিলেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে একজন প্রাইভেট টিউটরের মাধ্যমে সংস্কৃত ও পালি ভাষাটা ঝালিয়ে নিও, তাহলে জীবনে কখনও গল্পের আইডিয়ার অভাব হবে না। বোকামি করে গুরুজনের সেই মহামূল্যবান উপদেশ পালন করিনি, এখন জীবনসায়াহ্নে খুবই দুঃখ হয়, কারণ সাত হাজার বৌদ্ধ ক্লাসিকে কত সহস্র রোমাঞ্চকর কাহিনি নবযুগের লেখকদের হাতে রূপান্তরিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছে তার কোনো হিসেব নেই। শরদিন্দুর লেখনীতে মাত্র কয়েকটি বৌদ্ধ গল্প বহুযুগের ওপার হতে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। বৌদ্ধযুগের অমৃতকথা আমার কাছে অধরাই থেকে গিয়েছে। বছরের পর বছর অনেক বাংলা এবং ইংরিজি বই পড়েছি, কিন্তু তার বেশির ভাগই সৈয়দ মুজতবা আলী যাকে স্বার্থপরতাপূর্ণ 'সেলফিশ রিডিং' বলতেন তাই। উকিল যেমন মক্কেলের স্বার্থে ডজন-ডজন আইন বই ঘাঁটেন, ডাক্তার যেমন রোগীকে সুস্থ করার জন্য সদ্যপ্রকাশিত মেডিক্যাল জার্নাল পড়েন, এসব স্বার্থপরের পাঠ। গল্প-লেখকও প্রয়োজনে অনেক বই পড়েন তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য করার জন্য। কিন্তু এসব তো নাম-কা-ওয়াস্তে পড়া, এতে আত্মার তৃপ্তি হয না। যেসব লেখক দিনেরবেলায় একজায়গায় জীবিকার পিছনে ঘোরেন এবং সূর্যাস্তের পরে স্বগৃহে নতমস্তকে মা সরস্বতীর চরণবন্দনা করেন তাঁদের বড়ই সময়ের অভাব, তাঁদের পড়াশোনায় ঘাটতি থেকে যায়, ফলে তাঁরা মানসিক অপুষ্টি অর্থাৎ মেন্টাল ম্যালনিউট্রিশনে ভোগেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর চাপে পড়ে সারা বছর ধরে কত যে বিখ্যাত এবং অখ্যাত বই পড়েছি তার হিসেব নেই। কোনো উপায় ছিল না, বিগত বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গের অপমান ও অভিমানে জ্বলতে-জ্বলতে কত যে তরুণ ঘরছাড়া দিকহারা হয়েছে এবং জেলখানায় পচে মরেছে তার পুরো হিসেব আজও নেই। ফাঁসির দড়ি কোনক্রম এড়িয়ে, আলিপুর অথবা আন্দামানের জেলখানায় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ বিসর্জন দিয়ে এই সব বিধ্বস্ত মানুয একসময় অখ্যাত পত্র-পত্রিকায় তাঁদের জীবনকথা বাংলায় লিখেছেন, অথবা ততোধিক দরিদ্রভাবে বিভিন্ন বই লিখেছেন যার অনেকটাই সমকালের অবহেলায় হারিয়ে গিয়েছে। নিজের প্রয়োজনে এইসব বইয়ের জেরক্স-কপি বাড়ি নিয়ে এসে রাতের পর রাত পাঠ করেছি।

মনের এমনই অবস্থা নিয়ে এক স্নেহভাজন পড়ুয়া বন্ধুর সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান হচ্ছিল। প্রদীপ গুপ্তর মতে, একালে বইকে ভালবাসার নানা রূপ। কেউ কেউ বই কেনেন এবং নিজস্ব লাইব্রেরিতে তাদের বন্দি করে রেখে তৃপ্তি পান। দ্বিতীয় পর্যায়ে লাইব্রেরিতে অনেকের নিত্য আনাগোনা এবং ইদানীং স্টারমার্ক, ক্রসওয়ার্ড, অক্সফোর্ড বুকশপে মাঝে মাঝে দৌড়ানো এবং গৃহলক্ষ্মীর গঞ্জনা সত্ত্বেও কিছু পেপারব্যাক এবং কয়েকটি হার্ডব্যাক মাঝেমাঝে ক্রয় করা। ভাগ্যবান তিনি যাঁর গৃহলক্ষ্মীও একই সংগ্রহরোগে ভোগেন। আমার বন্ধুটি শেষোক্ত শ্রেণির, কর্তাগিন্নি বাড়িতে বই আনেন এবং পড়েন। বইয়ের মস্ত সুবিধে, তার গায়ে মিটার লাগানো থাকে না, একই বই ক'জন পড়ল তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই, খরচও বাড়ে না।

এবার পুজোর পর এই বন্ধুর মুখেই মজার গল্প শুনলাম। এঁরা একবার বাবা-মাকে নিয়ে বোধগয়ার ঐতিহাসিক ডাকবাংলোয় ক'দিন ছিলেন, সঙ্গে অবশ্যই বই। ডাকবাংলোর আর-একজন অতিথি জনৈকা প্রবীণা

বঙ্গমহিলা। তিনি সবিস্ময়ে বন্ধুর বাবাকে বললেন, আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ তো অবাক করল, ভ্রমণে বেরিয়েও সারাক্ষণ বই পড়েছে। এরপর আলাপ হল। লতিকা লাহিড়ি জানালেন তিনি রাজধানীর এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, তাঁর বিষয় চিনাভাষা। তারপর দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের খুব কাছে অধ্যাপিকা লাহিড়ির বইয়ে-ঠাসা এক-চিলতে ফ্ল্যাটে বন্ধু দম্পতির কয়েকবার যাতায়াত, গ্রন্থ উপহার ও বিনিময় হয়েছে। কিছুদিন আগে লতিকা লাহিড়ির বোনপোর সঙ্গে কলকাতায় এঁদের আবার দেখা। লতিকা আর ইহলোকে নেই। তিনি যাবার আগে বোনপোকে বলে গিয়েছেন, আমার গ্রন্থ সংগ্রহটি ওদের দেখিও, ওদের যা ইচ্ছা তা যেন নিয়ে নেয়। এইভাবেই আমার বন্ধু আচমকা প্রাচীন ভারত ও চিন সম্পর্কে বেশ কিছু দুর্লভ বইয়ের মালিক হয়েছেন।

পড়ে তৎক্ষণাৎ ফেরত দেব এই শর্তে লতিকা-সংগ্রহের যে-বইটি আমার হাতে এল তা আমার সেলফিশ রিডিং-এর মধ্যে পড়ে না। বইটির লেখক জনৈক আই-চিং, মূল চিনাভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন লতিকা লাহিড়ি।

অনুবাদিকা আমার অপরিচিতা, কিন্তু মরণসাগরের ওপার হতে ১৬০ পৃষ্ঠার ইংরেজি বইয়ের মাধ্যমে তিনি আমার জন্য নতুন এক পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। ছাপ্পান্নজন চিনা বৌদ্ধসন্ন্যাসীর যে-জীবনকাহিনি তিনি এই বইতে ইংরেজি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করলেন তা এক কথায় বিস্ময়কর। আরও যা বিস্ময়কর, এই বই সময়মতো শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পড়লে অজানা দেশের অজানা শ্রমণদের নিয়ে তিনি অবশ্যই আরও পঞ্চাশটি অবিস্মরণীয় গল্প লিখতে পারতেন।

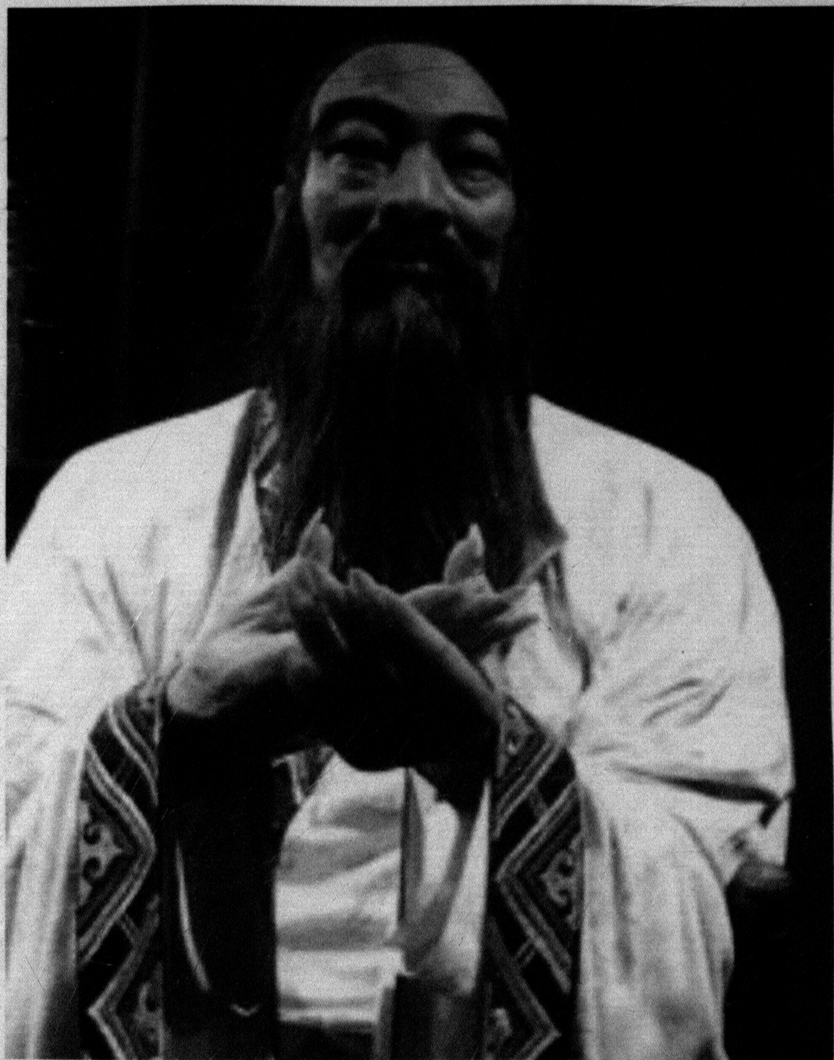
অধ্যাপিকা লতিকা লাহিড়ি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানি না, বইয়ের মুখবন্ধ থেকে স্পষ্ট যে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯৫৮ সালে তিনি বেজিং-এ যান এবং সেখানে বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ ডক্টর জি সিয়ানলিনের



ইনিই ভুবনবিদিত তাও ধর্মের প্রবর্তক লাওৎজু। জন্ম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪, দেহাবসান খৃঃপূঃ ৫৩১। কনফুসিয়াসের সমকালীন হলেও লাওৎজু অগ্রজ। এঁকে নিয়ে মূল চিন ভূখণ্ডে শত-সহস্র গল্প। যেমন, মাতৃগর্ভে তিনি ৮০ বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং শ্বেতশ্মশ্রু নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। মহাজ্ঞানী লাওৎজু সম্রাটের গ্রন্থাগারে কাজ করতেন। নারীশক্তির ওপর ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা।



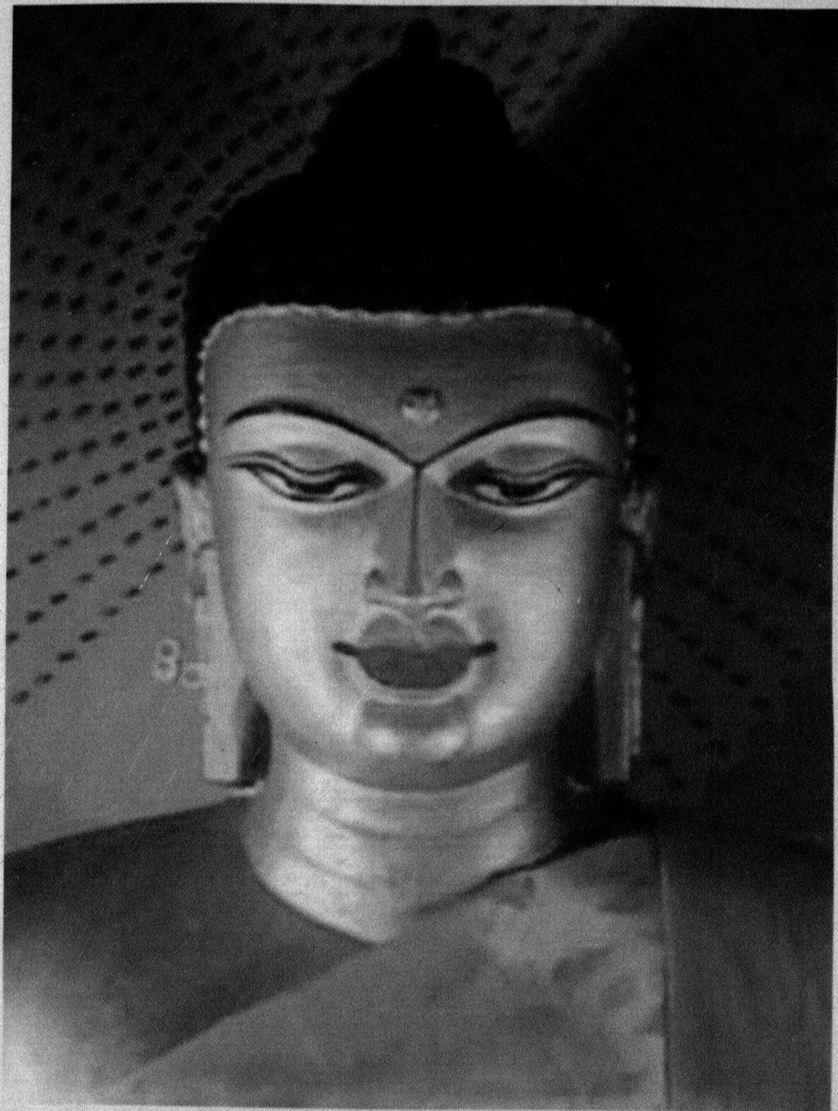
দেশের নৈতিক অধঃপতনে বিরক্ত হয়ে বৃদ্ধ বয়সে লাওৎজু বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজকীয় গ্রন্থাগারের কাজ ছেড়ে একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন অজানার সন্ধানে। তাঁর বাহন একটি ষাঁড়, যা এদেশে শিবের কথা মনে করিয়ে দেয়। লাওৎজুর সংসার ত্যাগের দৃশ্যটি নিয়ে বিভিন্ন যুগে সংখ্যাহীন ছবি আঁকা হয়েছে। শোনা যায়, দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় তিনি সীমান্তপ্রহরীদের সন্দেহের উদ্রেক করেন এবং তাঁরা জানিয়ে দেন, নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার আগে তাঁকে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হবে না। এই নির্দেশ মান্য করেই লাওৎজু রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাও তে চিং বা 'বাঁচার পথ'। যে জায়গায় বসে লাওৎজু তাঁর মহাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে সেখানেই একটি তাও মহাবিহার গড়ে উঠেছে।



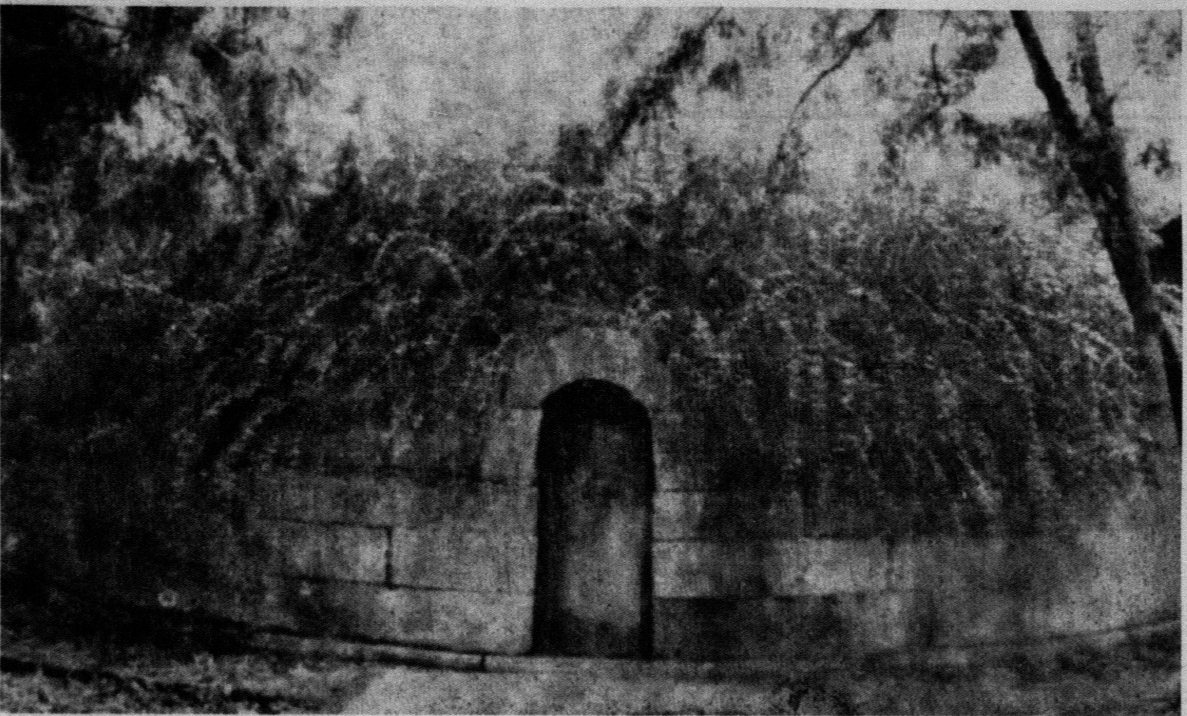
মহাচিনের গৌরব দার্শনিক ও মহাঋষি কনফুসিয়াস, উনিশ শতকের বাংলায় এঁকেই বলা হতো কঙফুসে। জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর ৫৫২ (খ্রিঃ পূঃ), পিতৃদেব ছিলেন চিনের পদস্থ রাজকর্মচারী। এঁর নীতিধর্মের নাম লি। স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল অন্তহীন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস করতেন ধ্রুপদী আচার ও চিন্তাধারা ফিরিয়ে না আনলে দেশের অধঃপতন অনিবার্য। বিয়ে করেন ১৯ বছর বয়সে। সন্তানের পিতা হন ২০ বছরে এবং ২২ বছরে চিনের প্রথম প্রাইভেট স্কুল স্থাপন করেন। পঞ্চাশ বছরে বিচারমন্ত্রী হন, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদে পদত্যাগ করে একসময় দেশত্যাগী হন। বাহাত্তর বছর বয়সে দেহাবসানের কিছু বছর আগে দেশে ফিরে আসেন। চিনারা এঁকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মান দিয়েছেন।



শেষ বয়সে প্রাচীন ঋষির বেশে কনফুসিয়াস। উনবিংশ শতকের বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় নামহীন লেখকের 'কঙফুসে' রচনাটি এই বইতে সংগৃহীত হয়েছে। কনফুসিয়াসের এই ছবিটি প্রথম মুদ্রিত হয় 'মিথস অ্যান্ড লিজেন্ডস' বইতে ১৯২২ সালে।



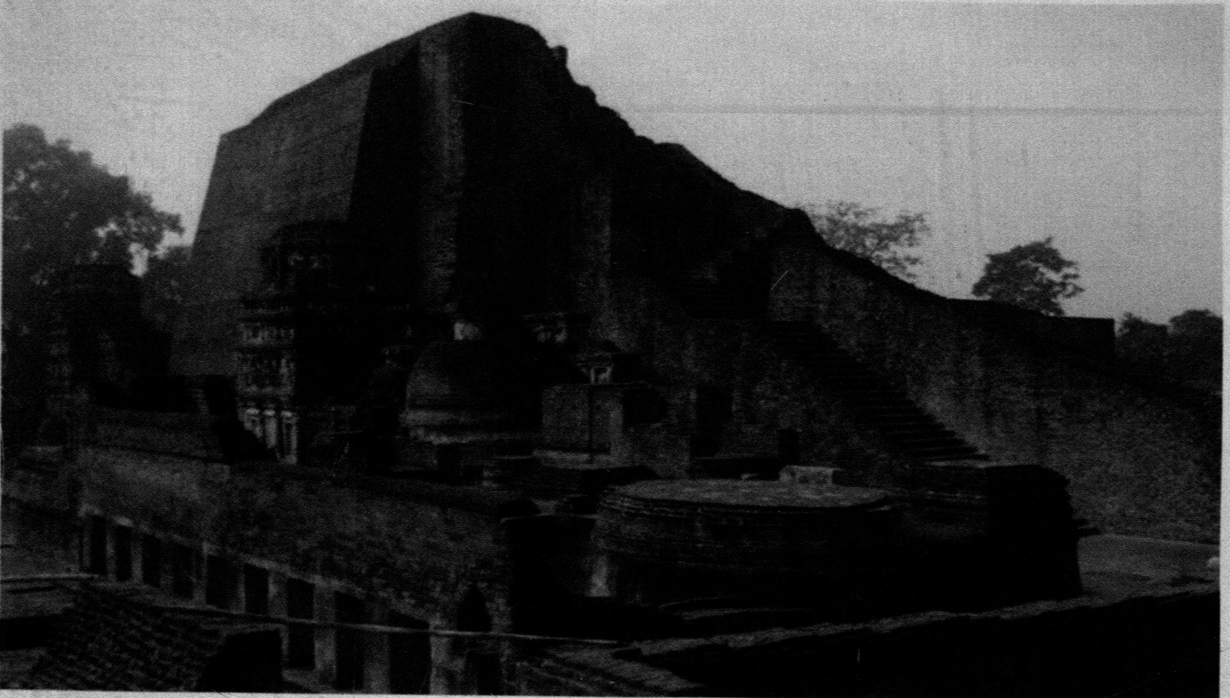
সারা বিশ্বে নানা যুগে সংখ্যাহীন শিল্পী ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করেছেন। তারই একটি। তাও এবং কনফুসীয় তত্ত্বের সূত্র ধরে চিন একসময় প্রভু বুদ্ধের শরণাগত হয়— সর্বশ্রেণির জনগণের মধ্যে তখন বৌদ্ধ ধর্মের জয়ধ্বনি। শোনা যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে হ্যান বংশীয় সম্রাট স্বপ্ননির্দেশ পেয়ে দু'জন ভারতীয় শ্রমণকে চিনে সাদর আমন্ত্রণ করেন। এঁদের নাম কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য। এঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্তূপ আজও চিনে রয়েছে। শোনা যায় এই দু'জন ভারতীয় বৌদ্ধ তাঁদের সঙ্গে ৬ লক্ষ স্তোত্রের সংস্কৃত মন্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন, এঁদের রচিত একটি বইয়ের নাম বুদ্ধের বিয়াল্লিশটি বাণী। এটিই চিনা ভাষার প্রথম বুদ্ধের বাণী।



লুওয়াং, শ্বেত অশ্ব মহাবিহারে কাশ্যপ মাতঙ্গ স্তূপ। সময় খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতক। চিন সম্রাট তাঁকে মহাসমাদর ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।



চিনা গবেষক ও লেখক ফা-হিয়েন ভারত ভ্রমণে আসেন খ্রিস্টাব্দ ৩৯৯-৪১৪। প্রধান উদ্দেশ্য ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশ সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা। প্রাচীন ভারত ও চিন সম্পর্কে ফা-হিয়েনের মতামত আজও অমূল্য। সে যুগে চিনা পরিব্রাজকরা তীর্থযাত্রা শুরুর আগে নামের আদিতে 'শাক্যপুত্র' শব্দটি জুড়ে নিতেন। ফা-হিয়েনের আদি নাম কুং, দেশ উ-ইয়াং, অতি অল্প বয়সে বৌদ্ধ শ্রমণ হিসেবে গৃহত্যাগ করেন। দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চোদ্দ বছর ধরে ভারত ভ্রমণ করেন। এদেশে মহাপ্রাজ্ঞ বুদ্ধভদ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁর সাহচর্যে নানা বইয়ের চিনা অনুবাদ করেন। শোনা যায় ফা-হিয়েন ছিয়াশি বছর বেঁচে ছিলেন।



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ। শোনা যায়, এক সময় এখানে দু'হাজার শিক্ষক ও দশ হাজার ছাত্র ছিলেন। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ছিল নব্বুই লক্ষ বই। বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠের সবচেয়ে বিখ্যাত কেন্দ্রহিসেবে নালন্দার জয়গান খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতাব্দি। খ্যাতনামা আচার্যদের তালিকায় রয়েছেন নাগার্জুন, দিন্নাগ ও ধর্মপাল।



ভারত-চিন সম্পর্কের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হুয়েন সাং ঠিক কোন বছরে জন্মেছিলেন এবং ঠিক কতদিন বেঁচেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত ৬০৩-৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল চেন-চিন। বাবা ছিলেন কনফুসীয় দর্শনে মহাপণ্ডিত। এক দাদা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ছোটো ভাইকে নিজের শিক্ষায়তনে নিয়ে যান। এগারো বছর বয়সেই তিনি দুরূহ শাস্ত্র 'স্বধর্মপুণ্ডরিকসূত্র' ও 'বিমলকীর্তিনির্দেশ' আয়ত্ত করেন। তেরো বছর বয়সে সন্ন্যাস, ২৬ বছর বয়সে চিন সম্রাটের অনুমতি না নিয়েই বেরিয়ে পড়েন ভারত সন্ধানে। কাশ্মীর উপত্যকা পেরিয়ে তক্ষশিলায় আসেন, পরে মথুরা এবং কাশী। কপিলাবস্তু, কুশিনগর, পাটলিপুত্র, বৈশালি, মহাবোধি পেরিয়ে অবশেষে নালন্দা মহাবিহার। পরে দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কাতেও যান।



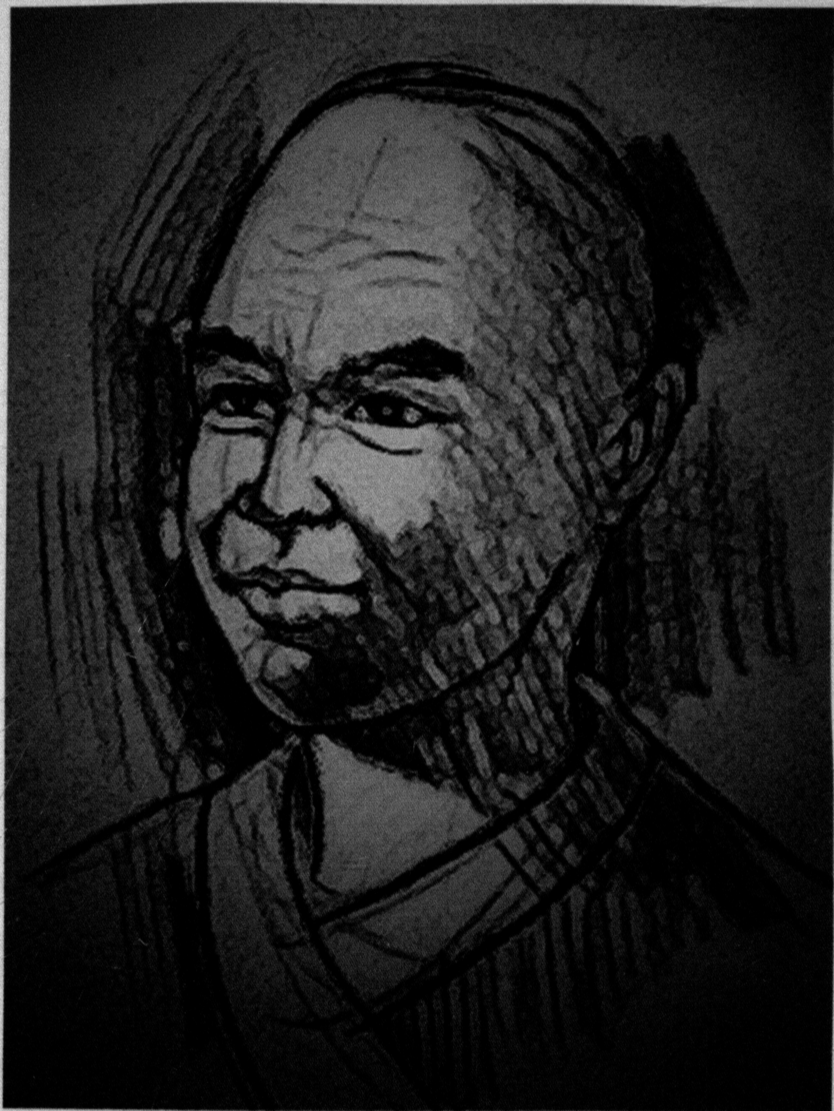
নালন্দায় বুদ্ধমূর্তি।



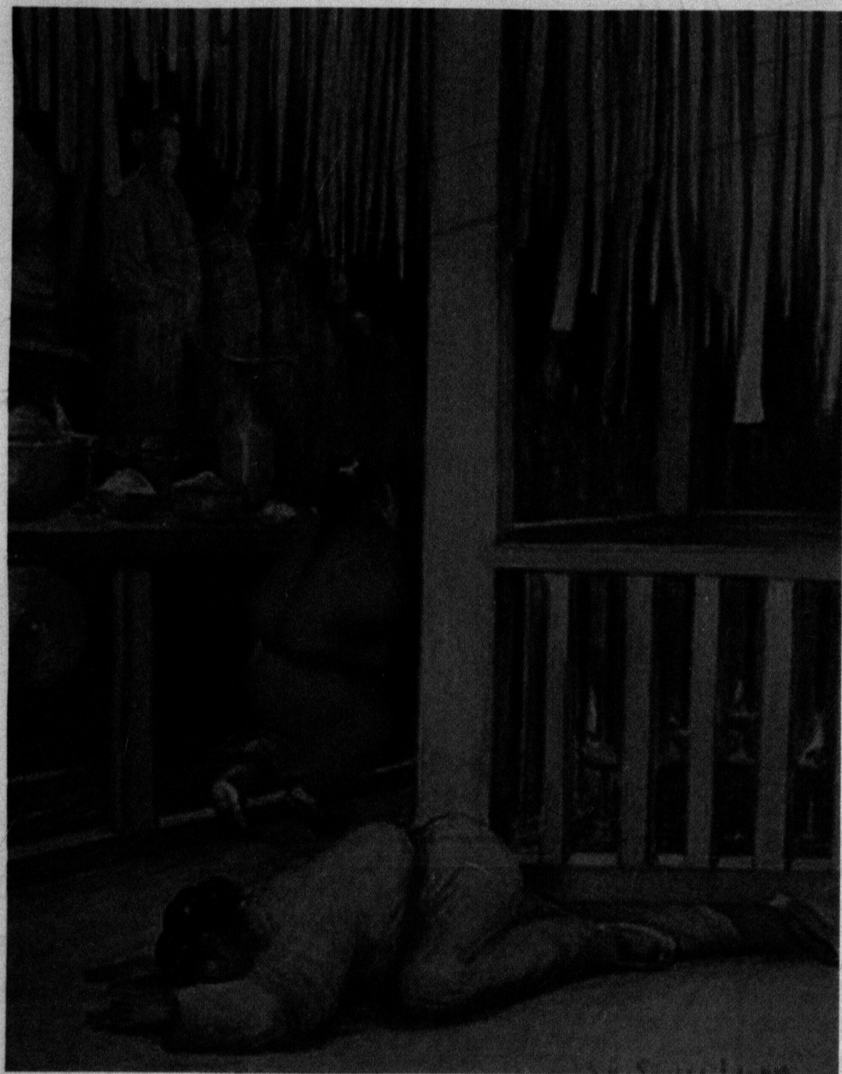
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত হুয়েন সাং। এখানে তিনি দুই ভুবনবিদিত অধ্যাপকের— শীলভদ্র ও বুদ্ধব্রত— কাছে পাঠ নেন। ফেরার সময় বহু শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি সঙ্গে নেন, কিন্তু সিন্ধু নদী পেরোবার সময় নৌকাডুবিতে অনেক মূল্যবান সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন দেশে ফেরেন তখনও তাঁর সংগ্রহে শত শত বই। চিন সম্রাট এই শ্রদ্ধেয় শ্রমণের সম্মানে একটি প্যাগোডা তৈরি করিয়ে দেন এবং সেখানেই পরিব্রাজক হুয়েন সাং-এর সমস্ত সংগ্রহ ও রচনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।



ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ভারতে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাদি সংগ্রহের আশায় একসময় চিন ছাড়াও কোরিয়ার শ্রমণরা দুর্গম পথ পেরিয়ে এদেশে আসতেন। দীর্ঘদেহী এই কোরিও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম শিন লুও। ঐতিহাসিক আই চিঙ তাঁর বইতে এই সন্ন্যাসীর কথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন। আদি নাম ফো-তো-তা-মো, যার অর্থ বিশালদেহী। বোধিধর্ম এই সংস্কৃত নাম নিয়ে এই কোরীয় সন্ন্যাসী ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করে এদেশের বুদ্ধ স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি ভ্রমণ করেন এবং হিনযান বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন। নালন্দা মহাবিহারে আই-চিং তাঁর দর্শন লাভ করেন।



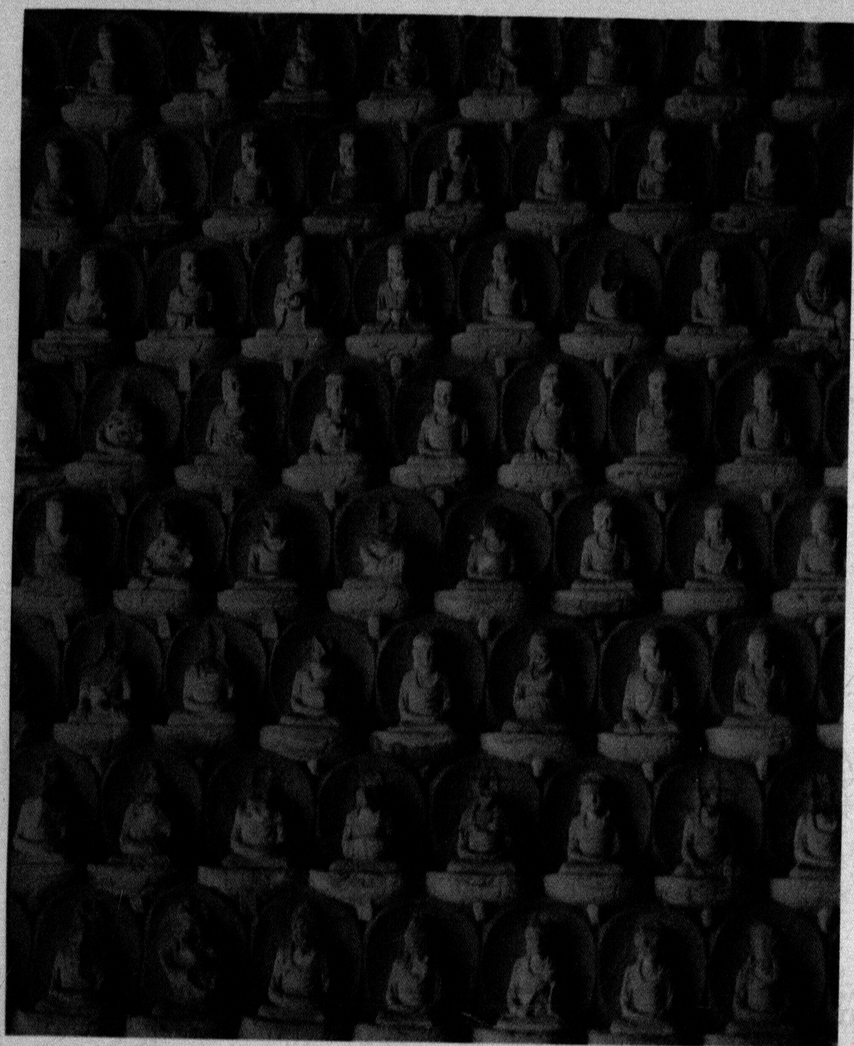
ভারত-চিন সম্পর্কের আর এক অবিস্মরণীয় স্থপতি পরিব্রাজক, ঐতিহাসিক, কবি, বহুভাষা ও শাস্ত্রবিদ, অনুবাদক এবং বুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসী আই-চিং। এঁর রচিত বই এবং দুর্গম পদযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা এই বইতে সংগৃহীত হয়েছে। নালন্দায় দশ বছর শাস্ত্রপাঠ করে ইনি পাঁচ লক্ষ সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ করেন। জন্ম ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে, দেহাবসান ৭১২।



তিব্বতী মন্দিরের অভ্যন্তর।



অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বজ্রযোগিনী গ্রামে, দেহাবসান তিব্বতে ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে। এই বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিতের আদিনাম আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। উনিশ বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে শ্রীজ্ঞান উপাধি লাভ করেন। সুবর্ণ-দ্বীপে ১২ বছর ভ্রমণের পর রাজা নয়পাল কর্তৃক বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাস্থবির নিযুক্ত হন। তিব্বতরাজ চ্যান-চাও জ্ঞানপ্রভ কতৃক আমন্ত্রিত হয়ে ষাট বছর বয়সে তিব্বতযাত্রা করেন। পথে নেপালের রাজপুত্র পথপ্রভা তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতে অবস্থানকালে এই সন্ন্যাসী রাজা নয়পাল ও পশ্চিমদেশীয় কর্ণরাজের বিবাদে মধ্যস্থ হয়ে দেশে শান্তিস্থাপন করেন। তিব্বতে বুদ্ধের অবতার বলে আজও পূজিত। লাসার কাছে নেথালে তাঁর সমাধি রয়েছে।



চিনের সিচুয়াং প্রদেশের দাসু গ্রোতোর খ্যাতি এখন সারা বিশ্বের শিল্পপ্রেমীদের মুখে মুখে। সং ডাইনাস্টির সময় (৯৬০-১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ) এখানে বৌদ্ধধর্মের বিস্ময়কর বিকাশ হয়। ১৯৩৯ সালে স্থাপত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক লিয়াং সিসেং আকস্মিকভাবে এখানকার ভাস্কর্য ঐশ্বর্য আবিষ্কার করেন। কাছাকাছি প্রায় চল্লিশটি জায়গায় ৫৫,০০০-এর বেশি শিলা-শিল্পের বিপুল সমারোহ। প্রধান দুটি কেন্দ্র হলো বেইশান ও বাওদিংশান। এখানকার শিল্পকর্মগুলির সৃষ্টি তাং ডাইনাস্টির সময়ে আনুমানিক ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে। চিনা শিল্পকর্মের ওপর বৌদ্ধধর্মের অপরূপ প্রভাবের নিদর্শন এই ভাস্কর্যগুলি। দাসু গ্রোতোর অন্যতম আকর্ষণ দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি। ছোটো-ছোটো পুতুল থেকে সাত মিটার বড় বুদ্ধমূর্তি এখনও বিস্মিত দর্শকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তত্ত্বাবধানে আই-চিংয়ের বিখ্যাত বই কাও সেং-চুয়ান অথবা 'বিখ্যাত সন্ন্যাসীদের জীবনকথা' ইংরেজিতে অনুবাদ শুরু করেন। অনূদিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে লতিকা পরের বছর দেশে ফিরে এলেন এবং আরও সাতাশ বছর পরে সেই বই প্রকাশিত হল একালের পাঠক-পাঠিকার হৃদয় হরণ করতে।

ভারতে চিনের প্রথম খ্যাতনামা পরিব্রাজক ফা হিয়েন (৪০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং হিউয়েন সাং (৬২৯ খ্রিস্টাব্দ)। বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের দৌলতে এঁদের দু'জনের নাম উপমহাদেশের সবার জানা, কিন্তু কে এই আই-চিং?

অধ্যাপিকা লাহিড়ি আমাকে এক আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি বহুশাস্ত্রবিদ চিনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। জন্ম ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ, মাত্র ন'বছর বয়স থেকে বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা শুরু। তথাগতের পূজারিরা জ্ঞানের সন্ধানে নিতান্ত অল্পবয়সে সংসারের সমস্ত সুখ ত্যাগ করতে উৎসাহী। চোদ্দোশো বছর আগে চোদ্দো বছরের এই বালক প্রব্রজ্যা নিলেন, ভগবান বুদ্ধকেই করলেন জীবনের ধ্রুবতারা। সেই আদিযুগে বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য জ্ঞানতপস্বীদের সে কী আকুলতা!

সুদূর চিনের বৌদ্ধ তাপসদের একমাত্র স্বপ্ন দুর্গমগিরি কান্তার পেরিয়ে, ভয়াবহ গোবি মরুভূমিকে একটুও ভয় না পেয়ে পদব্রজে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ভ্রমণ করে বুদ্ধের কীর্তিভূমি ভারতে উপস্থিত হওয়া, বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যস্থানগুলিতে প্রণতি জানানো এবং বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি পাঠ করে তথাগতের নির্ভুল বাণী ও শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করা। দুই দেশের দূরত্ব শুধু ভৌগোলিক নয়, ভাষারও দূরত্ব অকল্পনীয়। অতএব ধৈর্য সহকারে প্রবাসের মাটিতে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা করা এবং পরবর্তী সময়ে চিনাভাষায় শত শত গ্রন্থমালার অনুবাদ করা, যাতে বুদ্ধের নীতি ও অনুশাসনগুলি জন্মভূমির নতুন মানুষদের কাছেও অবোধ্য বা অস্পষ্ট না থাকে।

হিউয়েন সাং তাঁর ভারতযাত্রা শুরু করেছিলেন গোপনে ৬২৯

খ্রিস্টাব্দে, সুদীর্ঘ সতেরো বছর পরে তিনি যখন স্বদেশে ফিরে আসেন তখন চিনের সম্রাট তাঁকে যে-বিপুল অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তা নিজের চোখে দেখেছিলেন লেখক আই-চিং। হিউয়েন সাং-এব মেধা ভুবনবিদিত। একবার বই পড়লেই তা তাঁর মাথায় ঢুকে যেতো। এগারো বছর বয়সে কঠিন দুটি বই—স্বধর্মপুণ্ডরিকা সূত্র ও বিমলকীর্তিনির্দেশ—আয়ত্তে আনেন। তেরো বছর বয়সে সন্ন্যাস। মূল ভূখণ্ডে যোগ্য শিক্ষকের সন্ধান না পেয়ে তরুণ সন্ন্যাসী ঠিক করলেন ভারতবর্ষে যেতে হবে। ২৬ বছর বয়সে শুরু হল পরিব্রাজকজীবন। নালন্দায় তাঁর দুই শিক্ষকের নাম শিলভদ্র ও বলভদ্র। বুদ্ধের জন্মভূমি স্বপ্নের দেশ ভারত থেকে হিউয়েন সাং বহু বই সংগ্রহ করেছিলেন। দেশে ফিরবার পথে সিন্ধু নদী অতিক্রম করবার সময় নৌকাডুবি হওয়ায় বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে ৬৩৭টি মহামূল্যবান গ্রন্থ এবং বুদ্ধের ১৫০টি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে তিনি চিনে পৌঁছলেন। দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ভ্রমণকথা রচনা ও কঠিন অনুবাদকর্ম। এই কাজ চলে ক্লান্তিহীনভাবে ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, ওই বছরই হিউয়েন সাং-এর দেহাবসান।

আই-চিংয়ের ভারতভূমি দর্শনের স্বপ্ন বহুদিনের, কিন্তু যখন তা বাস্তব হতে চলল তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ (৬৭১ খ্রিস্টাব্দ)। ইতিমধ্যে যেসব ভারতশাস্ত্ররাশি চিনে সহজলভ্য তা ধৈর্যসহকারে পাঠ করে ফেলেন আই-চিং। এক ধর্মসভায় হাজির হয়ে আই-চিং আরও কয়েকজন ভারত ভ্রমণ অভিলাষী সহযাত্রীকে দলবদ্ধ করার চেষ্টা চালালেন। তাঁদের সকলেরই স্বপ্ন, ভারতভূমিতে পবিত্র গৃধ্রকূট পর্বতে তীর্থযাত্রা করে মানবজীবন ধন্য করবেন। আশা করা গিয়েছিল তীর্থযাত্রীর দলটি নেহাত ছোট হবে না। কিন্তু দুর্গমপথের আশঙ্কায় একজন ছাড়া সবাই শেষ পর্যন্ত নানা অছিলায় পিছিয়ে গেলেন। এই তরুণ সহযাত্রী দুঃসাহসী সন্ন্যাসীর নাম শ্যান-সিং। তাঁদের এবারের যাত্রা স্থলপথে নয়, ক্যান্টন থেকে এক বাণিজ্যতরীতে ভারতসন্ধানে দক্ষিণদিকে।

দুঃসাহসিক এই তীর্থযাত্রী একজন বিশিষ্ট কবিও বটে। স্বপ্নের দেশ

ভারতবর্ষে প্রবাসী কবির স্মৃতিমেদুর মানসিকতায় আই-চিং বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন। বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করেও আই-চিং নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। ধৈর্যসহকারে বৌদ্ধশাস্ত্রাদি সংগ্রহ করেছেন স্বদেশে নিয়ে গিয়ে অনুবাদের জন্য। একই সঙ্গে আই-চিং ভোলেননি সেইসব নামহীন পরিচয়হীন স্বদেশবাসীর কথা যাঁরা দীর্ঘসময় ধরে ভারতদর্শনের প্রচেষ্টায় শরীরের সব রকম সুখ বিসর্জন দিয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ পথের ক্লান্তি নিঃশব্দে সহ্য করে একসময় বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে কোনোক্রমে স্বদেশে ফিরে যেতে সফল হয়েছেন, কেউ কেউ ফিরে যেতে সক্ষম হননি, সুদূর প্রবাসেই তাঁরা দেহরক্ষা করেছেন।

ভারত সন্ধানে বেরিয়ে-আসা চিনা সত্যসন্ধানীদের পরিপূর্ণ হিসেব কোথাও নেই, কিন্তু তাঁদের সহযাত্রীদের কেউ কেউ এঁদের স্মরণে রেখে লেখনী ধারণ করেছেন। উল্টোদিকে ভারত থেকে চিনে-আসা দার্শনিক, শিক্ষক ও লেখকদের কথাও কেউ মনে রাখেনি। ভারতীয়দের ইতিহাসবোধের অভাব চিনা লেখকদেরও নজরে এসেছে, তাঁরা এই সচেতনতার অভাব সম্পর্কে লিখিত মন্তব্য করেছেন। এর জন্যই ভারত ইতিহাসের খোঁজখবর করতে হলে নতুন যুগের গবেষকদের প্রায়ই ভারতের বাইরে দৌড়তে হয়।

চিনা ঐতিহাসিকরা কিন্তু ষষ্ঠ শতকেই স্বদেশী পরিব্রাজক-সংগ্রাহক-অনুবাদকদের দুর্লভ জীবনকাহিনি সংগ্রহ করতে উদযোগী হয়েছেন। এঁদের তথ্য অনুযায়ী প্রথম পরিব্রাজক চিনা সন্ন্যাসীর নাম হুই-সিন। আর একজন হুই-সিয়াও। শেষোক্ত লেখক তাঁর বইয়ের মুখবন্ধে দু'ধরনের পরিব্রাজকের উল্লেখ করেছেন : 'বিশিষ্ট' এবং 'খ্যাতনামা'। কম প্রতিভার মানুষ যখন সমকালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে বিপুল স্বীকৃতি ও সম্মান সংগ্রহ করেন তখন তাঁরা 'খ্যাতনামা' বা 'বিখ্যাত' হন, কিন্তু তার মানেই যে তাঁরা 'বিশিষ্ট' তা নন। যাঁরা প্রকৃতই 'বিশিষ্ট' তাঁরা সমকালের সমস্ত চাপ সহ্য করেও নিজের ধ্রুবকে নিঃশব্দে অনুসরণ করেন।

এমনই ছাপ্পান্নজন বিশিষ্ট চিনাপণ্ডিতের জীবনকথা গভীর ধৈর্যের সঙ্গে তিলে-তিলে সংগ্রহ করেছেন পরিব্রাজক আই-চিং। তাঁর কাছে আমরা চির ঋণী, সেই সঙ্গে ঋণী বাংলার মেয়ে লতিকা লাহিড়ির কাছে, যিনি প্রায় দেড় হাজার বছর পরে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে তাঁদের অবিশ্বাস্য কাহিনি সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

ক্যান্টন থেকে সমুদ্রযাত্রা শুরু করে আই-চিং প্রথমে যে-শহরে পৌঁছলেন তার নাম শ্রীবিজয়। লতিকা মনে করিয়ে দিয়েছেন এই জনপদের আধুনিক নাম সুমাত্রা, যা শত শত বছর ধরে বহু গবেষক ও বিদেশী পরিব্রাজককে উদার আশ্রয় দিয়েছে। শ্রীবিজয়ে কিছুদিন বসবাস করে আই-চিং সংস্কৃত ব্যাকরণে পাঠ নিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের তীর্থযাত্রার এই শুরু, পঁচিশ বছরে তিরিশটি রাজ্যে তাঁর ভ্রমণ। ভারতকে সেই সময়ে সুদূর চিনের ভক্তরা পাঁচটি অঞ্চল হিসেবে দেখতেন—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভারত।

তীর্থযাত্রী আই-চিংয়ের প্রধান লক্ষ নালন্দা, যেখানে হিউয়েন সাং দীর্ঘসময় অতিবাহিত করে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। বুদ্ধকে প্রণতি জানিয়ে আই-চিং দীর্ঘ দশ বছর ধরে নালন্দায় সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি পাঠ করলেন। এইখান থেকেই পূর্বসূরি হিউয়েন সাং বহু দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এইখানেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত চিনা পরিব্রাজকদের সঙ্গে আই-চিংয়ের দেখা হয় এবং তাঁদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা পরম যত্নে তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

একসময় দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হলেন সন্ন্যাসী আই-চিং। ফেরার পথে তিনি আমাদের ঘরের কাছে তাম্রলিপ্ত বন্দরে এলেন, সময় ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ। সেখান থেকে আবার শ্রীবজয় অথবা সুমাত্রা। সেখানে আরও চার বছর থেকে গেলেন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। বিশ্বাসভাজন এক বন্ধুর মাধ্যমে দূরদর্শী আই-চিং কয়েকটি পাণ্ডুলিপি স্বদেশে পাঠিয়ে দিলেন। একটি বইয়ের পরবর্তীকালে ইংরেজি নাম 'A Record of the Buddhist Religion as Practised in India, AD 67-695'। আর একটির দু'টি খণ্ড—'Biographies of Eminent Monks who went to the Western

World in Search of the Law During the Great Tang Dynasty'।

দেশে ফিরে আই-চিং ভক্তিমতী সম্রাজ্ঞী উ-চুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করলেন, তাঁর উৎসাহে দীর্ঘসময় ধরে তিনি বহু সংস্কৃত বইয়ের চিনা অনুবাদ করলেন। দেখা যাচ্ছে এই কঠিন কাজে তাঁকে সাহায্য করছেন দুই ভারতীয় সন্ন্যাসী—শিক্ষানন্দ ও ঈশ্বর।

আই-চিং তাঁর ভারতভ্রমণের প্রাণস্পর্শী বিবরণ রেখে গিয়েছেন। 'বহুদিন আমাকে অনাহারে কাটাতে হয়েছে, কোথাও কোথাও এক ফোঁটা জলও মেলেনি। আমি অবাক হয়ে যাই এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমার পূর্বসূরি ভারতপথিকরা কেমন করে তাঁদের মনোবল অটুট রেখেছিলেন!'

যে-ছাপ্পান্নজন চিনা সন্ন্যাসীর নাম আই-চিং উল্লেখ করেছেন তার এক নম্বরে হুয়ান-চাও, শেষ জন তা-চিন। এঁদের মধ্যে মাত্র পাঁচজনের সঙ্গে আই-চিংয়ের ভারতভূমিতে দেখা হয়েছিল।

এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই একটি সংস্কৃত নাম গ্রহণ করে স্বপ্নের দেশ ভারতকে সম্মানিত করেছিলেন। শ্রমণ হুয়ান-চাও নাম নিয়েছিলেন প্রকাশমতি। এঁর বাবা ও দাদামশাই চিনা সম্রাটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

নিতান্ত অল্পবয়সে প্রকাশমতি মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী হলেন। শুরু হল প্রকাশমতির বৌদ্ধশাস্ত্রপাঠ। তারপর স্বদেশের বৌদ্ধ মঠেই শুরু হল সংস্কৃতসাহিত্য চর্চা। নিজের রাজধানী ত্যাগ করে পথিক সন্ন্যাসী প্রকাশমতি বহু কষ্ট সহ্য করে পামির পর্বত অতিক্রম করলেন। অবশেষে এই সন্ন্যাসী পৌঁছলেন তোখারা। তিব্বতের রানি এই তরুণ শ্রমণকে অর্থ সাহায্য করলেন, বললেন তুমি অবশ্যই উত্তরভারতে যাবে।

নানাপথ পেরিয়ে সন্ন্যাসী প্রকাশমতি অবশেষে উপস্থিত হলেন পাঞ্জাবের জলন্ধরে। এখানে তিনি নিষ্ঠুর ডাকাতদলের খপ্পরে পড়লেন। সর্বস্ব হারিয়েও মধ্যরাতে ডাকাতদের গভীর ঘুমে অচেতন দেখে হুয়ান চাও চুপি চুপি পালালেন।

জলন্ধরে চার বছর শাস্ত্রপাঠ করে সন্ন্যাসী প্রকাশমতি অবশেষে

এলেন বোধগয়ার কাছে মহাবোধি সংঘারামে। এখানে দশ ফুট উঁচু দু'টি রুপোর অবলোকিতশ্বর ও মৈত্রেয় মূর্তির চমৎকার বর্ণনা তিনি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। এখানেও দীর্ঘ চার বছর ধরে তিনি 'অভিধর্ম' ও 'বিনয়' শাস্ত্র পাঠ করলেন।

এবার লক্ষ নালন্দা, সেখানেও তিন বছর। যে-দু'জন ভারতীয় পণ্ডিতের কাছে তাঁর সবিনয় শাস্ত্রশিক্ষা তাঁদের নাম বিজয়রশ্মি এবং বদন্ত।

অবশেষে উত্তরাঞ্চলের গাঙ্গেয় উপত্যকায়। 'গ্রেট ফেম' মঠে আরও তিন বছর কাটালেন তিনি। ইতিমধ্যে কান্যকুব্জে চিনা সম্রাটের দূত ওয়াং এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে রাজধানীতে দীর্ঘ বিবরণ পাঠালেন। মুগ্ধ চিনসম্রাট সঙ্গে সঙ্গে ভারতে লোক পাঠালেন এই বৌদ্ধ পরিব্রাজককে যে করেই হোক রাজধানীতে ফিরিয়ে আনতে।

দেশে ফেরার পথে প্রকাশমতি প্রথমে নেপালের বাজার সঙ্গে দেখা করলেন, তিনি সানন্দে তিব্বতে যাবার সবরকম ব্যবস্থা করে দিলেন। তিব্বতের রানিও সন্ন্যাসীর সাহায্যে এগিয়ে এলেন, চিনের সম্রাটের কাছে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যও করলেন। অবশেষে পরিব্রাজকের পথের প্রান্তে রাজধানী লো-ইয়াং। অধ্যাপিকা লতিকা লাহিড়ি আমাদের জানাচ্ছেন, এই শহরেই চিনের প্রথম বৌদ্ধমন্দির তৈরি হয়েছিল ৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে। যে-দু'জন ভারতীয়র সম্মানে সম্রাট মিং এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন তাঁদের নাম আজও অক্ষত—কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য। শোনা যায় একসময় এই লো-ইয়াং শহরে ১৩৬৭টি বৌদ্ধমন্দির ছিল।

দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সন্ন্যাসী প্রকাশমতি স্বদেশের রাজধানীতে ফিরে এসে বিপুলভাবে সম্মানিত হলেন। আই-চিং জানাচ্ছেন, কিন্তু এই সন্ন্যাসীর বিশ্রাম মেলেনি। সম্রাট তাঁকে এক অভিনব দায়িত্ব দিলেন, কাশ্মীরে এক ভুবনবিদিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রয়েছেন, নাম লোকাদিত্য, এই জ্ঞানতপস্বীকে সসম্মানে চিন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত করতে হবে।

অতি কষ্টে সংগ্রহ করা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি একটি বৌদ্ধমন্দিরে জমা

রেখে সম্রাটের আদেশ পালনের জন্য সন্ন্যাসী প্রকাশমতি আবার বেরিয়ে পড়লেন তাঁর পরমপ্রিয় ভারতভূমির উদ্দেশে।

প্রায় অন্তহীন মরুভূমি এবং দুর্গম পর্বতমালা অতিক্রম করে আমাদের নায়ক এবার উপস্থিত হলেন এক নির্জন খরস্রোতা নদীর তীরে। সেখানে কেবল একটি দড়ি রয়েছে যাত্রীকে পবপারে যেতে সাহায্য করার জন্য। আমাদের যাত্রী কী ভেবে এই দড়ির সাহায্য না নিয়ে সাঁতার কেটে অন্য পারে উপস্থিত হলেন। দড়ির সাহায্য নিলে মৃত্যু অনিবার্য ছিল, কারণ সেই দড়ির কাছেই অপেক্ষা করছিল তিব্বতের কুখ্যাত দস্যুদল। আরও একবার এই দস্যুদলের হাতে পড়েছিলেন সন্ন্যাসী প্রকাশমতি, কিন্তু কোনওক্রমে মুক্তি পেয়ে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন উত্তর ভারতের পথে।

যে উদ্দেশে ভারতে আসা তা ইতিমধ্যেই অন্য একজন চিনা রাজদূত প্রায় সফল করে ফেলেছেন। কাশ্মীরি পণ্ডিত লোকাদিত্যকে নিয়ে তিনি ফিরে চলেছেন চিন সম্রাটের দরবারে। মধ্যপথে দু'জনের দেখা হয়ে গেল। সম্রাটের দূত সন্ন্যাসী প্রকাশমতিকে বললেন, সম্রাটের ইচ্ছা আপনি দক্ষিণ গুজরাতে লতারাজ্যে চলে গিয়ে সেখানে কিছু দুষ্প্রাপ্য বনৌষধি সংগ্রহ করুন যা মানুষকে দীর্ঘায়ু করে, সম্রাট নিজের দেশে এই সব দুর্লভ চারা রোপণ করতে বিশেষ আগ্রহী।

নিরুপায় সন্ন্যাসী রাজনির্দেশে এগিয়ে চললেন এবং একসময় 'নব সঙ্ঘারাম'-এ উপস্থিত হলেন। এরপর উপস্থিত হলেন কপিস নগরে যেখানে ভগবান বুদ্ধের উষ্ণীষ সেইসময়ে সযত্নে রক্ষিত ছিল। সচন্দন গন্ধপুষ্প নিবেদন করে ও ধূপ জ্বালিয়ে দূরদেশের যাত্রী প্রশস্তি জানালেন পরমপবিত্র সেই স্মৃতিচিহ্নকে, তারপর যাত্রা শুরু করলেন সিন্ধুপ্রদেশের লতা জনপদের দিকে। দুর্লভ বনৌষধি সংগ্রহ সহজ কাজ নয়, ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ চার বৎসর ধরে তিনি এই কাজে ব্যস্ত থাকলেন, তারপর আরও কিছু প্রাণদায়িনী ভারতীয় বনৌষধির সন্ধানে চললেন দক্ষিণ ভারতের দিকে। সেখান থেকেও সযত্নে সুদূর স্বদেশে পাঠালেন নানা গাছগাছড়া।

কোনসময়ে নালন্দা মহাবিহারে আই-চিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দীর্ঘপদযাত্রায় ক্লান্ত সন্ন্যাসীর। দুই তীর্থযাত্রীরই নেইকো চলার শেষ। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তাঁরা পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, অবশ্যই আবার দেখা হবে জন্মভূমি চিনে ফিরে গিয়ে।

নেপাল হয়ে তিব্বতের পায়ে-হাঁটা-পথ তখন আইনশৃঙ্খলার কারণে রুদ্ধ। তাই সাময়িক বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সন্ন্যাসী প্রকাশমতি চললেন ভগবান বুদ্ধের নানা স্মৃতিবিজড়িত গৃধ্রকূট পর্বত ও বেণুবন সন্দর্শনে। এই সেই বিখ্যাত রাজগৃহ, বুদ্ধের পরমপ্রিয় বেণুবন। নতমস্তক নৃপতি বিম্বিসার এই বেণুবনই ভগবান বুদ্ধকে দান করেছিলেন।

সন্ন্যাসীর মন্ত্র চরৈবেতি, দেহ ক্লান্ত অবসন্ন হলেও থেমে যাওয়ার অবকাশ নেই। আই-চিংয়ের অন্যতম নায়ক প্রকাশমতির শেষ সময় সমাগত, জন্মভূমিতে ফেরা সম্ভব হল না, প্রিয়প্রবাসে মধ্য ভারতের এক অখ্যাত তীর্থস্থানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন চিনের এই তীর্থযাত্রী এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর অস্থি বিসর্জন দেওয়া হল স্থানীয় দু'টি নদীতে।

এই তো মাত্র একজন ভারতপথিকের জীবনবৃত্তান্ত নিতান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হল। আরও পঞ্চান্নজনের কথা পরম শ্রদ্ধায় ঐতিহাসিক আই-চিং লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বইতে। শুনিয়েছেন এঁদের বিচিত্র জীবনকথা, সবার হৃদয়ে বুদ্ধের প্রতি ভক্তি এবং জন্মভূমি সম্পর্কে তাঁদের বিপুল শ্রদ্ধা ও আগ্রহের কথা। এঁদের সংস্কৃত নামগুলি বহুযুগের ওপার হতে আজও মানুষকে নিঃশব্দ বাণী প্রেরণ করে। একজনের নাম শ্রীদেব, নালন্দায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে চারশোর বেশি বই সেখানে জমা রেখে যান। দেশে ফিরে যাওয়া হয়নি, বাহান্ন বছর বয়সে প্রবাসেই তাঁর জীবনাবসান।

আর একজন সন্ন্যাসীর নাম জ্ঞানসম্পদ, তিনি এসেছিলেন সুদূর কোরিয়া থেকে। দেশে ফেরা হয়নি, বুদ্ধভূমিতেই সত্তর বছর বয়সে দেহরক্ষা। কোরিয়া-থেকে-আসা আর এক সন্ন্যাসীর ভারতীয় নাম সর্বজ্ঞানদেব। পরমপূজ্য নামে আর-এক কোরীয় সন্ন্যাসীর বিবরণও আই-চিং আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন।

পরিব্রাজকদের সংস্কৃত নামের সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য সকলকে বিস্মিত করে। কয়েকটি উল্লেখ না করে পারছি না! চন্দ্রদেব, নিতদক্ষধ্যানাচার্য, প্রজ্ঞাসিংহ, আনন্দ, চিত্তবর্মণ, গৌরবধর্ম, চিন্তাদেব, অর্থদীপ্ত, মহাবিনয়ানবীনাচার্য, জ্ঞানভদ্র, কালচক্র, শ্রদ্ধাবর্মণ, মহাযানপ্রদীপ।

শুধু শ্রদ্ধা ও স্তুতি নয়, কোনও কোনও সন্ন্যাসীর পতন ও দুর্বলতার কথাও আই-চিং বর্ণনা করতে ভোলেননি। সুদর্শন ও সম্মানিত সন্ন্যাসী ছিলেন চিন্তাদেব। মাধ্যমিক ও শতশাস্ত্রে নিপুণ এই দার্শনিক একসময় সিংহলে উপস্থিত হন। স্বয়ং সিংহলরাজ একদিন পরমভক্তিভরে বুদ্ধমন্দিরে পূজারত, সেই সময় এই সন্ন্যাসী গোপনে পবিত্র বুদ্ধদন্তটি সরিয়ে ফেলেন, উদ্দেশ্য নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে নিত্যপূজা করবেন। কিন্তু সজাগ প্রহরীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। অপমানিত ও অধঃপতিত এই সন্ন্যাসীর আর দেশে ফেরা হয়নি। সিংহলী সূত্রের খবর, দক্ষিণ ভারতের কোথাও তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই চৌর্যপ্রচেষ্টার পরে সিংহল সম্রাট পবিত্র বুদ্ধদন্তের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। সাধারণ মানুষের ধারণা, এই পবিত্র দন্ত যদি কখনও দেশ ছাড়া হয় তাহলে লঙ্কা আবার রাক্ষসরাজত্বে পরিণত হবে। বুদ্ধের দাঁতের ইতিহাস রোমাঞ্চকর। এই দাঁতটিই এক সময় পুরিতে ছিল, যার জন্য এই পুণ্যস্থানের আদি নাম 'ওদন্তপুরি'।

ভারত ও চিন ভূখণ্ডের নৃপতিরা বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের যে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন তার নানা প্রমাণ আই-চিংয়ের ভ্রমণবৃত্তান্তে রয়ে গিয়েছে। স্বয়ং বুদ্ধ যেমন রাজকুমার, তেমন বহু উচ্চবংশের আদরে লালিত সন্তানরাও পরবর্তী কয়েক শতকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছেন।

একজনের নাম হুয়েন-হুই, এঁর বাবা ছিলেন চিনা সৈন্যবাহিনীর জেনারেল। এই তরুণ সন্ন্যাসী স্থলপথে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। কাশ্মীরের পরমভক্ত মহারাজা কোনও কথা শুনলেন না, তাঁকে বসালেন রাজহস্তীতে, সঙ্গে রাজকীয় বাদ্য। সন্ন্যাসী হুয়েন-হুই যেখানে রাত্রি যাপন করতেন সেই নাগহ্রদপর্বতবিহারে কাশ্মীরের মহারাজা প্রতিদিন

রাজকীয় খাবার পাঠাতেন। শোনা যায় এই বিহারে পাঁচশো বৌদ্ধশ্রমণ বসবাস করতেন। পরম পবিত্র এই পর্বতবিহার, এখানেই আর্য আনন্দের শিষ্য মধ্যযানটিক ড্রাগন-রাজাকে বৌদ্ধধর্মান্তিরিত করেছিলেন।

রাজা এই স্মরণীয় দিনটিকে অবিস্মরণীয় করে তুলবার জন্য তাঁর বন্দিশালা থেকে এক হাজার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদে অবাধগতি ছিল মধ্যযানটিকের, বিশিষ্ট রাজ-অতিথি তিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁর মধ্যে প্রবল হতাশা এল এবং রাজ-আশ্রয় ত্যাগ করে উদাসী ভিক্ষু হুয়েন-হুই চললেন দক্ষিণের পথে।

পথে পরমপবিত্র বোধিবৃক্ষতলে তিনি অনেক উপাসনা করলেন, গৃধ্রকূট পর্বতে নিঃসঙ্গ বিহার করলেন, তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না, নেপালে সেই সময় বেশ কিছু বিষাক্ত গাছগাছড়ার প্রাদুর্ভাব হয়, এই সব লতার সংস্পর্শে বেশ কিছু লোকের মৃত্যু হয়।

আই-চিং বর্ণিত তরুণ তাপস চ্যাং-সিন-এর কথাও কিছুতেই ভোলা যায় না। বৌদ্ধগাথা থেকে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু অবিস্মরণীয় কাব্য সৃষ্টি করেছেন। বোধ হয় এই কাহিনিটি তাঁর নজরে আসেনি, এলে আমরা আর এক অভিনব 'দেবতার গ্রাস' পাঠ করবার সুযোগ পেতাম। নিতান্ত বাল্যবয়সে সংসারের মায়াবন্ধন কাটিয়ে এই নিত্যদক্ষধ্যানাচার্য মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী হন। ভগবান বুদ্ধের বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। যথাসময়ে তিনি রাজদানী লো-ইয়াংয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বিশেষ চেষ্টায় সম্রাটের দর্শন মিলল। বিনীত সন্ন্যাসী জানালেন, তাঁর ইচ্ছা দূরদূরান্তে ন'টি রাজ্যে ধর্মপ্রচারে নির্গত হবেন এবং একই সঙ্গে প্রজ্ঞাসূত্র নামে একটি প্রয়োজনীয় বই রচনা করবেন। সম্রাট সানন্দে অনুমতি দিলেন।

শুরু হল অজানা দেশে তীর্থ যাত্রার প্রস্তুতি। বহু নদ নদী পেরিয়ে সারা দক্ষিণ চিনভ্রমণ সাঙ্গ হল, সেই সঙ্গে চলেছে গ্রন্থ রচনা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন ভিক্ষু নিত্যদক্ষধ্যানাচার্য। এরপর সমুদ্রতটে এসে

জাহাজে চড়লেন কলিঙ্গ বন্দরের উদ্দেশে। সেখান থেকে মোলু-ইউকুও।

অধ্যাপিকা লতিকা লাহিড়ি আমার মতো সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য জানিয়েছেন. দেশটি সুবর্ণদ্বীপ। এই দেশে যাবার জন্যই সন্ন্যাসী একটি মালবাহী জাহাজে উঠে বসেছেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, সেবার সমুদ্র পথে প্রবল দুর্যোগ। টাইফুনে আক্রান্ত জাহাজ ডুবতে বসেছে। প্রাণরক্ষার তাগিদে জাহাজের কর্মী ও বণিকরা একটা ছোট চিনা নৌকায় (জাঙ্ক) উঠে বসলেন। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা।

জাহাজের ক্যাপটেন একজন বুদ্ধ-অনুরাগী, তিনি সন্ন্যাসীকে বললেন, চলে আসুন নৌকায়। তখনও ডুবন্ত জাহাজে অনেক অসহায় যাত্রী। মানবপ্রেমী সন্ন্যাসী বললেন, 'আপনি অন্য কাউকে তুলে নিন, এখন আমার যাবার সময় নয়।' অপরের প্রাণরক্ষার প্রচেষ্টায় আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত ভগবান বুদ্ধের পূজারী চিনের সন্ন্যাসী। ধীরে ধীরে ডুবন্ত জাহাজে দাঁড়িয়ে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হলেন বুদ্ধের শরণাগত পঁয়ত্রিশ বছরের মানবপ্রেমী তরুণ সন্ন্যাসী নিত্যদক্ষধ্যানাচার্য। দূর থেকে শেষ যা দেখা গিয়েছিল, ডুবন্ত জাহাজে পশ্চিমমুখী হয়ে তিনি অমিতাভ বুদ্ধের নাম শরণ করছেন।

পরিব্রাজক, শ্রমণ, ভাষ্যকার, ইতিহাসবিদ, কবি ও বুদ্ধের শরণাগত ভারতপ্রেমী আই-চিংয়ের বিচিত্র জীবনকথা দুই দেশের আড়াইশো কোটি মানুষের মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে প্রচারিত হবে এইটাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা দুই দেশের মহামানবদের ইতিহাস হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে সমর্থ হয়নি। এমন একজন মৃত্যুভয়হীন মানুষ যে একদিন এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন তাও আমার জানা হত না যদি না অধ্যাপিকা লতিকা লাহিড়ি বেজিংয়ের সুবিশাল গ্রন্থাগারে বসে ধৈর্য সহকারে আই-চিংয়ের অন্যতম অমর কীর্তির ইংরেজি অনুবাদ করতেন।

শুধু একখানি বই নয়, লতিকা আমাদের জানিয়েছেন দেশে ফিরে গিয়ে পরম ধৈর্য সহকারে সহযোগীদের নিয়ে আই-চিং দু'শো ত্রিশ খণ্ডে ছাপ্পান্নটি মহামূল্যবান ভারতীয় গ্রন্থের চিনা অনুবাদ সম্পন্ন করেছিলেন। আই-চিংয়ের অবিস্মরণীয় ইতিহাস বইতে যে ছাপ্পান্নজন সত্যান্বেষী

শ্রমণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাঁদের প্রায় কেউই দীর্ঘজীবী হননি। অনাহারে ও পথের ক্লান্তিতে দূর দেশের অচেনা পরিবেশে তাঁদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, স্বপ্ন সম্ভব করে অনেকেই তাঁদের পরমপ্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে সক্ষম হননি।

সেদিক দিয়ে আই-চিং ভাগ্যবান, লতিকা লাহিড়ি আমাদের জানিয়েছেন আই-চিং ৭১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। ওই বছরে দেহাবসানের সময় তাঁর বয়স ৭৯। 'বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা নয়, জানবার জন্যেই জীবন' এই মন্ত্রটিকে নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে সন্ন্যাসী ও সংগ্রহক আই-চিং মানব সমাজের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করে গিয়েছেন।

সুযোগ কম আসেনি বইপড়ার, সাপ ব্যাং অনেক পড়েছি, আবার বিস্ময়ে নতমস্তক হবার মতো বইও মাঝে মাঝে পড়ে থাকি। স্বীকার করতেই হবে ইদানীং সবার উপরে রয়েছেন আই-চিং এবং তাঁর রচিত কাউ সেং-চুয়ান। দেড় হাজার বছর ধরে এই বই চিনা পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বাংলার মেয়ে লতিকা লাহিড়ি বেজিংয়ে গিয়ে এই বই পুনরুদ্ধার করেছিলেন আমাদের জন্যে। অনুবাদিকাকে দেখবার সাধ হয়েছিল, কিন্তু আই-চিংয়ের মতো তিনিও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁকে নমস্কার জানানো ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি এই পরিচ্ছেদ রচনার সময়?

লাওৎসের অমৃতবাণী

কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলি পড়েছি সাহিত্যজীবনের মধ্যপথে। কিন্তু তারও অনেক আগে কর্মজীবনের শুরুতেই চিনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক ইংরেজ সায়েবের মাধ্যমে যিনি ভারত ও চিন দুই সভ্যতাকেই বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার নোয়েল বারওয়েলের শেষ বাবু আমি, হাইকোর্টের লাগোয়া টেম্পল চেম্বার্স আমার অবিস্মরণীয় কর্মক্ষেত্র যার কিছু বিবরণ রয়েছে আমার প্রথম বই 'কত অজানারে' বইতে। এ চেষ্টা এই বিদেশির সঙ্গে গড়ে উঠেছিল এক অদ্ভুত ধরণের সখ্যতা। সেই সময়েই চিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। সায়েব তখন আইনের এক বই লিখছেন! বিষয় 'ল অফ মাস্টার অ্যান্ড সার্ভেন্ট'—প্রভু এবং ভৃত্য সম্পর্কে এদেশে যত আইন আছে তার সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ।

এই বইয়ের কিছুটা তিনি বলে গেলেন এবং আমি লিখে নিলাম শর্টহ্যান্ডের সাঙ্কেতিক রেখায়।

প্রতিটি বাক্য তখন আমার জন্যে নতুন অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দিচ্ছে। দেশে-বিদেশে কর্মী মানুষ এবং তার নিয়োগকর্তার মধ্যে কত বিচিত্র সম্পর্ক যুগযুগান্ত ধরে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের তো কথাই নেই।

লম্বা নোট মনের সুখে টাইপ করে চলেছি। কিন্তু সায়েবের মন আজ অন্য কোথাও পড়ে রয়েছে। তিনি কয়েকবার আড়চোখে দেখে গেলেন আমি কতখানি এগিয়েছি। আমাকে ডিস্টার্ব না করে কাজের অগ্রগতির ওপর নজর রাখার একটা বিশেষ ধরন ছিল তাঁর। ভাবটা এমন যেন আমিই এই মুহূর্তে এখানকার অধীশ্বর এবং তিনি ভয়ে-ভয়ে উঁকি মারছেন।

অবশেষে সায়েবের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। তিনি বললেন, "অনেকে

হয়েছে মাই ডিয়ার বয়! আজ আর কাজ নয়। এখন আমাদের ছুটি। কাজকে ফাঁকি দিতে যে না জানে সে কেমন করে মাস্টার অ্যান্ড সার্ভেন্ট সম্পর্কে বই লিখবে? আমার তো ইচ্ছে 'ফাঁকি' সম্পর্কে একটা সুবৃহৎ অধ্যায় জুড়ে দেব এই বইতে যদি প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যানের কর্মকর্তা মিস্টার জন অ্যাডামের কোনো সিরিয়াস আপত্তি না থাকে!"

যাঁর কাজ তিনিই ফাঁকি দেবার পরামর্শ দিচ্ছেন! এমন মধুর বিচিত্র অবস্থায় খুব কম লোকেই পড়েছে! আমি তখনও আরও দু' একটা পাতা টাইপ করে ফেলতে আগ্রহী। কিন্তু এবার সায়েব গম্ভীর ভাষায় নির্দেশনামা জারি করলেন—"হল্ট! এখনই কাজ বন্ধ্ না হলে আমি লক-আউট ঘোষণা করবো।"

টাইপ রাইটার মেশিন বন্ধ রেখে আমি সোফায় এসে বসলাম ওঁর মুখোমুখি হয়ে।

সুরসিক সায়েব এবার ইংরিজিতে কবিতা মুখস্থ বলতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বললেন, "কয়েক রাত ধরে আমি নানা জ্ঞান আহরণ করে চলেছি। রাত্রে ভালো ঘুম আসছে না, তাই চলছে কিছু মজার পড়াশোনা। তুমি শোনো একটা কবিতা।"

যে ইংরিজি কবিতাটি সায়েব শোনালেন তার মোটামুটি অর্থ হলো :

"যে অন্যকে জানে সে পণ্ডিত,
কিন্তু নিজেকে যিনি জানেন তিনিই জ্ঞানী।
অন্যকে যিনি জয় করেন তাঁর পেশী অবশ্যই শক্তিমান,
কিন্তু নিজেকে যিনি জয় করেন তিনিই বলবান।
যাঁর সন্তোষ এসেছে একমাত্র তিনিই ধনী
যিনি দৃঢ়সংকল্প; কেবল তিনিই মনোবলের অধিকারী।
যিনি ভারসাম্য হারান না তিনিই টিকে থাকেন,
মৃত্যুর পরেও লোকে যাঁকে স্মরণ করে তিনিই দীর্ঘজীবী।"

এবার সায়েবের প্রশ্ন : "কে এই সত্যি কথাগুলো এমন মজার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন বলো তো?"

"নিশ্চয় কোনো ইউরোপীয় সত্যদর্শী - মানুষকে এখন তাঁরা কত

বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করে চলেছেন।"

"হলো না!" সায়েব আমাকে নম্বর দিলেন না। "ইউরোপের লোকেরা কর্মী, কিন্তু জ্ঞানী নয়!" সায়েব আবার রসিকতা করলেন।

"একমাত্র প্রাচ্যের ঋষিরাই মানুষকে এমন নির্ভেজাল জ্ঞান উপহার দিয়ে এসেছেন। নিজেকে জানার এই ব্যাপারটা লেখা হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগে। চিনা ঋষি এই কবিতা লিখেছেন তাঁর নাম লাওৎসে, জন্ম খ্রিস্টের জন্মের ৫৭০ বছর আগে—বুদ্ধের থেকেও বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি।"

আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বললেন, "শোনো আর একটি লাওৎসে-বাণী—

যিনি জানেন তিনি মুখ খোলেন না।
যিনি মুখ খোলেন তিনি জানেন না!"

"এর থেকে সত্যি কথা এই পৃথিবীতে কী হতে পারে?" সায়েব হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন।

"কোন মানুষ সবচেয়ে সম্মানের যোগ্য এই প্রশ্নেরও ভারি সুন্দর উত্তর দিয়েছেন লাওৎসে—

ভালোবাসা অথবা ঘৃণা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না
লাভ-লোকসানের হিসেব তাঁর কানে পৌঁছয় না,
সম্মান অথবা অসম্মান কিছুতেই তিনি যখন বিচলিত নন
পৃথিবীর সব সম্মান তখনই তাঁর কাছে পৌঁছয়।"

আমি মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি সায়েবের সরস চিনা আবৃত্তি। সায়েব বললেন, "হাজার-হাজার বছর আগে সংসারের কঠিন সত্যগুলো চিনের ঋষিরা কী সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন দেখো! লাওৎসে মানুষকে সাবধান করে দিচ্ছেন এক কবিতায়, যার নাম 'রেসের ঘোড়া'—

সন্তুষ্টির অভাব থেকে বড় অভিশাপ নেই এই পৃথিবীতে
বিত্তের বাসনাই আমাদের এক নম্বর পাপ।
কেবল সন্তুষ্টি পেলেই যিনি সন্তুষ্ট হতে রাজি
একমাত্র তিনিই হবেন চিরসন্তুষ্ট।"

আড়াই হাজার বছর আগেকার এই সব চিনা ঋষির বচন থেকে আমি

উপকৃত হচ্ছি অবশ্যই, কিন্তু সায়েবকে সবিনয়ে মনে করিয়ে দিতে হলো আমার ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা সীমিত, যা সুশিক্ষিতদের সহজ আয়ত্তে তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা।

এই ধরনের কথাবার্তা সায়েব যে পছন্দ করেন না তা তিনি সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, "জ্ঞান সঞ্চয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কোনো সম্পর্ক নেই। সবসময়ে মনে রাখবে, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানেই তোমার পরিপূর্ণ অধিকার।"

এরপর সায়েব সকৌতুকে আরও একটি লাওৎসে-বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—

"নিজের বাড়ির দরজা না পেরিয়েই জানা যেতে পারে
পৃথিবীর কোথায় কখন কী ঘটছে।
নিজের জানলা দিয়ে বাইরে না তাকিয়েও
আমরা পেতে পারি স্বর্গের স্বাদ।"

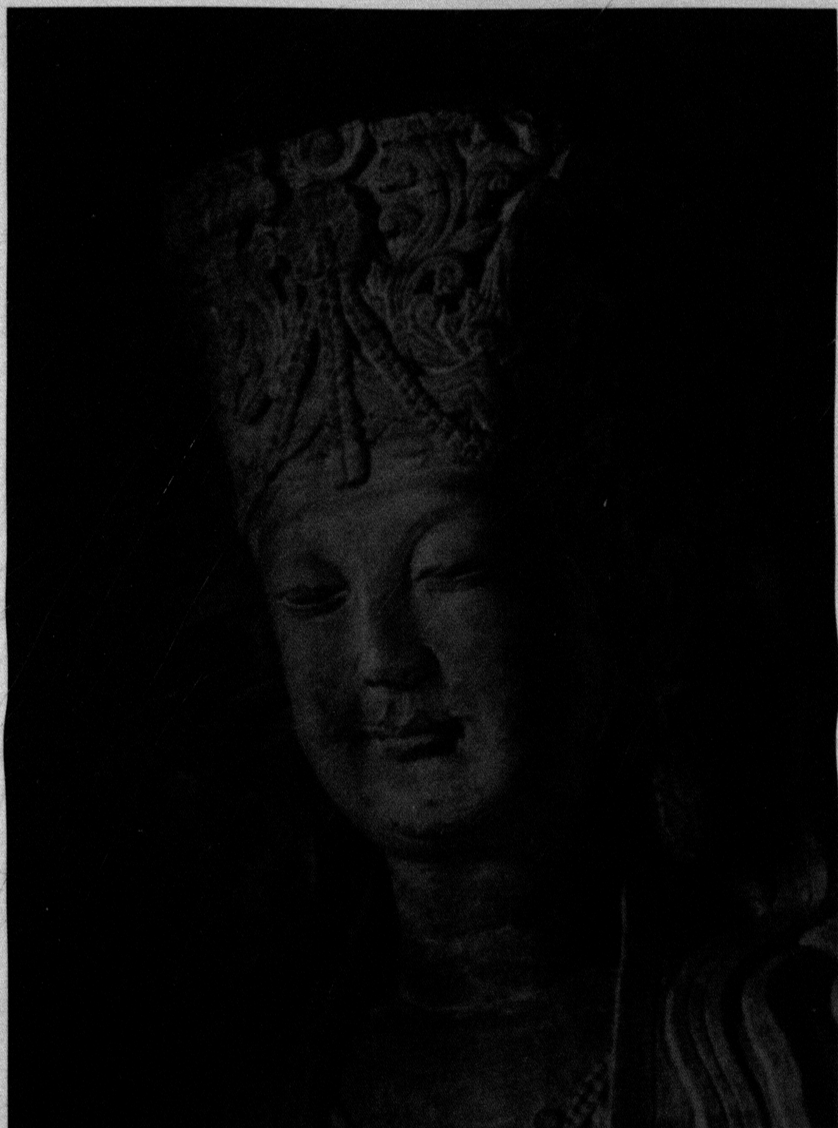
অথবা—

"যে যত বেশি জ্ঞানের কচকচিতে নিমগ্ন
সে তত কম জানে।
ঋষিরা তাই ভ্রাম্যমাণ না হয়েই জ্ঞান আহরণ করেন,
না দেখেই সব বুঝে নেন,
কিছু না করেই সব কর্ম সম্পন্ন করেন।"

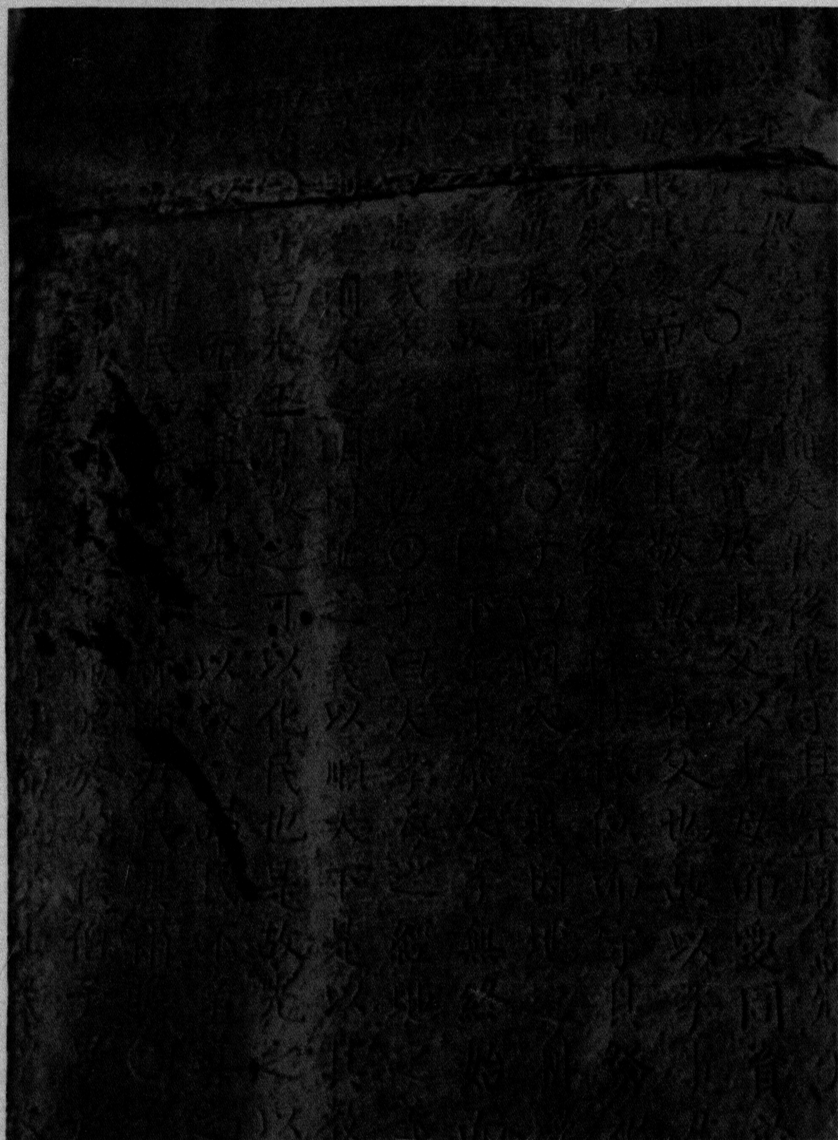
লাওৎসেবাদী চিনা ঋষিদের একটা ছবি আমি তখন মনের মধ্যে আঁকবার চেষ্টা করছি।

রসিক সায়েব বললেন, "প্রাচীন চিনা তত্ত্বজ্ঞানীদের নিয়ে ইউরোপে অনেকে এখন রসিকতা করছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই সব লোক বোকামি করছেন। এবং একদিন তাঁরা নিজেদের লজ্জা ঢাকবার পথ পাবেন না।"

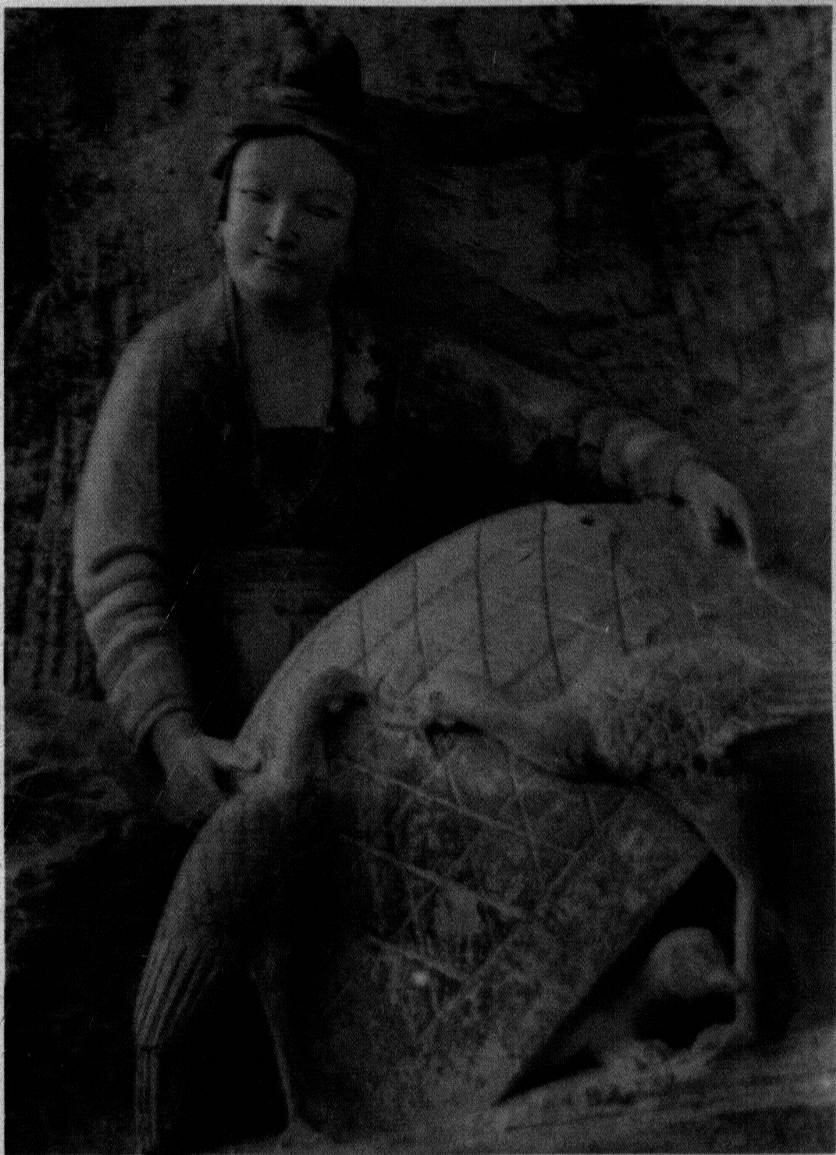
"চিনা ঋষিবাক্যের প্রধান আকর্ষণ এর সরলতা। মূল বাণীটি বোঝবার জন্যে কোনো অভিধান খুলে বসবার দরকার নেই। আর একটি প্রধান গুণ হলো এগুলি খুব ছোট—বিন্দুর মধ্যেই তুমি সিন্ধু দর্শন করতে পারো।"



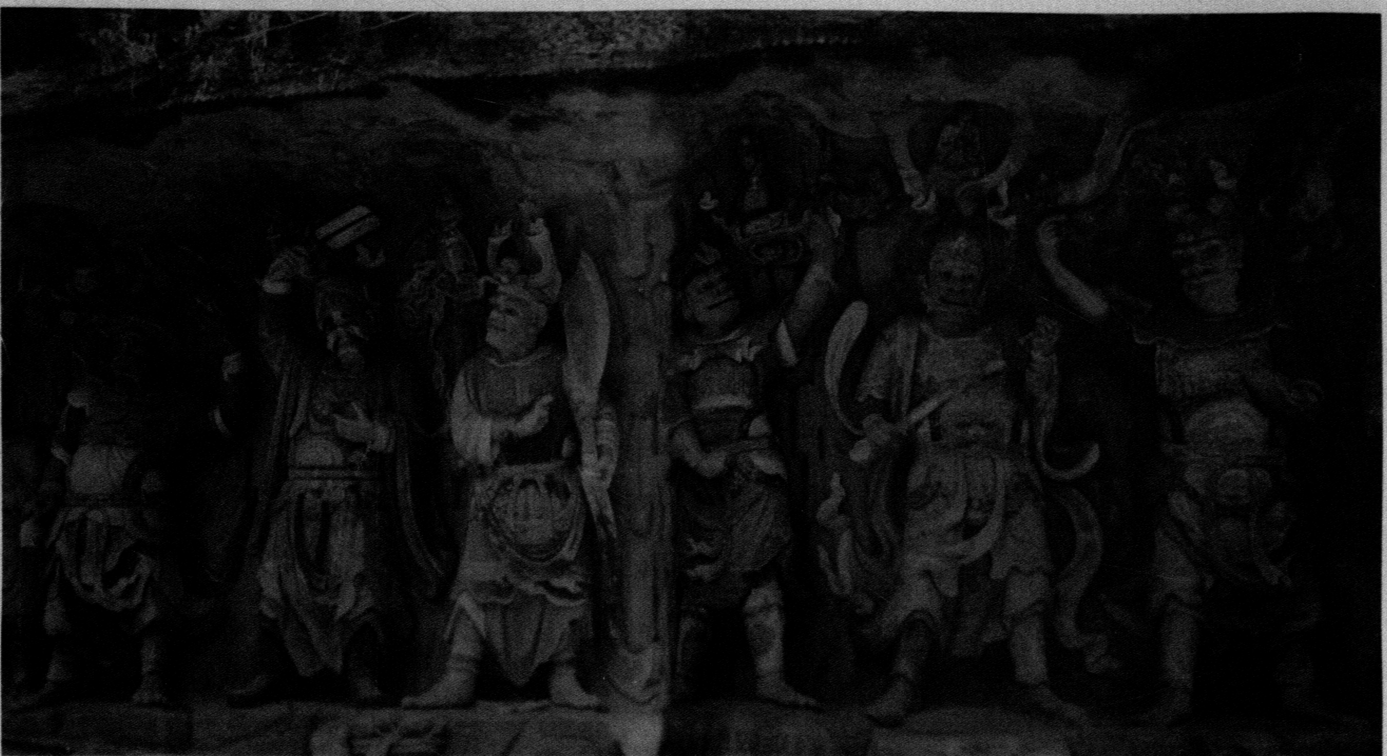
গ্রোতো ১৩৬-এ বোধিসত্ত্বের ক্লোজ-আপ এক অনুপম চিনা শিল্পনিদর্শন।



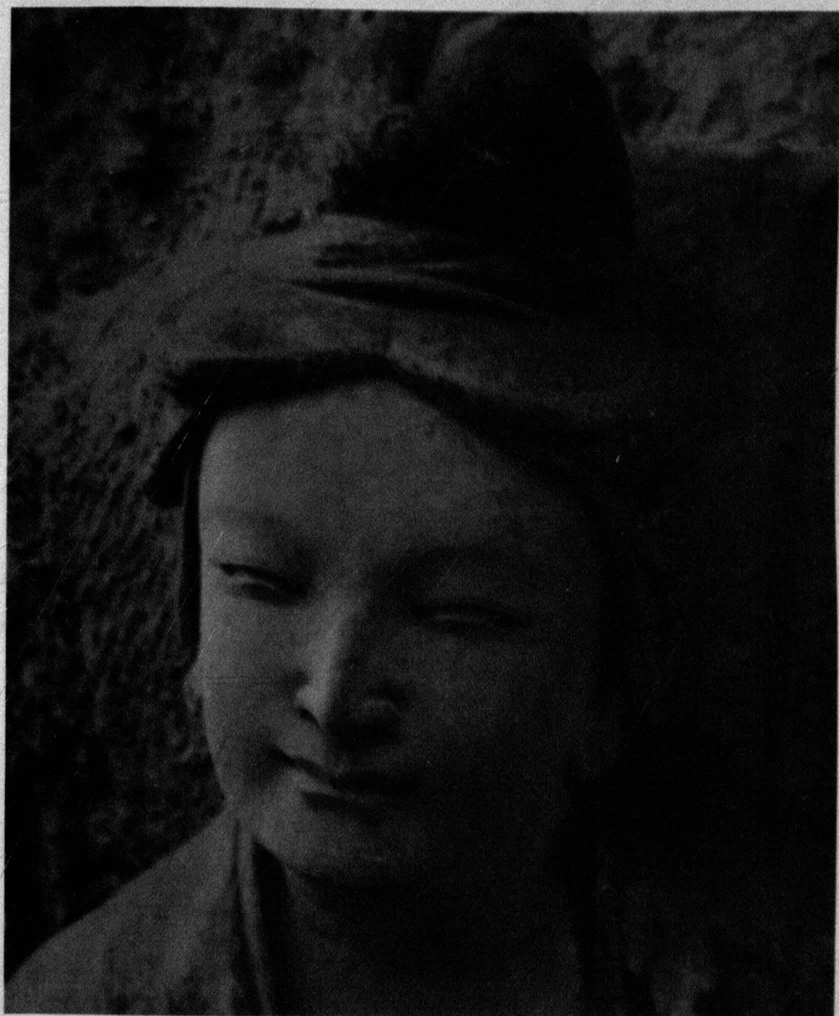
সং বংশের সময় দাসু গ্রোতোয় দেওয়ালে খোদাই করা কনফুসিয় গ্রন্থের বাণী।



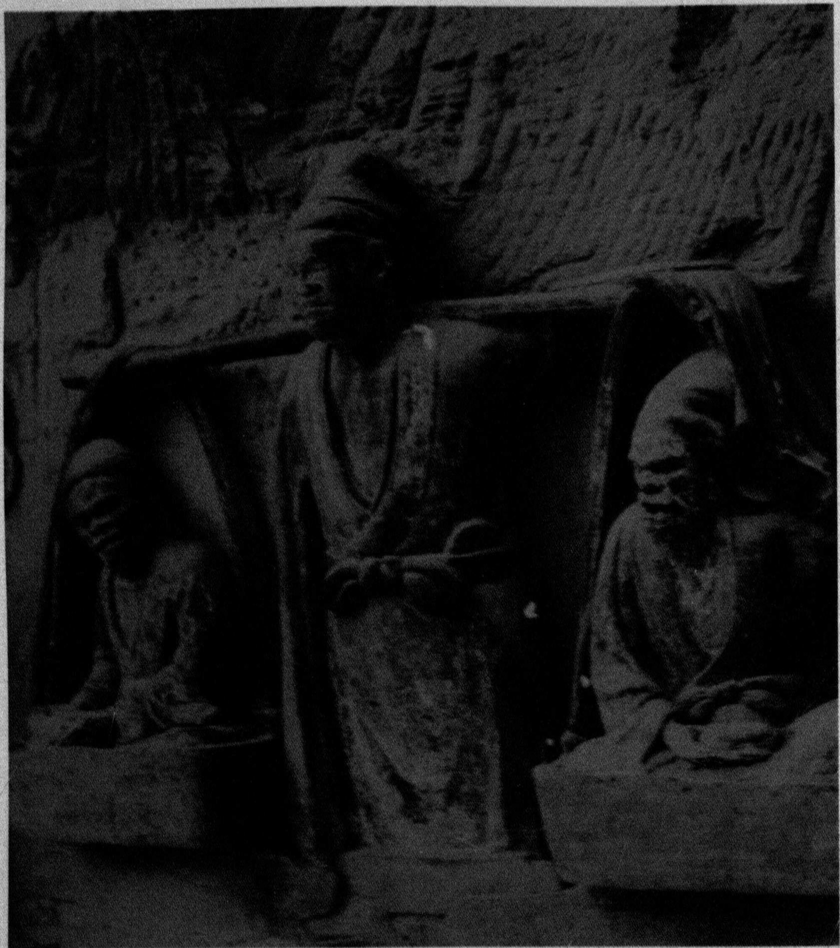
শোনা যায়, বন্যকুক্কুটকে গৃহপালিত করার কৃতিত্ব ভারতের, যদিও চিকেনরোস্ট পৃথিবীকে চিনের প্রীতি উপহার। কিন্তু বৌদ্ধযুগে সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবপ্রেম আজও মানবসমাজকে অভিভূত করে। পক্ষীপ্রেমী এই চিনা সুন্দরীর মূর্তি পৃথিবীর এক অন্যতম শিল্প সম্পদ। এই মূর্তিটি দেখতে শিল্পপ্রেমীরা বারবার ছুটে আসেন বাওদিংশান গ্রোতোয়।



দাসু গ্রোতোয় যে ন'জন ভীতি উৎপাদক আইনরক্ষক দেবতার মূর্তি আছে তাঁদের মধ্যে ছ'জনকে এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



বাওদিংশান গ্রোতোয় কুক্কুটপ্রেমী সুন্দরীর ক্লোজ আপ।



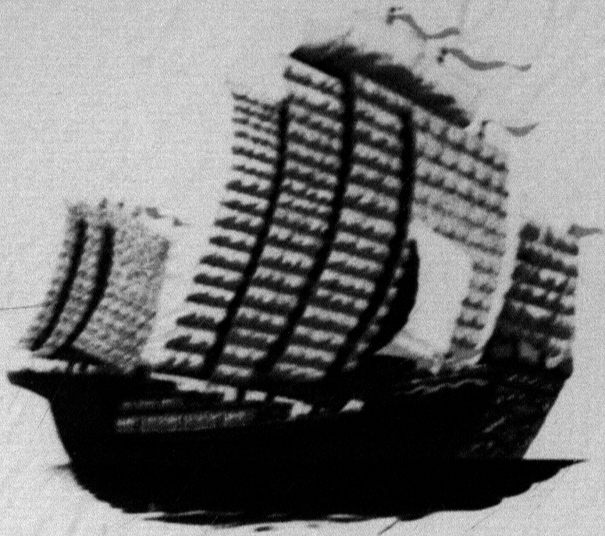
শুধু অন্ধ ভক্তি নয়, শাক্যমুনির সমালোচনাও দাসু গ্রোতোর শিল্পকার্যে কিছু কিছু প্রতিফলিত হয়েছে। কেউ কেউ সে যুগে, বুদ্ধের বাবা-মাকে ত্যাগ করে অজানার সন্ধনে বেরিয়ে পড়া পছন্দ করেননি। তাঁরা পর্বতগাত্রের শিলাকীর্তিতে এই অজানা মানুষটির প্রশস্তি গেয়েছেন—যে ভিক্ষায় বেরুবার সময়েও অসুস্থ বৃদ্ধ জনকজননীকে কাঁধে করে বহন করতো। আর নির্দয় শাক্যমুনি কিনা নিজ-ধর্ম প্রচারের জন্য বাবা-মাকে ত্যাগ করলেন!

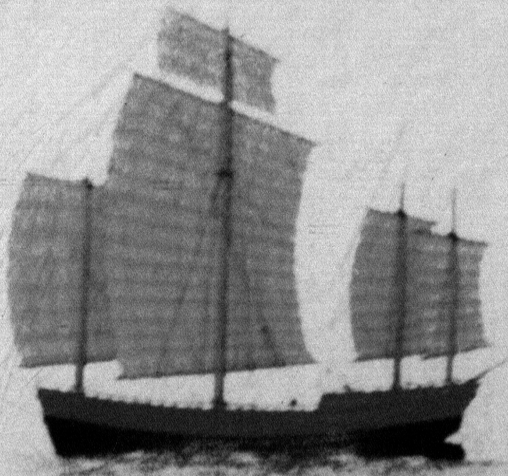


এক শিল্পকর্মের প্রতিবাদে আর এক অবিনশ্বর শিল্পকর্ম, ঠিকানা চিনের দাসু গ্রোতো। যেসব বিধর্মী প্রচার করলেন বুদ্ধ বাবা-মাকে ত্যাগ করেছিলেন এই ভাস্কর্যে তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শাক্যমুনি তাঁর প্রয়াত পিতার কফিন বহন করেছিলেন।



বুদ্ধের দুই প্রিয় শিষ্য আনন্দ ও রাহুল শোকার্ত অবস্থায় শাক্যমুনিকে প্রয়াত পিতার শবাধার বহন করতে দেখছেন।





চিনের সঙ্গে যোগাযোগকারী বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রগামী তরী। ওপরে অ্যাডমিরাল চেং হো-র ট্রেজার শিপ। এই জাহাজেই বাংলা থেকে পাঠানো জিরাফ উপঢৌকন চিনে গিয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক বিপত্তি ঘটিয়েছিল। নিচে চিনা জাংক, ডুবন্ত জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে এই নৌকায় উঠে নিজের প্রাণ বাঁচাতে অস্বীকার করেছিলেন চিনের ভুবনবিদিত এক শ্রমণ।



বাংলার সুলতান প্রেরিত জিরাফ নিয়েই চিনা সম্রাট একসময় বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এবং উপহার ফেরত দিয়েছিলেন। ভুবনবিদিত নৌসেনাপতি চেং হো পরে খোদ আফ্রিকা থেকে এই জিরাফ সংগ্রহ করেছিলেন মিং বংশের চিন সম্রাটের প্রীতি উৎপাদনের জন্য।



ইংল্যান্ডের রাজা চিনের সম্রাটের কাছে তাঁর অ্যাম্বাসাডর একস্ট্রাঅর্ডিনারি লর্ড ম্যাকার্টনিকে পাঠিয়েছিলেন ১৭৯২ সালে চিনে বৃটিশ পণ্য প্রচারের জন্য। লর্ড ম্যাকার্টনির সমুদ্রযাত্রার শুরুতেই ব্রিটেনের পত্রিকায় জেমস পিলারি এই কার্টুন এঁকেছিলেন।



প্রাচীন চিত্র। ইমপিরিয়াল গার্ডেনে বসে চিনের সম্রাট অনুগত প্রজাদের আবেদন-নিবেদন শুনছেন। সাধারণ মানুষের চোখে সম্রাট ছিলেন মহাশক্তিমান অথচ মহানুভব। মূল ছবিটি এখন আছে হংকং মিউজিয়াম অফ আর্টে।



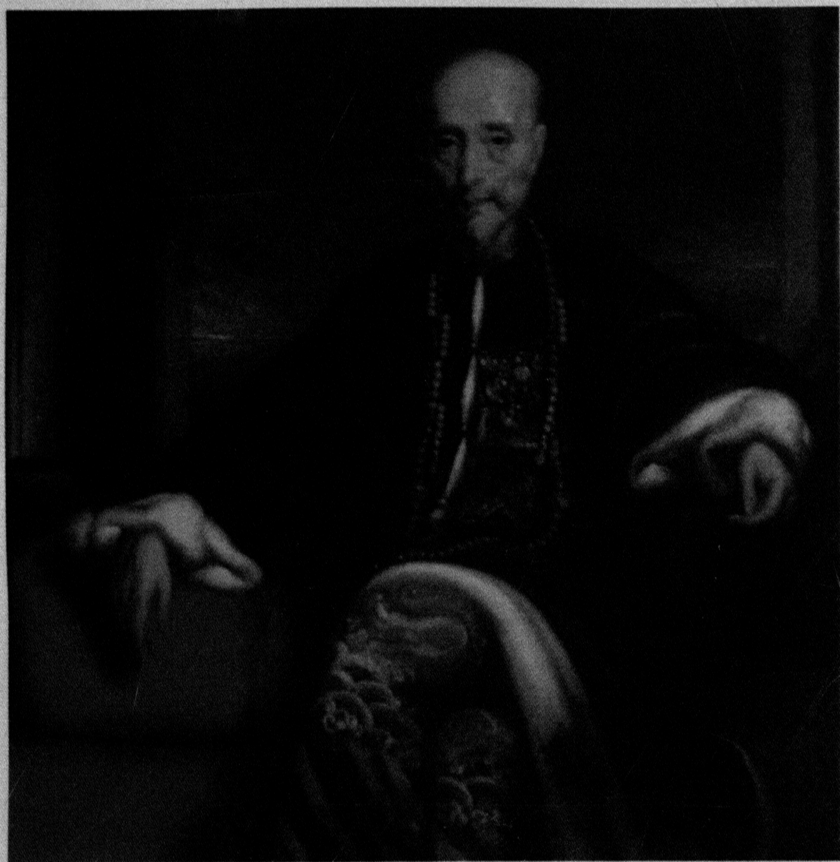
চিনা সম্রাটের সভায় পরিচয়পত্র পেশ করতে এসে (১৪ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩) ব্রিটেনের বিশেষ দূত লর্ড ম্যাকার্টনি শুনলেন প্রাচ্যদেশের প্রথা অনুযায়ী সম্রাট কিয়ানলং-এর সামনে তাঁকে বেশ কয়েকবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হবে। এইভাবে ধুলণ্ঠিত হতে সাহেবের বেশ আপত্তি। অবশেষে জানা গেলো আজ সম্রাটের ৮৩তম জন্মদিন। তিনি বেশ খোশমেজাজে থাকায় ইংরিজি কায়দায় নতজানু হয়েই লর্ড ম্যাকার্টনি পার পেয়ে গেলেন। চিন সম্রাটের এই দুর্লভ ছবি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে।



আফিমের নেশায় একসময় সমস্ত চিনা জাতটাই ডুবতে বসেছিল। এই মাদকের সিংহভাগ আসতো বেআইনী পথে ভারত থেকে।



উনিশ শতকের চিনা আফিম ‘ডেনের’ এই ছবি দেখতে হলে আপনাকে সিডনির নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট লাইব্রেরিতে যেতে হবে। খাতায় কলমে চিনে আফিম নিষিদ্ধ, কিন্তু ভয়াবহ এই নেশায় সমস্ত দেশটা একসময় পঙ্গু হবার পথে। ঘুষ দিয়ে হয় না এমন কাজই ছিল না উনিশ শতকের চিনে। অবশেষে অস্বাভাবিক এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য অত্যন্ত সৎ, আদর্শবাদী, পণ্ডিত লিন সে-সুকে চিনা সরকার ১৮৩৯ সালে গুয়াংসুর কমিশনার নিযুক্ত করলেন। দুঃসাহসিক এই কমিশনার ফেরেববাজ বিদেশি ব্যবসায়ীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিলেও শেষ পর্যন্ত নিজের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। এই কমিশনার রানি ভিক্টোরিয়াকে তাঁর নিজের দেশের লোকদের কুকীর্তি সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেছিলেন তা আজও পড়বার মতন।



উনিশ শতকে বিশ্বের ধনপতিদের অন্যতম চিনা কমিশন এজেন্ট হাউকুয়া। ১৮৩৪ সালে এঁর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ অন্তত পাঁচ কোটি ডলার। বিদেশি মার্চেন্ট এবং চিনা চা উৎপাদকদের মধ্যে ইনি দালালি করতেন। এই ছবিটি হংকং-এর বিখ্যাত বৃটিশ কোম্পানি জার্ডিন ম্যাথিসনের সংগ্রহে আছে।

সায়েব বললেন।

আমার খুব ভালো লাগছে সায়েবের কথা। চাইনিজ জুতোওয়ালা ছাড়া আর কোনো চৈনিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ছেলে-ভুলনো অ্যাডভেঞ্চার গল্পে কিছু চিনা গুণ্ডার কথাও পড়েছি, যারা মাদকদ্রব্যের চালান করে এবং খুনোখুনি বাধিয়ে অবশেষে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে।

সায়েব বুঝলেন আমার অবস্থা, কিন্তু বললেন, "কম বয়সে চিনা ঋষিদের বাণীর ওপর নির্ভর করেই জীবনদর্শন গড়ে তুলবার লোভ হয়েছিল আমার। বিশেষ করে আর্থার ওয়েলির অনুবাদ পড়ে।"

এই ঋষিরা কেমন তা সায়েব ব্যাখ্যা করলেন আর একটি লাওৎসে-বাণী উদ্ধৃতি দিয়ে—

"ঋষির কোনো বাঁধাধরা মতামত বা অনুভূতি নেই,
কিন্তু নানা মানুষের মতকেই তিনি নিজের বলে মনে করেন!
ভালোকে আমি অবশ্যই ভালো বলি,
কিন্তু খারাপকেও ভালো বলতে দ্বিধা নেই আমার।
গুণময় হবার এইটাই সুবিধা।
যা সৎ তাকে আমি বিশ্বাস করি
যা অসৎ আমি তাকেও বিশ্বাস করি;
গুণময় হবার একটাই গুণ।"

সায়েব এমনভাবে ইংরিজি আবৃত্তি করছেন যে আমি হাসি চেপে রাখতে পারছি না।

সায়েব এবার গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, "যখন সময় পাবে তখন একটু ভেবে দেখো। খুব গভীর তত্ত্ব কথা বলা হচ্ছে—ভালোও ভালো, খারাপও ভালো। অত্যন্ত দুরূহ কথা এমন সহজ করে বলেছেন লাওৎসে যে মনে হচ্ছে কোনো একজন কবি কিছু না ভেবেই লোক হাসাবার জন্যে কবিতা আওড়ে চলেছেন!"

আমাদের চাইনিজ জ্ঞানসঞ্চয়ন বেশ জমে উঠেছে! সায়েব বললেন, "চিনা ঋষিদের বহু মূল্যবান উপদেশ অনেকদিন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে

আছে। কিন্তু আমাদের উচিত যাঁরা আমাদের দেশের মাথার ওপর বসে আছেন তাঁদের সকলকে এইসব প্রাচীন জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত করা।"

আমি সায়েবের জ্ঞানের গভীরতা দেখে অভিভূত হচ্ছি। সায়েব রসিকতা করলেন, "প্রাচীন চিনা ঋষিরা কোনো সময়েই বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যকে খুব উচ্চাসন দিতেন না, মাই ডিয়ার বয়। মনে রাখবে, অতিমাত্রায় পণ্ডিত্যকের সব সময় সন্দেহের চোখে দেখা উচিত।

আবার চিনা উদ্ধৃতি—

"অতিমাত্রায় জ্ঞানের জন্যেই
মানুষের এখন এতো অশান্তি।
পাণ্ডিত্যের জোরে যারা রাজত্ব চালাতে চায়
তারা সত্যিই অভাগা!"

এবারও আমার হাসি বন্ধ হচ্ছে না। সায়েবও একটু হাসলেন, কিন্তু আমাকে সাবধান করে দিলেন, অনেক গভীর সত্যকে পৃথিবীর মানুষ প্রথমে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সায়েব ঘোষণা করলেন, "চিনা জ্ঞানকে বোধগম্য করে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন চাইনিজ খাদ্য।"

টেলিফোনে স্পেনসেস হোটেলের রুম সার্ভিসে চাইনিজ খাবারের অর্ডার দিলেন।

একটুপরেই খাবার এলো। কিন্তু সায়েব হুঙ্কার ছাড়লেন, "চপস্টিক কোথায়?" বুঝিয়ে দিলেন ওই কাঠি না-হলে নাকি চিনা খাদ্যের অর্ধেক স্বাদ উবে যায়।

এবার শুরু হলো আমার চিনা কাঠির ট্রেনিং। স্টিক চালনা করা এবং তা আয়ত্তের মধ্যে রাখা কিন্তু বেশ কঠিন কাজ, অনভিজ্ঞ আমি হিমশিম খেতে লাগলাম।

সায়েব মন্তব্য করলেন, "বোঝা যাচ্ছে পূর্বজন্মে তুমি চিনে জন্মাও নি। কিন্তু আমি সামান্য চেষ্টাতেই চিনা কাঠিকে আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম।"

একবার চোখ বুজে কল্পনা করো, তুমি এখন একজন প্রবীণ চিনা ঋষির পদতলে বসে নতমস্তকে পার্থিব জ্ঞান আহরণ করছো। এখন চাইনিজ চপ

স্যুয়ের সঙ্গে একটু-একটু করে কবিতা আস্বাদন করা যাক, তবেই তো স্বর্গীয় চিনা পরিবেশ গড়ে উঠবে আমাদের এই চিনা দিবস উৎসবে।"

সায়েব আস্তে-আস্তে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"সাহসী সৈন্য কখনও হিংস্র হয় না,
প্রকৃত যোদ্ধা কখনও রেগে ওঠেন না।
মহান বিজয়ী কখনও ছোট ব্যাপারে অস্ত্র ধরেন না,
মানুষকে যাঁরা কাজে লাগাতে জানেন বিনম্র হতে
কোন সঙ্কোচ নেই তাঁদের।"

আমি ইতিমধ্যে চিনা চপস্টিক নিয়ে আরও বিব্রত হয়ে পড়েছি।

সায়েব মৃদু হেসে বললেন, "প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন করা যাক। চিনা কাঠি ছেড়ে, এসো আমরা এবার কাঁটা-চামচের সদ্ব্যবহার করি।"

চাইনিজ লাঞ্চের শেষ পর্যায়ে রুম সার্ভিস থেকে চাইনিজ চা এসেছিল।

"চায়ের সঙ্গে জুঁই ফুল মেশাবার মতো উদ্ভাবনী শক্তি একমাত্র চিনারাই দেখাতে পেরেছেন!" সায়েব আমাকে বললেন এবং জানালেন, "আমরা কিন্তু বোকামি করে ফেলেছি! আমাদের উচিত ছিল লাঞ্চের শুরুতেই এই চায়ের আয়োজন করা। কারণ অভিজ্ঞ চিনা নাকি এক-একটি পদের শেষে চায়ের সাহায্যে নিজের জিভ ধুয়ে ফেলার সুযোগ নেন।"

সায়েবের কণ্ঠে চাইনিজ কবিতার উদ্ধৃতিটি আজও আমার মনে আছে। ইংরিজির যথাযোগ্য বাংলা কাব্যানুবাদ হলে সুন্দর হতো। কিন্তু স্মৃতি থেকে আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারছি তাতেই সন্তুষ্ট হতে হবে আমাদের।

সায়েবের বলার ভঙ্গিতে শেষ উদ্ধৃতিটি যে সত্যিই মনোরম হয়ে উঠেছিল তা বলাই বাহুল্য।

রসিকতা ও গাম্ভীর্যের অভাবনীয় সমন্বয় হয়েছিল চিনা ঋষিদের বক্তব্যে। সায়েবও সেই কায়দাতেই চিনা-চর্চায় তাঁর কৃতিত্ব দেখালেন—

"পৃথিবীর সবাই নিন্দায় মুখর, আমার সমস্ত শিক্ষা নাকি
ভুলে ভরা।

যা মহৎ তা তো প্রায়ই মনে হয় ভুল।
যদি আমার শিক্ষা ভুল না মনে হতো
তাহলে বুঝতাম আমাকে কিছুই শেখানো হয়নি।

তিনটি মাত্র হিরে জহরত আছে আমার—
নজরে রেখো, সাবধানে রেখো তাদের।
প্রথমটির নাম 'ভালোবাসা',
দ্বিতীয়টি হলো—'কখনই বেশি নয়',
তৃতীয়—'কোনো ব্যাপারেই প্রথম হয়ো না পৃথিবীতে'।

ভালোবাসার অমৃতে ভয় দূর হয়;
প্রত্যাশার সীমা থাকায়, সর্বশক্তি বিনিয়োগে রিক্ত হই না
আমি,
প্রথম হবার উত্তেজনা মুক্ত হয়ে
আমি প্রতিভার উন্নয়ন করতে পারি।
ভালোবাসা শূন্য হয়ে যায় ভয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে,
প্রথম হবার জন্যে যে নিত্য ছুটবে
সে মরবে।

ভালোবাসা সব আক্রমণেই বিজয়ী
এবং আত্মরক্ষায় অজেয়।
বিনাশ থেকে যাদের রক্ষা করার ইচ্ছে
ঈশ্বর কেবল তাদেরই প্রেমের অস্ত্রে সজ্জিত করেন!"

চাইনিজ চা শেষ হয়েছে আমার।

হাতলবিহীন চায়ের পাত্র থেকে চিনা চায়ের শেষ চুমুকটি নিয়ে সায়েব বললেন, "আমার ক্ষমতা থাকলে ইংলন্ডে সব ইস্কুলে এই শিক্ষাই দিতাম। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র সারাক্ষণ উল্টো শেখানো হচ্ছে মানুষকে। বলা হচ্ছে, ভালোবাসা থেকে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেক বেশি। যে মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট আজকের পৃথিবীতে তার সম্মান নেই। আর প্রথম হবার নেশা, সে তো ইস্কুলের নিম্নতম শ্রেণি থেকেই শিশুদের রক্তের মধ্যে ইন্‌জেকশন

করে দেওয়া হচ্ছে। সব সময় প্রথম হবার প্রতিযোগিতা পৃথিবীতে যে কত অশান্তি ডেকে আনছে তার শেষ নেই।"

আমাদের গল্প বোধ হয় আজ শেষ হবে না! ন্যাপকিনে মুখ মুছতে-মুছতে সায়েব বললেন, "তিন হিরে জহরতের ব্যাপারে ইয়ংম্যান হিসেবে তোমার হয়তো প্রতিবাদ করার কিছু থাকতে পারে। কিন্তু আজ তোমাকে তর্ক করতে সুযোগ দেব না। শোনো, এ-বিষয়ে চিনা ঋষিরা হাজার-হাজার বছর আগে কীভাবে সত্যকে আবিষ্কার করে গিয়েছেন।"

সায়েব এবার শুরু করলেন—

"সত্যি কথা মিষ্টি শোনায় না;
মিষ্টি কথাও সত্যি নয়।
ভালো মানুষ কখনও তর্ক করে না;
যে তর্ক করে সে ভালো মানুষ নয়।
যিনি বিজ্ঞ তিনি অনেক কিছু জানেন না;
যিনি অনেক বিষয়ে পণ্ডিত তিনি বিজ্ঞ নন।
সাধুজন নিজের জন্যে আহরণ করেন না,
অপরের জন্যে জীবনপাত করে
তিনি নিজেই ধনী হয়ে ওঠেন;
অপরকে সব দিয়ে তিনি
নিজের প্রাচুর্যকে অবধারিত করেন।
স্বর্গে যেমন আশীর্বাদ আছে, অভিশাপ নেই
সাধুজনের জীবনে তেমন কর্ম আছে, তর্ক নেই।"

সেদিন আমি আবার টাইপিং-এর কাজ শুরু করার আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। সায়েব রাজি হলেন না। বললেন "অনেক হয়েছে। এখন চাইনিজ চিন্তা করতে-করতে বাড়ি যাও।"

বিদায়ের আগে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন বারওয়েল সায়েব। "তুমি এখনও রোগা। তোমাকে তাড়াতাড়ি আমি আর একটু ভারিক্কী দেখতে চাই", এই বলে সকৌতুকে আমার কানটা একটু মলে দিয়ে সেদিন তিনি স্পেনসেস হোটেল থেকে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

কঙ্‌ফুসে

বঙ্গীয় রসনায় চিনের দুর্বার অনুপ্রবেশ যথাসময়ে ঘটলেও বঙ্গীয় সাহিত্যে চিনের উপস্থিতি উনিশ শতকের আদিপর্বেও তেমন খুঁজে পাইনি। খুঁজতে-খুঁজতে অগতির গতি 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' উপস্থিত হয়ে মুখ রক্ষা হলো। বাঙালির সারস্বত সাধনার ইতিহাসে বিবিধার্থ সংগ্রহ একসময়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৫১ সালে ভারনাকুলার লিটারেচর কমিটির আনুকূল্যে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় এই জ্ঞানগর্ভ সচিত্র মাসিকপত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, হজসন গ্রান্ট, সিটন কার ইত্যাদিরাও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৪৬-এ এশিয়াটিক সোসাইটির সহ সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এঁর গুণমুগ্ধদের তালিকায় ছিলেন ম্যাক্সমুলার, তিনি এঁকে তাঁর জীবিতাবস্থায় ভারততত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মনে করতেন।

বিবিধার্থ সংগ্রহ খুব দীর্ঘজীবী হয়নি, কিন্তু সেকালে বাংলা রচনার তুলনায় এই সংগ্রহের লেখাগুলি ছিল যথাসম্ভব নির্ভুল ও উল্লেখযোগ্য। সমকালের বাঙালিদের চিন সম্বন্ধে আগ্রহ কতখানি ছিল তা জানবার উদ্দেশ্যে এই মাসিকপত্রের বেশ কয়েকটি সংখ্যা উল্টোতে গিয়ে কিছু প্রবন্ধের খোঁজ পাওয়া গেল। শকাব্দ ১৭৮০ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা দুটিতে আকর্ষণীয় প্রবন্ধ 'কঙ্‌ফুসে' ও 'চিনদেশের কৃষক'। আরেকটি রচনা 'চিনদেশীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয় শকাব্দ ১৭৮৩ শ্রাবণ সংখ্যায়। সেকালের বাঙালিদের চোখে চিন কিরকম ছিল তা জানা যাতে কঠিন না হয় তার জন্যে তিনটি লেখা এই বইতে আবার মুদ্রিত করা গেল।

দুঃখের বিষয় প্রবন্ধ তিনটির লেখক কে তা বিস্তারিতভাবে আমাদের

জানা নেই। লেখকের পুরো নাম ছাপার রীতি এই পত্রিকায় বোধ হয় ছিল না। একটি রচনার শেষে লেখা—'ন.চু.মু', আর একটিতে 'ব.চা.সি,' আর একটি সম্পূর্ণ নামহীন। পাঠের ধারাবাহিকতার কথা মাথায় রেখে প্রথমে 'কঙফুসে' এবং পরে 'চিনদেশীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত' ও "চিনদেশের কৃষক' ছাপা হল। বলাবাহুল্য একালের বাঙালি পাঠকের কাছে 'কঙ্‌ফুসে' কনফিসুয়াস বলেই বেশি পরিচিত।

খ্রীষ্টাব্দের ৫৫১ বৎসর পূর্বে চিন-রাজ্যের অন্তঃপাতী লু-নামক নগরীতে তদ্দেশ—বিখ্যাত পণ্ডিত কঙ্‌ফুসে জন্ম গ্রহণ করেন। চিনদেশে যত যত পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনি সর্বপ্রধান ; তাঁহার তুল্য অসাধারণ পণ্ডিত আর তদ্দেশে কোন কালে কেহই হয় নাই। তাঁহাকে কেহ কেহ খুঞ্‌চি * নামেও উক্ত করিয়া থাকে। তাঁহার পিতার নাম সুক্‌লিয়ংনিটু। তিনি লূ-নগরের এক জন প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র স্ত্রী নেনসী নামার গর্ত্তে কঙ্‌ফুসে জন্ম গ্রহণ করেন। অতি শৈশবকাল হইতেই কঙ্‌ফুসের অসাধারণধীশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি অপরাপর বালকের ন্যায় অনর্থক ক্রীড়ায় বিন্দুমাত্র কালও নিক্ষেপ করিতেন না, সর্বদা সন্নিবিষ্টচিত্তে রাজানুষ্ঠিত কার্য্যের অনুকরণ এবং আপন ক্ষমতানুসারে অবস্থোচিত সৎক্রিয়া শিক্ষা করিতেন। যখন যে স্থানে গমন করিতেন তখনি তত্রস্থ বর্তমান বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে উদ্যত হইতেন।

শৈশবকালেই তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানের ইচ্ছা এত প্রবলা হইয়াছিল, যে তিনি একদা তজ্জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। একবার তিনি এক প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নানা বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হওয়াতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "যে বালক দেবালয়মধ্যে উপস্থিত হইয়া এত অধিক বিষয়ের জিজ্ঞাসা করে, কে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলে?" কঙ্‌ফুসে ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "বুদ্ধিমানের এই কার্য্য"।

বস্তুতঃ তিনি অতিশয় সুশীল ও বিনীত ছিলেন ; তাঁহার শীলতা ও

*চি সন্তান, খুং পণ্ডিত অথবা প্রধান।

বিনয় সন্দর্শন করিয়া সকল লোকেই তাঁহাকে প্রিয়দৃষ্টিতে দর্শন করিত, এবং তাঁহার অসাধারণবুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত তাঁহাকে বিচিত্রকর্মা বোধ করিত। প্রিয়দর্শন কঙ্‌ফুসে সর্বদা সকলকে মিষ্ট বাক্যদ্বারা সম্ভাষণ করিতেন। তিনি দশবর্ষ-বয়ঃক্রম সময়েই স্বদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের হিতোপদেশ ও চরিত্র প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া তদনুসারে চলিতে ও অন্যকে চালাইতে ইচ্ছা করেন, এবং সর্বদা অতি মহৎ ও প্রশস্ত বিষয়েই চিত্তনিবেশ করিয়া থাকিতেন। তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, যে যৌবনের প্রারম্ভে একদা অতিশয় দূরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি অশ্ববিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা অভ্যাস করেন।

অনন্তর বিংশতি-বৎসর-বয়ঃক্রমের কিঞ্চিৎ পরে তিনি একটি পশ্বালয়-সঙ্‌ক্রান্ত যৎসামান্য কর্ম অবলম্বন করিয়া কিয়ৎকাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই সেই কর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক পুনর্বার চৌদোশ-স্থানে জ্ঞানধর্মের উপার্জন করিতে যাত্রা করেন, এবং শীঘ্র কৃতকার্য হইয়া কতিপয়-ছাত্র-সমভিব্যাহারে তথাহইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

কঙ্‌ফুসে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত চীনরাজ্যে ঐক্য সংস্থাপন করিতে যত্নশীল হইলেন। তৎকালে সমস্ত চিন-দেশে একমাত্র সম্রাট্ ছিলেন কিন্তু তাহার অধীনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল ; ঐ সমস্ত রাজাদিগের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহার রীতি ও নীতি প্রচলিত ছিল। কঙ্‌ফুসে দেখিলেন যে যাবৎ ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য একনিয়মে চলিত ও এক-প্রকার শাসনে অনুশাসিত না হইবে, তাবৎ চিনদেশে কোন ক্রমেই ঐক্য স্থাপিত হইবে না, এবং তাবৎ কোন রূপেই স্বদেশের কল্যাণও সিদ্ধ হইবে না। এই বিবেচনায় তিনি অসামান্য পরিশ্রমের স্বীকার ও অদ্বিতীয় ক্ষমতার প্রকাশ করতঃ চিনদেশস্থ সমস্ত স্থানে স্বপ্রণীত সুনিয়ম-প্রণালী প্রচার ও সদ্ব্যবহার বিস্তারের পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন।

সর্বত্র কুনীতির সংশোধন ও সুনীতির সংস্থাপন করা এবং সকল স্থানে মিতাচার ও মিতব্যবহার প্রচলিত করাই তাঁহার প্রধান কার্য হইয়া উঠিল।

তিনি সকল লোককে নিরপেক্ষতা অস্বার্থপরতা নিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা অভ্যাস করাইয়া এককালে অহিতাচারের মূলোৎপাটন করিতে আরম্ভ করিলেন। আর তিনি যে কেবল বাক্যদ্বারা লোকদিগকে ধর্মনীতির শিক্ষা দিতেন এমত নহে ; তিনি স্বকীয় অসামান্য পুণ্যক্রিয়ার দৃষ্টান্তের প্রদর্শনদ্বারা যাবৎ ব্যক্তিকে জ্ঞান ও ধর্মের উপদেশ করিতেন। এই রূপে সমস্ত চিনরাজ্যে তাঁহার খ্যাতির বিস্তার ও যশের প্রচার হওয়াতে তিনি অবিলম্বে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হন, এবং তৎপদে অতি সুনিয়মে আপন সাধ্য কার্য সাধন করেন। পরন্তু তিনি কোন পদের অভিমানের পরবশ হইয়া উল্লিখিত রাজপদ গ্রহণ করেন নাই ; কেবল স্বদেশের উন্নতিসাধনের উদ্দেশে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার পাইয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন যে সাধারণ লোকে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কথা যেমন সমাদর পূর্বক গ্রহণ করে অপর ব্যক্তির কথা সে প্রকার গ্রহণ করে না, অতএব তিনি কোন রাজপদ গ্রহণ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিলে অতি সহজেই কৃতকার্য হইবেন।

তাঁহার পঞ্চাশৎ বৎসর-বয়ঃক্রম-সময়ে লূ রাজ্যের রাজা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রির পদে অভিষিক্ত করেন, এবং তিনি সেই পদে অভিষিক্ত হইয়া আপন জন্মভূমির বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ করিয়াছিলেন। লূ-রাজ্য দীর্ঘকাল তাঁহার সুনিয়মে সংরক্ষিত হওয়াতে উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হওত। অবশেষে সমস্ত চিনদেশের মধ্যে তাহাই প্রধান হইয়া উঠিল। লূর এই প্রকার প্রাধান্য সন্দর্শন করিয়া অপরাপর রাজাদিগের মনে ঈর্ষা উপস্থিত হইল ; সকলেই মনে করিল যে যদি লূ-রাজ্য এইরূপে আর কিছুদিন সুনিয়মে শাসিত হয়, তাহা হইলে তত্রস্থ রাজা সমস্ত প্রজারই প্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে বিশেষ ক্ষমতাবান্ হইয়া উঠিবে, এবং অনায়াসে আমাদিগকে পরাজয় করিয়া সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে ; তখন আর কোন রূপেই উহাকে পরাভূত করিতে পারা যাইবে না। এই আশঙ্কায় সমস্ত রাজারাই লূর আধিপত্য-শক্তির সংহারের মন্ত্রণা করিতে লাগিল, তন্মধ্যে চী-নামক এক ক্ষুদ্র স্থানের রাজা কতিপয় নর্ত্তকীকে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বকার্য সাধনের নিমিত্ত লূ-নগরে প্রেরিত করেন। তাহারা রাজসভায় প্রবিষ্ট

হইয়া সমাদৃত ও পুরস্কৃত হইল, এবং বিধিমতে রাজাকে বশীভূত করিল।

রাজা ঐ চতুরাদিগের মোহ-জালে বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে কঙ্‌ফুসের উপদেশ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতে রাজ্যের ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তখন কঙ্‌ফুসে দেখিলেন যে লূ-রাজ্যের আর কল্যাণ নাই, রাজা ও প্রজা আর কেহই তাঁহার বশে চলে না। তত্রাপি তিনি রাজা ও প্রজাদিগকে স্বমতস্থ করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সকল শ্রম নিষ্‌ফল হইল। অনন্তর নিরাশ হইয়া লূ-রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ঐ রাজ্যে প্রথমতঃ প্রবিষ্ট হইয়া বিধিমতে উহার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির সিদ্ধি করিয়াছিলেন। যে চী-রাজ্যের রাজা পরিণামে এই রূপ শত্রুতা সাধন করিল, কঙ্‌ফুসে প্রথমেই আসিয়া লূর অধিপতি টঙ্‌কুং নৃপতির সহিত তাহার মৈত্রীবন্ধন ও সন্ধি-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। চীর রাজা তৎপূর্বে লূর যে সকল স্থান অধিকৃত করিয়াছিল, কঙ্‌ফুসে আসিয়া তৎ সমুদায়ই লূর রাজাকে প্রত্যর্পিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রণায় অশ্রদ্ধা করাতে পরিণামে সে রাজার এ পর্যন্তই দুর্দশা হইল যে তিনি রাজ্য শ্রী সম্পদ্ সমস্ত চ্যুত হইয়া এককালে নির্ণাম হইয়া গেলেন।

ইতিপূর্বে কঙ্‌ফুসে একবার টীর রাজা কঙ্‌কুঙ্গের নিকট গমন করাতে রাজা তাঁহাকে মহাসমাদর-পূর্বক কোন প্রধান পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাহাতে প্রতিকূল হওয়াতে তিনি সে ইচ্ছা সম্পন্ন করেন নাই। কঙ্‌ফুসের এমনই নিরপেক্ষতা এবং উদার স্বভাব ও মহৎ ভাব ছিল, যে যে দুষ্ট মন্ত্রী তাঁহার উচ্চ-রাজ-পদ-প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে ঐ মন্ত্রিরই বুদ্ধিমত্তা ও নিরপেক্ষতার অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

যৎকালে কঙ্‌ফুসের ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে তাঁহার জন্মভূমিতে একদা এক দল রাজবিদ্রোহী দুরাত্মাদিগের সহিত তাঁহাকে বিস্তর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বকীয় বুদ্ধিবলে ও কার্য্যকৌশলে ঐ সমস্ত দুরাত্মাদিগকে বশীভূত করিয়া পরিণামে সৎপথগামী করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে সর্বদা পিতৃবৎ উপদেশ প্রদান করিতেন ; এবং পরম

হিতৈষির ন্যায় তাহাদিগের হিত সাধন করিতেন। কিন্তু পরে আরও কতকগুলি দুষ্ট লোক তাঁহার বিরুদ্ধ হওয়াতে তিনি এক কালে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন, এবং সমস্ত সামাজিক কার্য পরিত্যাগ করিবার মানস করিলেন। এই আশয়ে তিনি এমনি বিবিক্তবাসী হইলেন, যে প্রায়ঃ অনেকেই তাঁহার কোন সম্বাদ পাইত না। তিনি অতিনিভৃত স্থানে বাস করিয়া কেবল আপনার রচিত কএক খানি গ্রন্থ সংশোধন করিতেন। কিন্তু অগ্নিতুল্য কঙ্ফুসে কত দিন এপ্রকার অপ্রকাশভাবে কালক্ষেপ করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিবেন? অবিলম্বেই চতুর্দিগ হইতে শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিল, এবং তিনিও তাহাদিগকে আপন আপন বাঞ্ছিত বিষয়ে শিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লূ-নগরে এক ভয়ঙ্কর উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে তথাকার রাজা অতি যত্ন-পূর্বক কঙ্ফুসের অনুসন্ধান করতঃ তাঁহার সুমন্ত্রণা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতবর কঙ্ফুসেও এই সংবাদ পাইয়া রাজার আনুকূল্য করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন ; রাজাকে বিপদ্গ্রস্ত জানিয়া তাহার পূর্ব দুশ্চরিত্রের বিষয় আর কিছুই মনে করিলেন না। কিন্তু তাঁহার একটি প্রিয় শিষ্য এই বিষয়ের প্রতিরোধী হওয়াতে তিনি স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন। যাহা হউক কঙ্ফুসে লূর নৃপতির কল্যাণ-সাধনের জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। রাজা কেবল তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াই পুনঃ ঘোরতর বিপদে পতিত হন, এবং মহানুভব পণ্ডিত ও তজ্জন্য তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করেন।

তিনি লূ নগর পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং ঐ রূপে দ্বাদশ বৎসর পর্যটন করিয়া দুঃখ দারিদ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করেন। তিনি যে ঐ অবস্থায় কত স্থানে কত প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, এবং কত লোকের নিকট কত প্রকারে অবমানিত হইয়াছিলেন তাঁহার সংখ্যা করা কঠিন। তিনি কিছু দিন ওয়াই-নামক দেশে ও কিয়ৎকাল চন্-নামক প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উভয়স্থানেই বিরক্ত হইয়া তিনি হংরাজ্যে গমন করেন।

ইয়ংফু-নামক এক ব্যক্তির উপর হংবাসি লোকদিগের আন্তরিক ক্রোধ

ছিল। তাহারা কঙ্ফুস্কে ঐ ইয়ংফুর সহিত অভিন্নাকার দেখিয়া তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং প্রাণসংহারেরও ভয়প্রদর্শন করিল। মহানুভব পণ্ডিত এই দুরবস্থাতেও এক দণ্ডের নিমিত্ত বিচলিতচিত্ত হয়েন নাই। তিনি কারাগারের মধ্যে সর্বদা কেবল জগদীশ্বরের মহিমাদির চিন্তা করিয়াই সন্তোষ সাধন করিতেন। অবশেষে হংবাসি লোকেরা আপনাদিগের ভ্রান্তি অবগত হইয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দেয়।

তিনি হংরাজ্যহইতে পূর্বোক্ত ওয়াই-নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু ঐ স্থানে পুনর্বার তাঁহাকে বিচারালয়ে পরীক্ষা-প্রদান করিয়া আরোপিত এবং অমূলক অপবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল। অনন্তর ওয়াই হইতে তিনি সূং-নামক স্থানে যাত্রা করেন। তথাকার এক জন অবোধ রাজকর্মচারী তাঁহার বুদ্ধিবিদ্যাদির প্রতি সাতিশয় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বিধিমতে তিরস্কৃত ও হত করিতে উদ্যত হয় ; কিন্তু তিনি তাহার ষট্চক্র হইতে মুক্ত হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন। তিনি কিছু দিন এইরূপে স্থানভ্রষ্ট ও মানভ্রষ্ট হইয়া ভ্রমণ করতঃ অবশেষে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন ; কিন্তু কিছু দূর ভ্রমণের পর এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পারের কোন উপায় না পাওয়াতে সুতরাং পরাঙ্মুখ হইলেন। লূ-রাজ্যের বর্তমান অধিপতির মৃত্যুর সময়ে আপন সন্তানকে আদেশ করিয়া যান, "যে তুমি নানা-বিদ্যাবিষারদ কঙ্ফুসেকে অতিসমাদর-পূর্বক আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন মন্ত্রির পদে অভিষিক্ত করণানন্তর তাহারই মন্ত্রণাক্রমে রাজ্যশাসন করিও।" তাহার পুত্রও ঐ আদেশানুসারে পণ্ডিতবর কঙ্ফুসেকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। কিন্তু তাহার কএক জন কর্মচারী বিরোধী হওয়াতে তিনি ঐ পণ্ডিতকে আপন বাঞ্ছিত পদে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। কঙ্ফুসের পর্যটনকালে অনেক রাজা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া আপনার নিকটে রাখিতে এবং উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বত্রই দুরাত্মা লোকে তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া পণ্ডিতোত্তম কঙ্ফুসেকে যথোচিত আদর ও মর্যাদা পাইতে দেয় নাই, প্রত্যুত কুমন্ত্রণা করিয়া বিধিমতে ক্লেশই প্রদান করাইয়াছিল।

পণ্ডিতবর দ্বাদশবর্ষ এই রূপে দেশভ্রমণ ও দুঃখভোগ করিয়া পুনর্বার লূ-রাজ্যে প্রত্যাগত হয়েন। এই সময় তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে পুনরাগমন করিয়া আর সামাজিক কার্যে লিপ্ত হয়েন নাই, কেবল সর্বদা নির্জনে থাকিয়া নানাপ্রকার গ্রন্থাদির আলোচনা করিতেন। কিন্তু চিনদেশের দুরদৃষ্টতা প্রযুক্ত তিনি আর দীর্ঘকাল ধরাতলে বাস করিলেন না। যে বৎসর তিনি চঞ্চনামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার পরবৎসরেই ওয়াই নামক নগরে তাঁহার পর-লোক-প্রাপ্তি হয়। তিনি ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রমে এই লোক হইতে অবসৃত হয়েন। জন্মভূমির নিকটে এক মনোহর নদীতীরে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার শিষ্যগণ তিন বৎসরকাল তাঁহার জন্য শোক করিয়া অনন্তর সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে। কিন্তু একটি শিষ্য শোকসম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার সমাধিমন্দিরের নিকট এক গৃহ প্রস্তুত করিয়া আরও তিন বৎসর বাস করিয়াছিল।

কঙ্‌ফুসের একমাত্র পুত্র হয় ; সে তাঁহার বর্তমানেই লোকান্তরে গমন করে। কিন্তু তাহাতে কঙ্‌ফুসে নির্বংশ হয়েন নাই ; যেহেতু তাঁহার প্রিয়পুত্র একটি পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম টিসি। টিসিদ্বারা একসময়ে কঙ্‌ফুসের নাম উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। টিসি সর্বাংশেই পিতামহের সদৃশ হইতে চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং অনেকাংশে কৃতকার্যও হইয়াছিল। তাহার পিতামহের প্রিয় এবং প্রধান শিষ্য বংশী নামক এক ব্যক্তি তাহাকে শিক্ষা প্রদান করে।

কঙ্‌ফুসের সর্বশুদ্ধ তিন সহস্র শিষ্য ছিল ; তন্মধ্যে ৭২ জন তাঁহার বিশেষ অনুগত এবং সুশিক্ষিত হইয়াছিল।

ঐ ৭২ জন শিষ্যের মধ্যে হুই নামক এক শিষ্যই প্রধান। এই হুইর মৃত্যু-ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পণ্ডিতবর কঙ্‌ফুসে আপন গ্রন্থমধ্যে বিস্তর করুণারসের বিস্তার ও আক্ষেপ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। হুইর পরেই বংশী। এবং তদনন্তর মতি প্রধান শিষ্য। বংশী লঙ্গনী-নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সংগ্রহ করে, এবং আপন গুরুপৌত্রকে শিক্ষা দেয়। তাহার সমধ্যায়িরা অনেকে তাহাকে কঙ্‌ফুসের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছে এতদ্ভিন্ন প্রস্তাবিত পণ্ডিতের আরও কএক জন প্রধান ছাত্র ছিল ;

তিনি আপন গ্রন্থমধ্যে উহাদিগের সকলেরই নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকেই বিদ্যা বুদ্ধি ও দৈহিক ক্ষমতাদির বিশেষ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহানুভব কঙ্‌ফুসে সময়ে সময়ে আপন শিষ্যদিগকে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত যে সমস্ত কথোপকথন করিতেন তৎসমুদায় সংগৃহীত করিয়া দুই পৃথক্ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

কঙ্‌ফুসে নানাবিষয়ে নানাপ্রকার গ্রন্থ রচিত করেন ; তন্মধ্যে সাহিত্য ও কাব্যাদির সঙখ্যাই অধিক। তিনি যে পরিমাণে সাহিত্য-শাস্ত্রাদির রচনা করেন তদনুরূপ বিজ্ঞানশাস্ত্রাদির গ্রন্থ রচিত করেন নাই। কিন্তু তিনি যে বিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন এমত কখনই বলা যায় না। তিনি চীন-রাজ্যের অনেক পুরাবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন, এবং অনেক প্রধান প্রধান লোকের জীবনচরিতও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত রাজনীতি ও ধর্মনীতি শিক্ষা ও পালন করিয়া চীন-দেশীয় অনেক রাজা সুনিয়মে রাজ্যশাসন করত স্বরাজ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন, এবং ভিন্ন দেশের অনেক লোকেও পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া এই এবং পরলোকের উপকার করিয়াছিল। তিনি যে কত বিষয়ে কত প্রকার গ্রন্থের রচনা করেন, তাহার নির্ণয় করা কঠিন, এবং তাঁহার রচিত যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তত্তাবতের বৃত্তান্ত এ স্থলে বিশেষরূপে লেখাও সহজ নহে।

যেমন অসীম সিন্ধু-সলিলের স্বাদ-পরীক্ষার নিমিত্ত লোকে এক বিন্দুমাত্র জল প্রদান করে, সেই রূপে মহাপণ্ডিতবর কঙ্‌ফুসের জ্ঞান-সমুদ্রের পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহার রচিত কএক টি নীতি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠকগণ তৎপাঠেই অনায়াসে তাঁহার মহত্ত্বের অনুভব করিতে পারিবেন।

"যে ব্যক্তি সর্বকর্তা জগদীশ্বরের অসন্তোষ সাধন করে, তাহার আর কেহই রক্ষাকর্তা নাই।"

"প্রজাদিগকে শিক্ষা-প্রদান করা রাজার কর্তব্য ; কিন্তু রাজা কি প্রত্যেক প্রজার গৃহে গৃহে গমন করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন? না, তিনি

আপন সৎক্রিয়ার দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা সকলকে শিক্ষা প্রদান করিবেন।"

"কেবল দানদ্বারা রাজার দয়া প্রকাশ পায় না ; তাঁহার দণ্ডবিধানদ্বারাও তাঁহার কারুণ্য গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।"

"নির্বোধ লোকে জলের মধ্যেই থাকে, কিন্তু জ্ঞানবান লোকে তীরেতেই ক যাপন করে!"

"অবোধ লোকে জ্ঞানবান্‌কে চিনিতে পারে না বলিয়া আক্ষেপ করে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি মনুষ্যকে চিনিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত থাকেন!"

"তোমাকে বিংশতি চক্ষু অবলোকন করিতেছে এই রূপ বিবেচনা করিয়া কার্য করিবে।"

"কুকর্ম করিয়া অনুতাপ না করাই বিশেষ কুকর্ম।"

"গাম্ভীর্যব্যতিরেকে ধর্মের আদর হয় না।"

"সদন্তঃকরণ সর্বদা দয়ারই বশীভূত থাকে।"

কঙ্‌ফুসের পরমার্থ-বিষয়ে যে কী প্রকার মত ছিল, তাহা স্থিররূপে জানা যায় না ; কিন্তু তিনি এই জগতের কারণ একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে প্রত্যয় করিতেন, এবং তাঁহার উপাসনা করা মানুষ্যের একমাত্র কর্তব্য জ্ঞান করিতেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি স্বশিষ্য-দিগকে মনুষ্যের ঐহিক জীবনের বিষয়ে উপদেশ করিতেন। তিনি কদাপি আপন মুখে আপনার প্রশংসা-সূচক কোন কথাই কহিতেন না, এবং কাহারও মুখে আত্মপ্রশংসা গ্রহণ করিতেন না! তিনি যেমন প্রিয়ম্বদ সেই রূপ প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায় ও সুঠাম ছিলেন, এবং তাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃ এবং বিশাল নেত্রদ্বয় দেখিয়াই অনেকে তাঁহাকে মহাবুদ্ধিমান্ বোধ করিত। তাঁহার অন্তর্বাহ্য সর্বাংশেই মহাপুরুষের লক্ষণ ছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর চীনদেশীয় আপামর সাধারণসকল লোকেই বর্ষে বর্ষে ও মাসে মাসে তাঁহার মর্যাদা-সূচক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, এবং অনেকে পণ্ডিতবরের সমাধিস্থানে গমন করিয়া নানাপ্রকারে শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিয়া থাকে।

ন. চ. মু.

চিনদেশীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত!

উনিশ শতকেব বিবিধার্থ সংগ্রহ থেকে আরও একটি প্রবন্ধ

আসিয়া খণ্ডের মধ্যবর্তী একটি দেশের নাম চিনদেশ, উহা প্রভূত জনাকীর্ণ স্থান, লোক সকল অসভ্য নহে, স্বভাবত সাতিশয় শান্তপ্রকৃতি, পরিশ্রমী এবং পরিচ্ছন্ন ; উহারা পারস্য আরব এবং অন্যান্য দেশের লোকাপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। ভূগোলবেত্তাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, লোকসংখ্যা বিষয়ে চিন দেশের তুল্য দেশ এই পৃথিবীতলে নাই, অবনী মণ্ডলের উপরিভাগে যত লোক আছে, তাহার তৃতীয় অংশের একাংশ লোক চিন দেশে বাস করে।

উপদেশ দিবার নিমিত্ত বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া অপর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "বালকগণ! ঘটিকার নিকট উপবেশন করিয়া, তোমরা যদি উহার টিক্ টিক্ শব্দ মনোযোগ পূর্বক ক্রমাগত দিন-রাত্রি গণনা কর, তবে দ্বাদশ বৎসর গণনা করিলে যে সংখ্যা হইবে, চিনদেশের লোকসংখ্যাও তদনুরূপ। উক্ত দুই কথাতেই অত্যুক্তি দোষ আছে বটে, কিন্তু চিনদেশ যে বহু জনাকীর্ণ স্থান তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ প্রামাণিক ভূগোলবেত্তারাও লিখিয়াছেন "চিন রাজ্যে ৩৬০০০০০০০ ছত্রিশ কোটি লোক বাস করিয়া থাকে। বহু জনতা হেতু তথাকার সামান্যোপজীবী লোকেরা অর্দ্ধাশনেই কাল যাপন করে!"

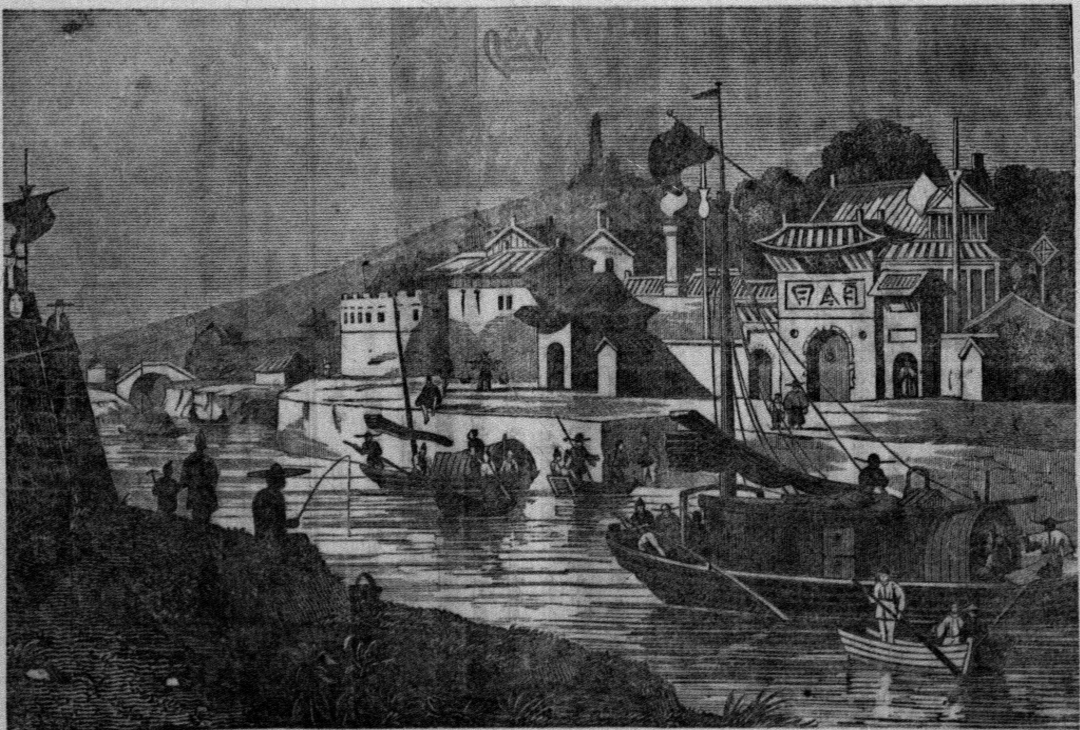
দরিদ্র লোকদিগের খাদ্য বিষয়ে কথিত আছে, তাহারা সামান্য অন্ন ভোজন এবং জল পান করিয়া কালযাপন করে। যে দিন তাহারা শুষ্ক শূকরমাংস অথবা মৎস্য প্রাপ্ত হয়, সে দিনকে সাতিশয় সুখের দিন বোধ করে। সকল মাংসই তাহাদিগের পক্ষে সুখাদ্য, ইন্দুর সর্প এবং কঞ্চুকাদি কৃমিমাংসও তাহাদের অখাদ্য নহে! এমন কি, শূকরমাংস যে মূল্যেতে বিক্রয় হইয়া থাকে, তথায় কুক্কুর এবং বিড়ালের মাংসও সে মূল্যে বিক্রীত হয়।



এই ছবিটি বহুবছর আগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, চিনের নিয়মকানুন আচারব্যবহার সম্পর্কে বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের অবহিত করার জন্য। এইছবিতে এক মহিলা অপরাধীকে একজন মান্দারিনের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। পত্রিকার লেখাটি এই বইতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।



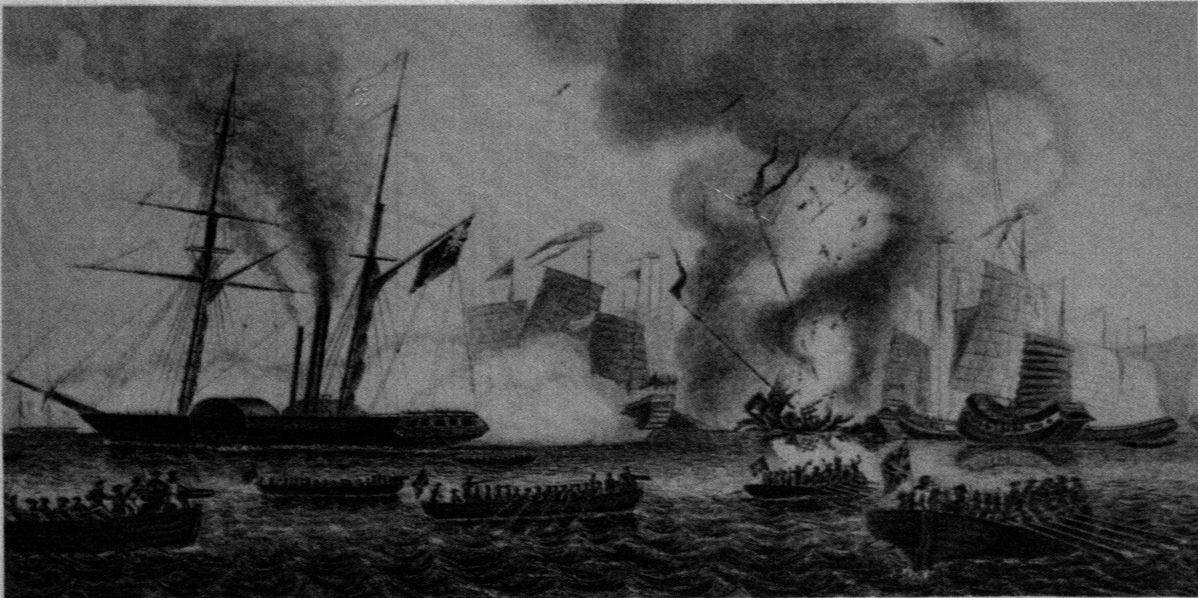
চিনের কৃষক পরিবারের এই ছবি কলকাতায় ছাপা হয়েছিল উনিশ শতকের বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায়।



লূ নগর। প্রাচীন চিনের এই ছবিটি ছাপা হয়েছিল উনিশ শতকের বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায়। এই তিনটি প্রবন্ধ থেকে চিনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সেযুগের বাঙালিদের মানসিকতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।



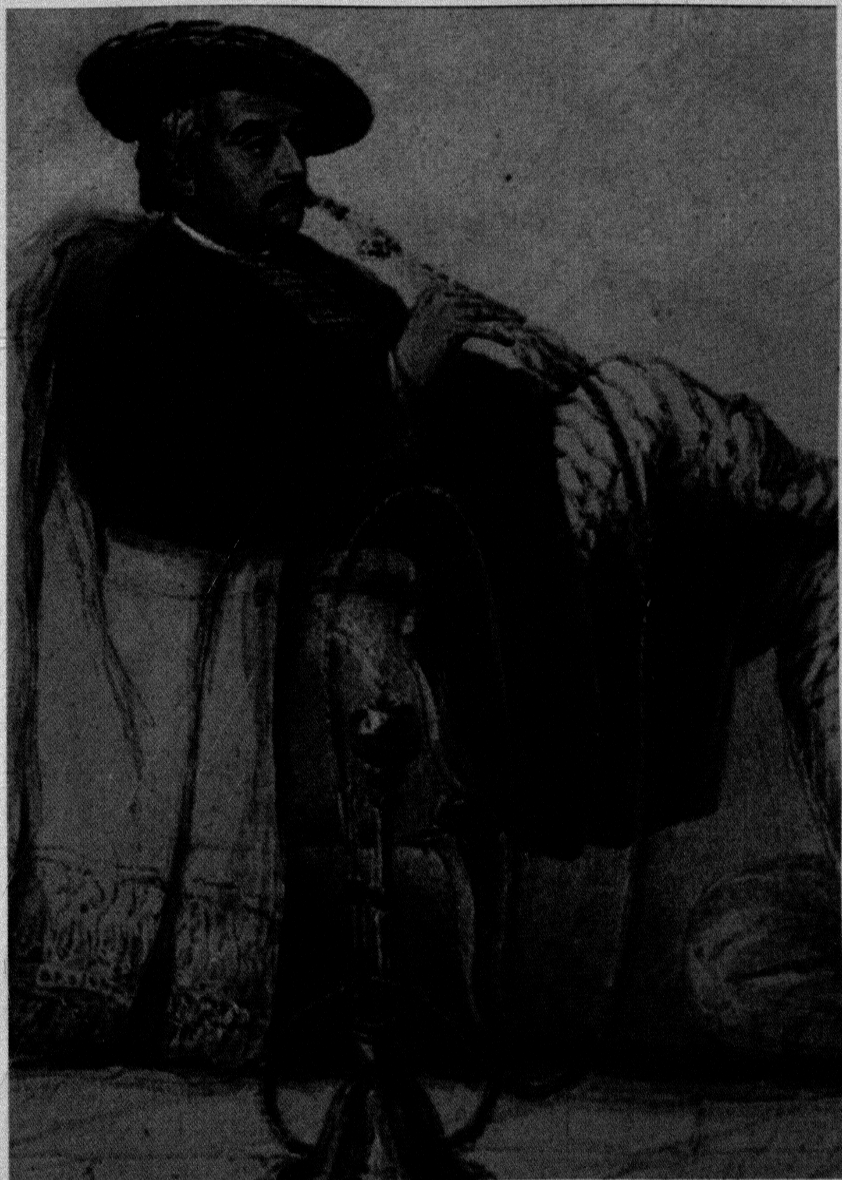
আফিমের নেশায় অধঃপতিত চিনা নাগরিক। কোনো কোনো শহরে দশজন চিনার মধ্যে ন'জন এই নেশায় বন্দি। অথচ চিনে আফিমের আমদানি ও ব্যবসা সরকারি আদেশে বহুদিন নিষিদ্ধ। আফিম বেচে বিদেশের বণিকরা নিতেন কেবল রুপো। এই রুপোয় বণিকরা কিনতেন চিনের চা। যেসব চিনা এই ব্যবসায় বিপুল অর্থ রোজগার করতে তাঁদের নাম হং। একমাত্র এঁদের কাছেই থাকতো বিদেশিদের সঙ্গে ব্যবসা করার সরকারি অনুমতিপত্র।



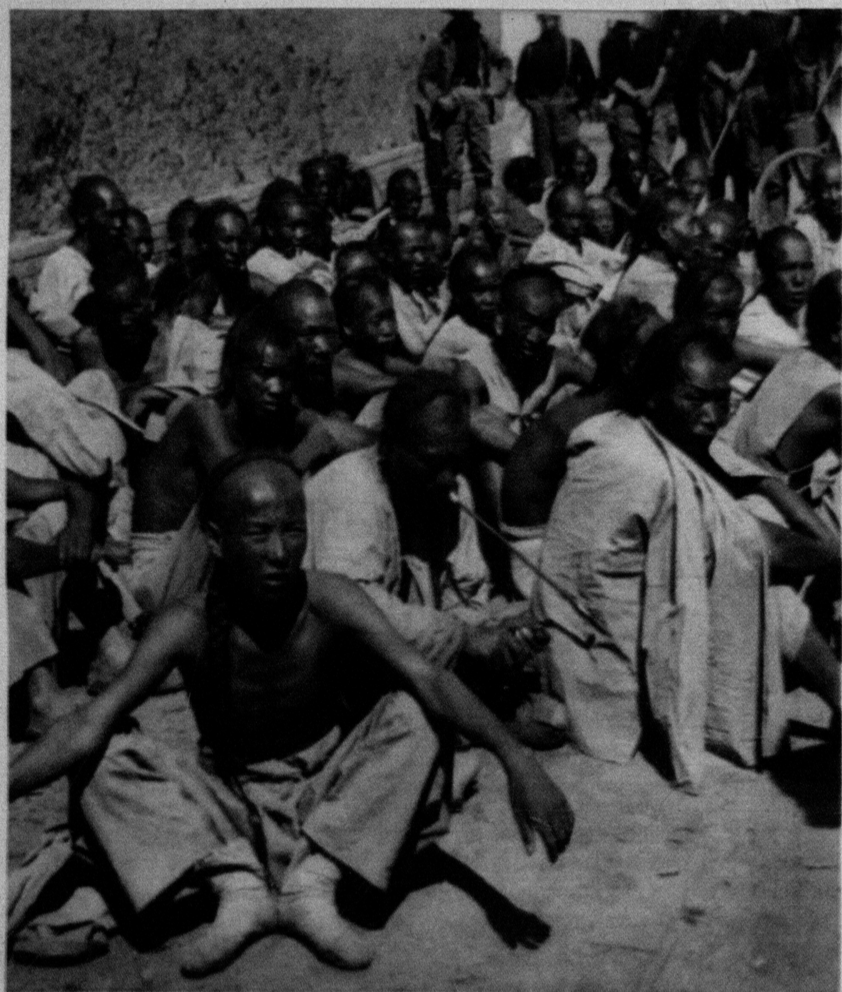
জোর যার মুলুক তার এই নির্লজ্জ নীতির অন্যতম সেরা উদাহরণ ওপিয়াম ওয়ার। গুয়াংসুর কমিশনার চোরাচালানকারী ইংরেজদের শিক্ষা দেবার জন্য ২১৩০৬ পেটি বেআইনি আফিম বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে দেওয়ায় শক্তিমান বিদেশি শত্রু তার অজেয় রণতরী নিয়ে দুর্বল চিনকে লন্ডভন্ড করে দিল এবং অত্যন্ত অপমানজনক সর্ত মেনে চুক্তি সই করতে বাধ্য করল। প্রথম ওপিয়াম ওয়ারের শুরু ৩ নভেম্বর ১৮৩৯। এই যুদ্ধে ইংরেজের ২৫টি যুদ্ধজাহাজে ছিল ৬৬৮টি কামান। বারোটি স্টিমশিপে ছিল আরও ৫৬টি কামান। সৈন্যসংখ্যা ১০০০০। ইংরেজ বাহিনীর অধ্যক্ষ স্যর হেনরি পটিঙ্গার। বৃটিশ গানবোটের সঙ্গে চিনা জাংকের এই অসম যুদ্ধের ছবিটি এখন রয়েছে ক্যানবারার ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ অস্ট্রেলিয়ায়। সন্ধিতে সই করার তারিখ ২৯ আগস্ট ১৮৪২, স্থান বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ কর্নওয়ালিশ।



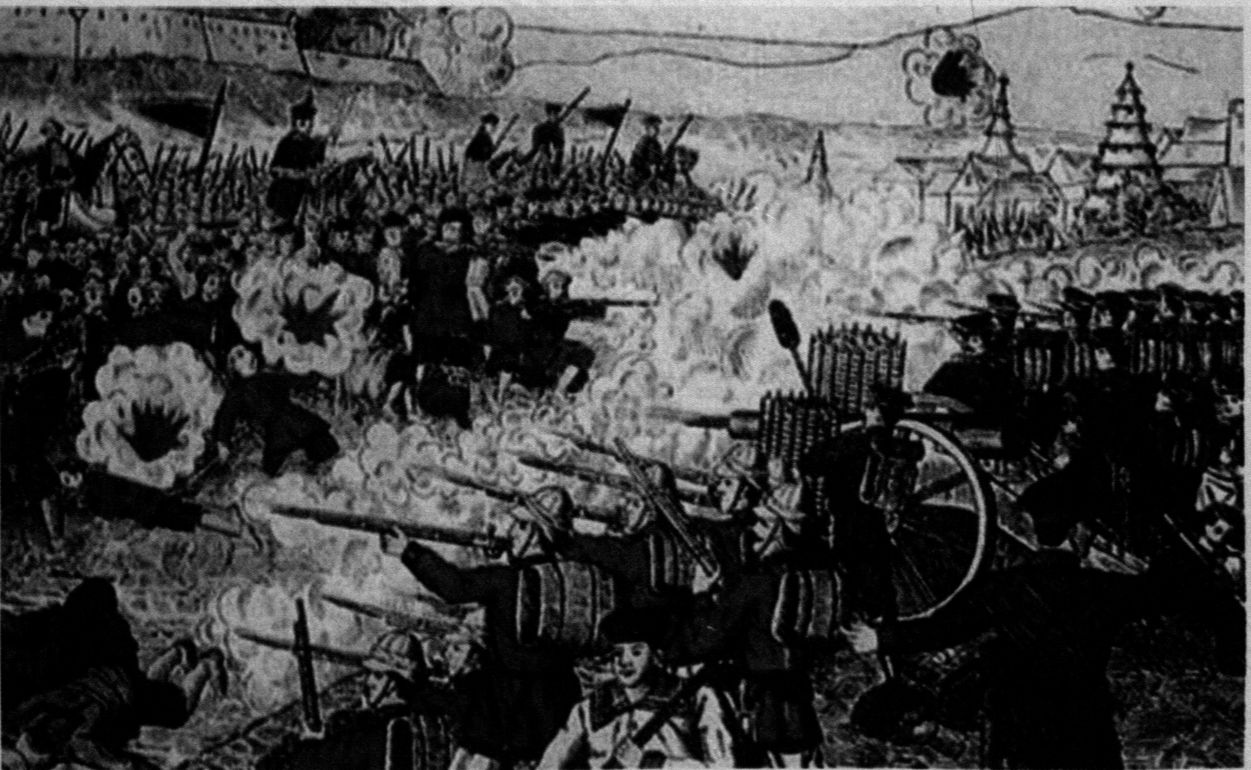
কিংবদন্তী বাঙালি ব্যবসায়ী ভারত মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল সরকার। এঁরও অনেকগুলি সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল যা চিন ছাড়াও সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত যাতায়াত করতো কলকাতা বন্দর থেকে। এই ধনপতিকে বাংলার রথসচাইল্ড বলা হতো।



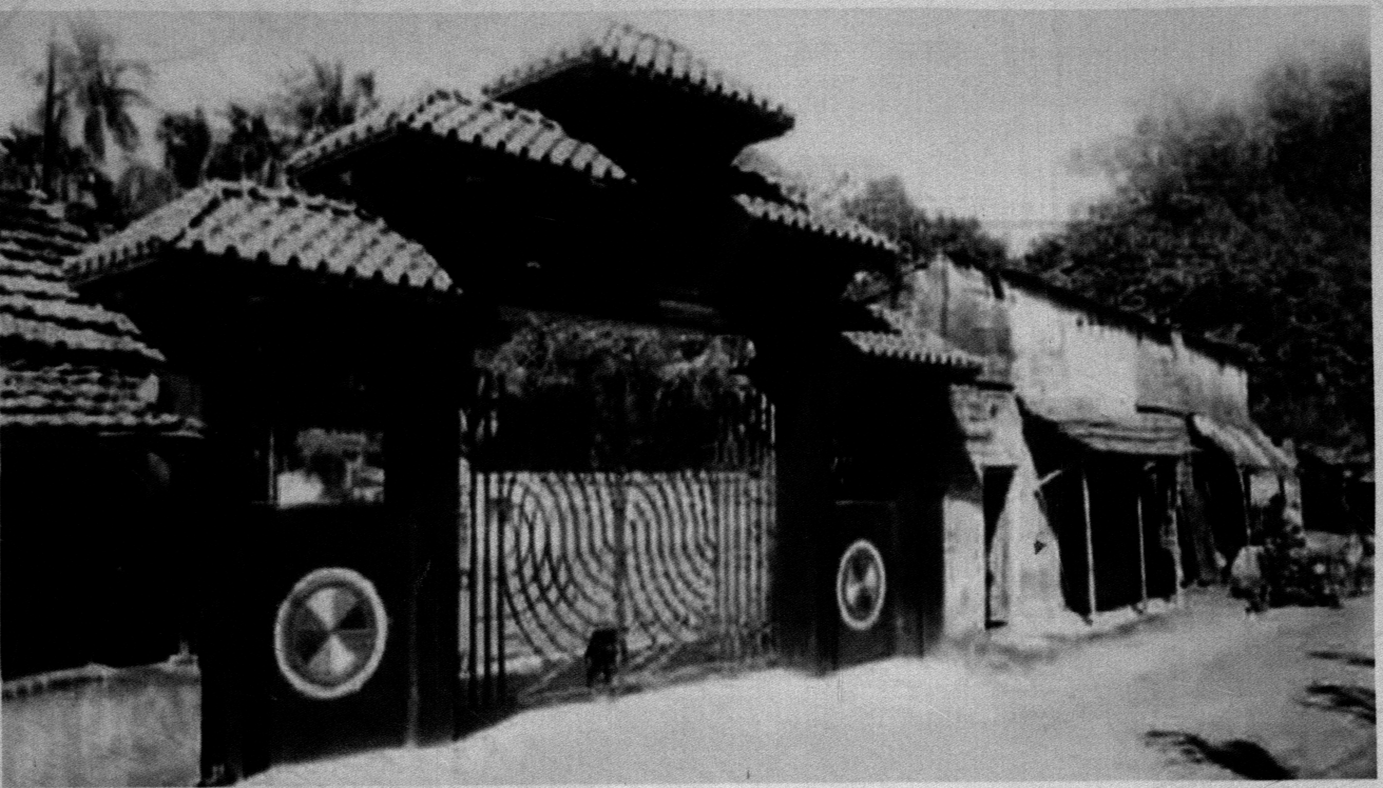
উনিশ শতকে ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত বিজনেসম্যান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুগণসম্পন্ন পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এঁর অনেকগুলি সমুদ্রগামী ক্লিপার জাহাজ দ্রুতগতিতে কলকাতা থেকে ক্যানটনে যাতয়াত করতো—প্রধান পণ্য অবশ্যই আফিম।



চিনে বাক্সার বিদ্রোহের দুর্লভ ফটো।



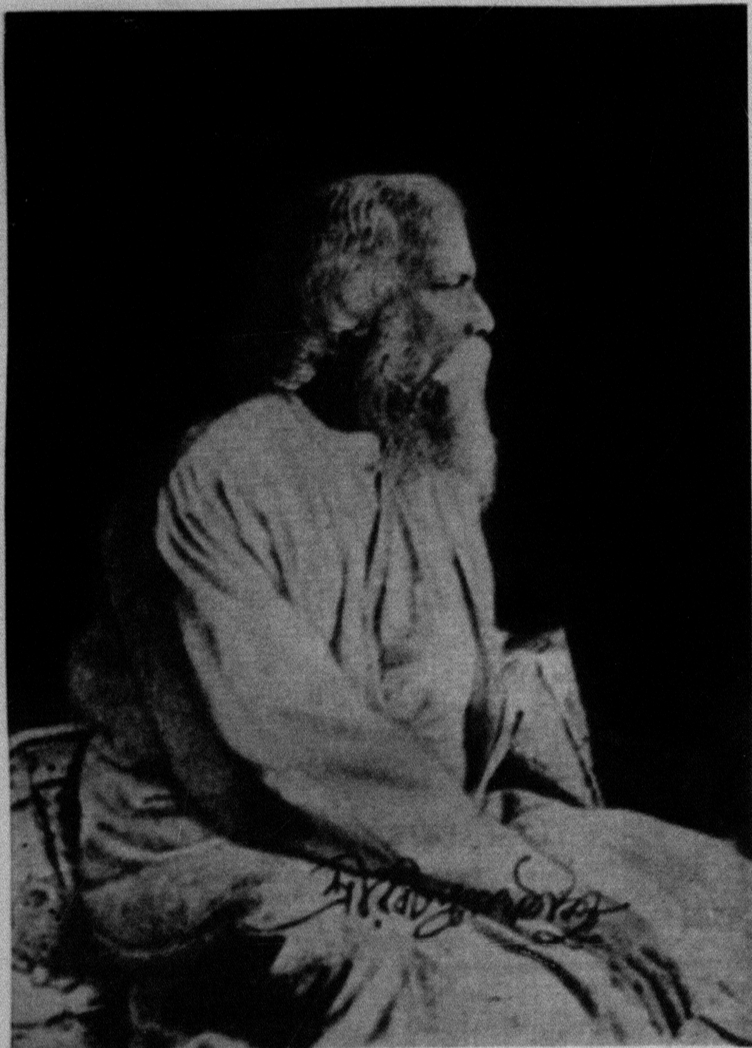
চিনের মাটিতে বিদেশীদের সঙ্গে বাক্সার যুদ্ধ।



কলকাতার খুব কাছে চিনা স্থাপত্যের মূল্যবান নিদর্শন আচিপুর।



সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ইনিই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে অপমানিত, অধঃপতিত, বারবার বিদেশির কাছে পরাজিত চিন আবার বিশ্বসভায় তার সম্মানিত স্থানটি ফেরত পাবে এবং বিশ্বকে নতুনভাবে নেতৃত্ব দেবে। ১৮৯৩ সালে প্রথমবার মার্কিন দেশে যাবার পথে স্বামীজি জাহাজ থেকে নেমে চিন দেখেন। তাঁর মতামত এই বইতে লিপিবদ্ধ।



TO CHINA

March 21, 1924

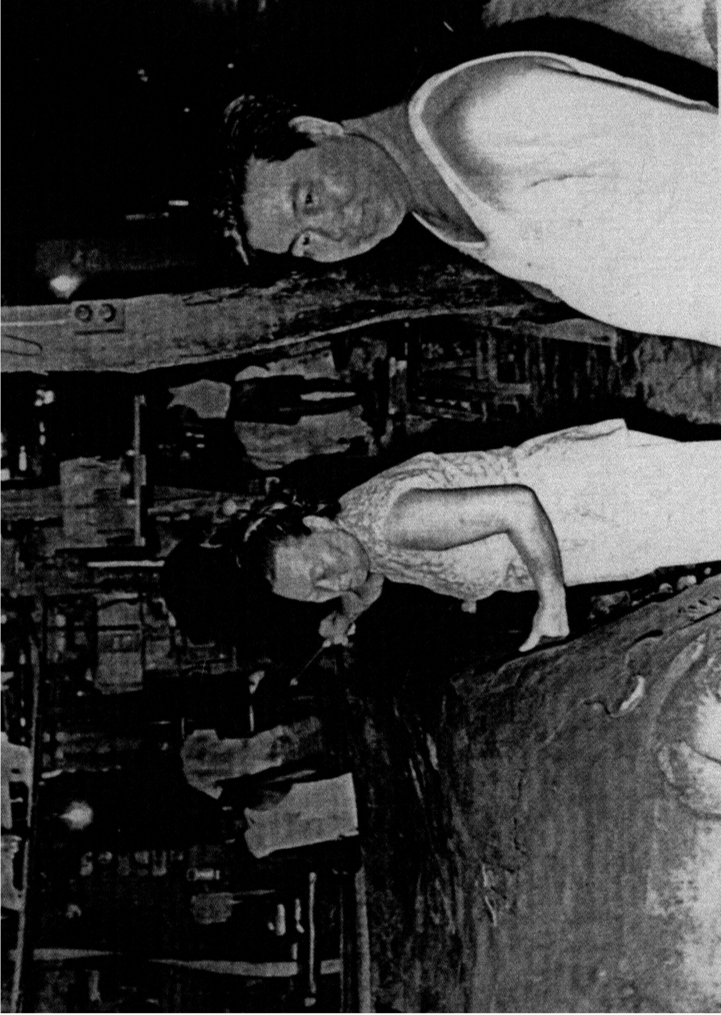
চীনের পথে

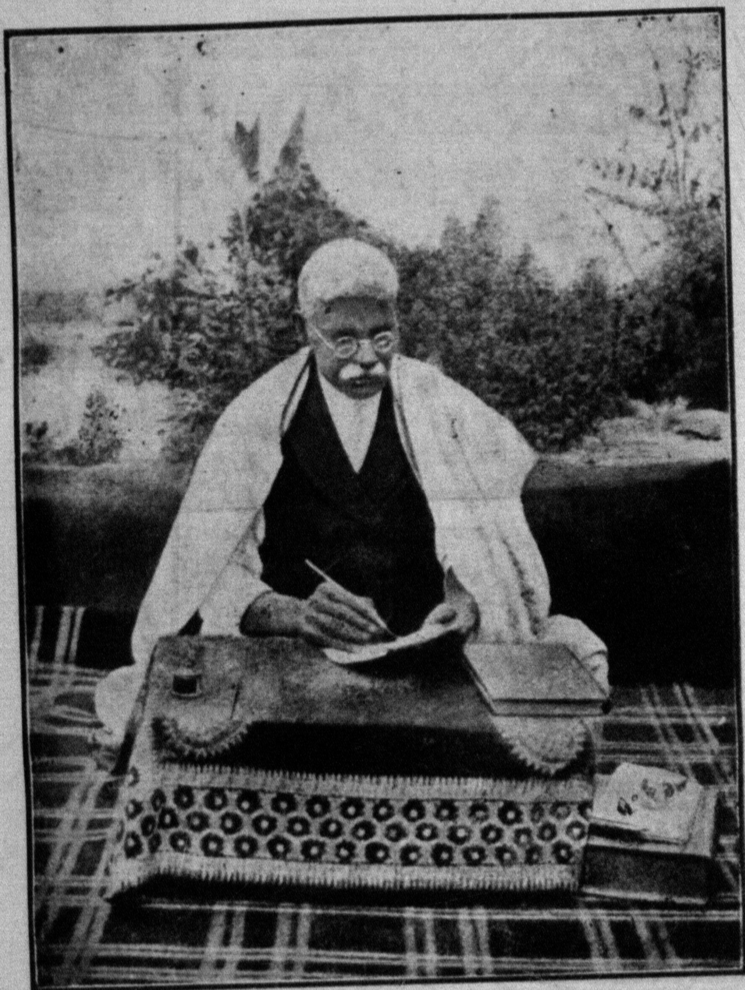
(২১শে মার্চ ১৯২৪)

চিনযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ছবিটি তোলা হয়েছিল ২১ মার্চ ১৯২৪। মহাচিনের অতিথি হয়ে কবিগুরু দুই প্রাচীন সভ্যতার সেতুবন্ধনে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন, যদিও বাধা এসেছিল চিনের নবজাগ্রত যুবশক্তির কাছ থেকে। যুগপরিবর্তনের ইঙ্গিত পেয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সজাগ হয়ে উঠেছিলেন।



নিয়মশৃঙ্খলা মেনে সততা, ভদ্রতা ও কর্মদক্ষতায় কলকাতার চিনারা চিরকালই স্থানীয় বাঙালিদের ভালবাসা অর্জন করেছেন। মোনা চৌধুরীর এই ছবিতে সত্তরের দশকে চিনা পরিবারের সান্ধ্যভোজ। চিনা ডাইনিং টেবিলের মধ্যিখানে আর একটা ঘূর্ণায়মান রাউন্ড টেবিল রয়েছে যাতে পছন্দমতো পদগুলো নিজের কাছে ঘুরিয়ে আনা যায়।





জন্ম ঃ

৪ঠা ফাল্গুন ১২৬৯

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩

দেহাবসান ঃ

১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

২৯শে নভেম্বর ১৯৪৯

বিশ শতকের শুরুতে বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা চিনে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেখানে বেশ কিছুদিন বসবাস করেছিলেন তাঁদের অন্যতম লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেহাবসানের আগের দিন (৩ জুলাই ১৯০২) ক্লাইভ জাহাজে তিনি কলকাতা বন্দর ত্যাগ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে 'চিনযাত্রী' ভ্রমণ কাহিনীটি রচনা করেছিলেন। চিন সম্পর্কে সেকালের বাঙালি মানসিকতা বোঝাবার জন্যে অনবদ্য এই রচনাটি এই বইতে সংযোজিত হয়েছে।

চিন দেশে গমন করিয়া এক বার এক ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোক, এক ব্যক্তি চিনের বাটিতে ভোজন করিতেছিলেন, খাইতে খাইতে বাসনে এক প্রকার নূতন মাংস দেখিয়া একবার এক দৃষ্টে ঐ চিন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং এক বার বাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বা, আ, আ, শব্দে জিজ্ঞাসা করেলেন, ইহা কি মেষমাংস? তাহাতে ঐ চিনদেশীয় লোক তদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রত্যুত্তর করিল, বাউ, আউ, অর্থাৎ মহাশয়! ইহা মেষমাংস নহে, অতি সুখাদ্য কুক্কুরশাবকের মাংস। তৎ শ্রবণে ঐ ভদ্রলোক অতিশয় আশ্চর্যাবিষ্ট হইয়া একবারে হাত গুড়াইলেন আর আহার করিলেন না।

আর এক বার এক জন ইংরাজ চিনদেশের বাজারে বাজার করিতে গিয়াছিলেন, তথায় চিনদেশীয় এক ব্যক্তিকে শুষ্ক ইন্দুর ক্রয় করিতে দেখিয়া তিনি কৌতূহলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! দেখিতেছি, আপনি ভদ্রসন্তান, এ শুষ্ক ইন্দুরগুলা লইয়া কি করিবেন? তচ্ছ্রবণে ঐ চিনে লোক সহাস্য বদনে প্রত্যুত্তর করিল, তুমি কোথাকার লোক, চিনদেশে বাস কর, শুষ্ক ইন্দুর সিদ্ধ করিলে কিরূপ উপাদেয় খাদ্য হয় তাহা কি অদ্যাবধি জান না?

দরিদ্র লোকেরা কষ্টকল্পে কাল যাপন করে বটে, কিন্তু ধনাঢ্য লোকদিগের আহারের ক্লেশ কিছু মাত্র নাই, তাহারা অপর্যাপ্তরূপ ভোজনাদি করে। মহোৎসবাদির সময়ে চারি ঘণ্টার ন্যূনে তাহাদিগের ভোজন পানাদি হয় না।

পরিচারকেরা ক্রমে ক্রমে কত সামগ্রী আনয়ন করে তাহার সংখ্যা করা যায় না, শেষ খাদ্য কখন্ আসিবে, নিমন্ত্রিত লোক এই প্রতীক্ষা করিয়া ক্রমে বিরক্ত হয়। থালার ন্যায় প্রশস্ত পাত্রে খাদ্য আনয়ন করা চিনদেশীয় লোকদিগের মধ্যে ব্যবহার নাই। বকুনার মত গভীর প্রশস্ত পাত্রে ব্যঞ্জনাদি আনাই তাহাদিগের চলিত প্রথা। কারণ ঝোলের উপর মাংস ভাসিয়া না থাকিলে তাহাদিগের মুখপ্রিয় হয় না, যা কিছু খায় ঝোলই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য। ইংরাজেরা ভোজনসময়ে যেরূপ ছুরি কাঁটা ব্যবহার করে, চিনদেশীয় লোকেরা সেরূপ করে না, কাঠের হাতাই

তাহাদিগের খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করণের একমাত্র উপায়। তবে চা পান করণের সময় তাহারা কখন কখন চামচ ব্যবহার করে।

চিনদেশীয় লোকেরা পক্ষিনীড় আহার করে, এ কথা শুনিলে পাঠকগণ বোধহয় আশ্চর্যাবিষ্ট হইবেন, পরন্তু সে নীড়গুলা আমাদিগের দেশের ভূচর অথবা জলচর পক্ষীর কাষ্ঠ অথদা কর্দমনির্মিত নীড়ের ন্যায় নহে। সে দেশে এক বিশেষ জাতীয় পক্ষী আছে, ওই পক্ষীর মুখের লালে ওই নীড় নির্মিত হয়, প্রস্তরময় পাহাড়ে উহা এমনি লাগিয়া থাকে, যে বহু যত্নে টানিলেও সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না। সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে উহা শরীরের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর, এজন্য অন্যান্য খাদ্যোপযোগী দ্রব্যাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

চিনদেশীয় লোকেরা উষ্ণ না করিয়া কোন খাদ্য আহার করে না, মদ্য পর্যন্ত উষ্ণ করিয়া পান করিয়া থাকে। ইংলন্ডে যেরূপ আঙ্গুরফলে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেস্থলে সেরূপ হয় না, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের ন্যায় তথাকার লোকেরা তণ্ডুল রসে মদ্য প্রস্তুত করে এবং চা পান করণীয় পাত্রের ন্যায় এক প্রকার বাটিতে তাহা পান করে। চা এ দেশে অপর্যাপ্ত জন্মে, এ জন্য কি ছোট কি বড় এখানকার সকল লোকেই প্রচুর রূপে চা পান করে।

চাবৃক্ষ পাহাড়ের উপর জন্মে, উহার ফুল ঠিক শ্বেতবর্ণ গোলাপ ফুলের ন্যায়। চিন লোকেরা উহার পাতা তুলিয়া ক্রমে ক্রমে অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইয়া একটি উত্তপ্ত লৌহপাত্রে শুষ্ক করে, এবং তাহাতেই চা প্রস্তুত হয়। চা প্রস্তুত হইলে তাহারা বাক্সবন্দি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করে, শীতল দেশমাত্রেই উহা আগ্রহপূর্বক প্রায় ক্রয় করিয়া থাকে, এজন্য উহার বাণিজ্যে চিন লোকদিগের বহু অর্থ লাভ হয়। দুগ্ধ চিনি সংমিশ্রিত না করিয়া অন্যান্য দেশে দরিদ্র লোকেরাও চা পান করে না, কিন্তু চিন দেশে সে ব্যবহার নাই, তথাকার লোকেরা একটি ক্ষুদ্র পাত্রে উষ্ণ জল রাখিয়া তন্মধ্যে চা নিক্ষেপ করত: অপর একটি পাত্র উহাতে ঢাকা দেয়, পরে ক্ষণকাল বিলম্বে ঐ জল পান করে।

বঙ্গ দেশের যেরূপ তামাক, চিন দেশে চায়ের ব্যবহারও সেই রূপ ;

অভ্যাগত লোক আইলেই তাহারা অগ্রে এক পাত্র চা দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করে।

তুরস্ক আরব প্রভৃতি আসিয়াখণ্ডের লোকেরা যেরূপ সুশ্রী এবং রূপবান্, চিনদেশীয় লোকেরা সেরূপ নহে ; বাহ্য দৃষ্টিতে তাহাদিগকে লোকে কুৎসিত বোধ করে। গৌরবর্ণ হইলে কি হয়, তাহাদিগের বদনমণ্ডল সাতিশয় অপ্রিয়কর, নেত্র দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, নাসিকা নিম্ন অর্থাৎ চ্যাপ্‌টা, দুই গণ্ডের প্রধান অস্থিদ্বয়ই উন্নত। মস্তকের প্রধান ভূষণ যে কেশ, সে কেশকে তাহারা এ দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রায় মুণ্ডন করে, কেবল শিরের মধ্য স্থানে যে কতকগুলি কেশ থাকে, তাহাকে তাহারা বিনাইয়া সর্পলাঙ্গুলের ন্যায় বেণী করত পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া দেয়, কখন কখন ঐ বেণী বর্ধিত হইয়া তাহাদিগের পদস্পর্শ পর্যন্ত করে।

স্থূল এবং দীর্ঘকায় ব্যক্তি সে দেশের লোকের বড়ই আদরণীয়, এজন্য তত্রস্থ ধনাঢ্য লোকেরা নিয়ত পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিয়া স্থূল হইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন পায়। প্রধান অপ্রধান সকল লোকেরই নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করা প্রায় সামাজিক নিয়ম। ইহাদের জামার আস্তীন দুটা ঢিলা থাকে, ধনাঢ্য লোকেরা ঐ আস্তীনে কখন কখন সোণা ও রূপার গোটা লাগায়।

শীর্ণকায় স্ত্রী চিন দেশের লোকের বড়ই প্রশংসনীয়া, তাহারা পুরুষদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে বটে, কিন্তু শিরোভূষণ, খর্বপদ এবং লম্বা লম্বা নখ থাকাতে তাহারা যে পুরুষ নয় ইহা অনায়াসে অনুভূত হয়।

কারণ নানা প্রকার কৃত্রিম পুষ্প দ্বারা তাহারা কেশের শোভা করে, কখন কখন স্বর্ণনির্মিত একটা ক্ষুদ্র পক্ষী প্রস্তুত করিয়া হীরা মতি পান্না দ্বারা তাহা পরিভূষিত করণানন্তর মস্তকের ঊর্ধ্বভাগে পরিধান করে।

পঞ্চম বর্ষীয় বালক বালিকাদিগের ন্যায় তাহাদিগের পদদ্বয় ক্ষুদ্র হয়, ইহা কিছু স্বাভাবিক নহে, তাহাদিগের পিতা মাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কন্যা আমার গজগামিনী হইবে, এই প্রত্যাশায় জনক জননী পঞ্চম বর্ষ বয়স কালে এমনি করিয়া বালিকাদিগের পদ

দৃঢ়তররূপে বন্ধন করে, যে তাহা আর বাড়িতে পারে না। তাহাতে ওই অবলাগণ যে কত যন্ত্রণা পায় তাহা বর্ণনা করাই দুষ্কর, ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা হইলে তাহারা ঐ পদবন্ধন খুলিয়া দেয়, তখন অঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে যেরূপ হয়, তাহাদিগকেও সেই রূপ দেখায়, এমন কি, একটি সামান্য ধাক্কা লাগিলে তাহারা পড়িয়া যায়, গমনকালে তরঙ্গস্থিত নৌকার ন্যায় তাহারা এ দিক্ ও দিক্ হেলিতে দুলিতে থাকে।

আহা চিন দেশীয় লোকেরা কি বুদ্ধিমান্, এরূপ গমন করাকে তাহারা আবার প্রশংসা করে, এরূপ ক্ষুদ্র পদকে তাহারা নাকি পদ্মপদ বলিয়া থাকে। বড় বড় আস্তিনে কুলবালাদিগের হস্তাঙ্গুলি নিয়ত আবৃত থাকে বলিয়া তাহা প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু বাম হস্তের অঙ্গুলির নখ এত বড় যে, পক্ষিনখের ন্যায় কখন কখন তাহা বস্ত্রভেদ করিয়াও বাহির হয়। চিনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা গীত বাদ্য শিল্প কর্মে বড়ই নিপুণা ; পুরুষদিগের মনোরঞ্জনার্থ সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্রোপরি তাহারা নানা প্রকার শিল্প কর্ম করে, এবং মধুর স্বরে বিবিধ বাদ্য বাজায়, এজন্য তাহাদিগের বাম হস্তে যত বড় নখ থাকে, দক্ষিণ হস্তে তত বড় থাকে না।

দরিদ্র লোকদিগের ন্যায় কায়িক পরিশ্রম করিতে হয় না, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত চিনদেশীয় ভদ্র লোকেরা কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে দীর্ঘ নখ রাখেন ; কারণ দীর্ঘ নখ দেখিলেই লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে ইনি পরিশ্রমসাধ্য কর্ম করেন না, তাহা হইলেই অবশ্য নখটি ভাঙ্গিয়া যাইত। চিনেরা সুবুদ্ধিমান বলিয়া সর্বত্র পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ নির্বুদ্ধিতার কর্মকে কখন কি বুদ্ধিমানের কর্ম বলা যায়?

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করা চিনদেশীয় স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রথা, কিন্তু মহোৎসবাদি পর্বের সময় কৃষ্ণ ধূমল হরিৎ পীত লোহিত বর্ণের বস্ত্রও তাহারা পরিধান করিয়া থাকে, বিশেষ রাজপরিবার এবং আমিরগণের পীত ও লোহিত বর্ণের বস্ত্র পরিধান করা প্রাধান্যের একটি চিহ্নসূচক হয়। আত্মীয়গণের বিয়োগ হইলে শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করা চিনদেশীয় লোক মাত্রেরই সাধারণ প্রথা ; মাতা পিতার বিয়োগ হইলে পুত্র কন্যা উক্ত বস্ত্র তিন বৎসর পরিধান করিয়া থাকে।

আরব তুরষ্ক পারশ্য প্রভৃতি পূর্বদেশনিবাসী লোকদিগের নির্মাণের যে রূপ রীতি, চিনদেশীয় লোকদিগেরও প্রায় সেই রূপ ; প্রভেদের মধ্যে এই, কি ধনাঢ্য কি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ, একতালা গৃহে বাস প্রায় সকলেই করিয়া থাকে। একটি দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা তাহাদিগের অন্তঃপুর এবং সদর বাটী বিভিন্নীকৃত হয়। লম্বা টানা ঘর করিয়া তাহারা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দ্বারা তাহা বিভাগ করে।

চিনদেশে গ্রীষ্মকালে যেরূপ গ্রীষ্মের আতিশয্য, শীতকালে শীতেরও সেই রূপ প্রভাব হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম নিবারণ হেতু ধনবন্ত লোকেরা পুষ্করিণীর মধ্যভাগে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করত গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করে, সেতু দ্বারা ওই অট্টালিকা অন্যান্য গৃহের সহিত সংযোজিত হয়। কোন কোন স্থানে পুষ্করিণীর মধ্যভাগে অট্টালিকা থাকে না, চতুর্দিকে ইষ্টকালয়, মধ্যে একটি সরোবর থাকে, প্রকোষ্ঠের ন্যায় ওই সরোবরের চতুর্দিকেই ঘাট নির্মাণ হয়, যখন দুঃসহ গ্রীষ্মের প্রভাবে লোক সাতিশয় কাতর হয়, তখনই ঐ ঘাটের ধাপে বসিয়া শরীর শীতল করে।

চিনদেশীয় যে, স্বর্ণ এবং রৌপ্য মৎস্যের কথা আমরা নিরন্তর শুনিতে পাই, যাহা এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য লোকেরা কাচনির্মিত আধারে অতি যত্নপূর্বক গৃহমধ্যে রাখেন, সেই মৎস্য ঐ পুষ্করিণীতে কেলি করিয়া বেড়ায়, তদ্দর্শনে নয়নের যে কত পরিতৃপ্তি হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। গ্রীষ্ম নিবারণের কথা ত এই রূপ বলিলাম, চিনদেশের উত্তরাংশে ভয়ানক শীত হয়, এই দারুণ শীতের সময়ে তাহারা দালানের মধ্যভাগে গুলের আগুন প্রস্তুত করে, আর সমস্ত পরিবার ঐ অগ্নির চতুঃপার্শ্বে বসিয়া শীত নিবারণ করে।

ইংরাজদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান চিনদেশস্থ সাঙ্গাই নগর বিষয়ে, ভারতবর্ষবাসী এক জন ইংরাজ গ্রীষ্মের উল্লেখ করিয়া, ইংলন্ডে আপন বন্ধুকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, "বন্ধুবর! গ্রীষ্মকালে কলিকাতাকে ইংরাজেরা দারুণ গ্রীষ্মের স্থান বোধ করে, কিন্তু সাঙ্গাই কলিকাতা অপেক্ষা সহস্রাংশে অপকৃষ্ট, দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রাবণ মাসে আমরা সাঙ্গাই

নগরে গিয়াছিলাম। মধ্যাহ্ন কালের কথা দূরে থাকুক, দিবা রাত্রির কোন ভাগেই আমরা একটুক নির্মল পরিষ্কৃত বায়ু পাইতাম না, পাখা ব্যজন করিতে করিতে আমাদের হস্তে বেদনা হইত।

কার্য বশতঃ যদি কোন দিন বাহির হইতাম, তবে অসুখের আর পরিসীমা থাকিত না, ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া প্রাণ যায় প্রাণ যায় করিতাম, আর এবার যদি ঈশ্বর রক্ষা করেন, তবে বহুকাল জীবিত থাকিব, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া তরুগণের প্রতি অবলোকন করিতাম, কিন্তু কোন স্থানে পত্র সঞ্চালন হইতেছে এমন অনুভব হইত না। জগৎপ্রাণের অভাবে প্রকৃতির সকল পদার্থই যেন প্রাণ যায় প্রাণ যায় করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ইহা আমাদের উপলব্ধি হইত। অধিক কি লিখিব, প্রাকৃতিক পদার্থের আঘ্রাণ লওয়া যে ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রধান কর্ম তাহা আমাদিগের শিথিল হইয়াছিল। কি রাত্রি কি দিন যত কাল সাঙ্গাই নগরে ছিলাম গ্রীষ্ম প্রযুক্ত এক দিনও আমাদের সুখে নিদ্রা হয় নাই।"

ইংরাজদিগের ন্যায় চিনদেশীয় লোকেরা কৌচ কেদারা টেবিল ও সোফা ব্যবহার করিয়া থাকে, অন্যান্য পূর্বদেশনিবাসীদিগের ন্যায় অগ্রে মাদুর তদুপরি গালিচা বা চাদর বিছাইয়া শয়নোপবেশন করে না, কিন্তু শয়নশয্যার উপরিভাগে ইংরাজেরা যেরূপ গদি ব্যবহার করে, তাহারা সেরূপ করে না ; শুদ্ধ মাদুরের উপর চাদর পাতিয়া আর তদুপরি একটি বালিশ দিয়া সুখে নিদ্রা যায়।

এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য লোকেরা নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্তি এবং আয়না দ্বারা যেরূপ গৃহ শোভা সম্পাদন করেন, চিনদেশীয় লোকেরা সেরূপ করে না, লণ্ঠন এবং সার্টিন বস্ত্র দ্বারা গৃহ সুসজ্জীভূত করা তাহাদিগের চলিত প্রথা। ধনাঢ্য চিনদিগের উদ্যান দেখিতে সর্বাপেক্ষা সাতিশয় মনোরম ; তত্রস্থ বৃক্ষ এবং পুষ্পাবলির এমনি শোভা যে, উদ্যানে প্রবেশ করিবামাত্র মন ও নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, বিশেষ উদ্যানের এক এক স্থানে তাহারা হোমাপক্ষী ময়ূর এবং হরিণাদি সুন্দর সুন্দর পশু পক্ষিগণকে দীর্ঘ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ঐ সমুদায় পশু পক্ষী দর্শক লোকদিগকে দেখিলে তালে তালে নৃত্য করিয়া নানা প্রকার আহ্লাদ প্রকাশ করে।

চিনদেশের সম্রাটের যত প্রজা আছে, পৃথিবীস্থ কোন রাজারই তত প্রজা নাই। এই দেশের প্রজাসংখ্যা মহাবিক্রমশালী রুষিয়া দেশীয় ভূপালের প্রজা অপেক্ষাও ছয় গুণ অধিক। চিনেরা স্বদেশাধিপতিকে যেরূপ সম্মান করে, অন্য কোন দেশের প্রজা বাজাকে তাদৃশ সম্মান করে না।

"স্বর্গ পুত্র, দশ সহস্র বর্ষ, লোক সমূহের পিতা" ইত্যাদি চিনেশ্বরের উপাধি! তিনি এই উপাধি রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করেন ; প্রজার অনিষ্ট যাহাতে হয় এমন কর্মে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারি উপস্থিত হইলে, সম্রাট প্রজার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন, এবং ধর্মাধিকরণের কোন কর্মই করেন না, ইহাতে তাঁহার প্রতি প্রজাদিগেব আরও অনুরাগ জন্মে। পরিশ্রম বিষয়ে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে এক দিন তিনি স্বয়ং হলাকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রের ভূমি কর্ষণ ও শস্য বপন করেন। স্ত্রীজাতিদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ রাণীও এক দিন তুঁৎক্ষেত্রে যাইয়া তুঁৎপোকাদিগকে স্বহস্তে ভোজন করান, এবং নেটাই দ্বারা রেশম গুটাইয়া গোলা বন্ধন করেন।

পীতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করা সম্রাটের একটি বিশেষ চিহ্ন। তিনি ব্যতীত তাঁহার অপর কোন জ্ঞাতি কুটুম্বে ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারেন না ; তাঁহারা রাজ আত্মীয় বলিয়া কেবল কটিদেশে এক একটি পীত বর্ণ পটুকা অর্থাৎ কোমরবন্ধ পরিধান করেন। অন্যান্য দেশে, রাজবংশোদ্ভব অথবা প্রধান লোকের সন্তান হইলে লোকে যেরূপ মান্য গণ্য হয়, চিনদেশে সেরূপ হইতে পারে না, তথায় কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত লোকেই রাজ্যের উচ্চপদ পাইয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, তত্রস্থ ভদ্রলোকের সন্তানেরা প্রধান পদ পাইবার আশায় এমনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করে, যে রাত্রিকালে তাহারা নিদ্রা যায় না। কেহ কেহ নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত কড়ি কাঠের হুকে এক গাছি দড়ি বাঁধিয়া তাহা আপন কেশে বন্ধন করে, নিদ্রাকর্ষণ হইলে যেমন মস্তক অবনত হয়, অমনি ঐ রজ্জু গাছটিতে টান পড়ে, আর

একেবারে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রধান প্রধান নগরে সাধারণ ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটি প্রশস্ত হল অর্থাৎ দালান আছে ; ঐ দালানে বৎসরের মধ্যে এক বার কৃতবিদ্য লোকদিগের সমাগম হয়! সমাগম হইলে উচ্চপদারূঢ় এক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সুকঠিন একটি প্রবন্ধ লিখিতে দেন, যিনি ঐ প্রবন্ধ সম্যক্ প্রকারে লিখিতে পারেন, তিনিই মান্য গণ্য হইয়া উঠেন, এবং এইরূপ তিন চারি বৎসর তিন চারি দালানে পরীক্ষা প্রদান করিলে অবশেষে মেণ্ডারিন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

চিনদেশীয় মেণ্ডারিন সামান্য মনুষ্য নহেন, তিনি একটি প্রদেশাধিপতি, সমস্ত প্রদেশের রাজকার্য তদ্দারা নির্বাহিত হয়। মেণ্ডারিনের মধ্যে যিনি সাতিশয় সুবিদ্বান ও রাজকার্যে পারদর্শী বলিয়া সর্বত্র মান্য গণ্য হন, তিনিই রাজার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সমস্ত চিনদেশে তিন জনমাত্র প্রধান মেণ্ডারিন আছেন, ইহাঁরা প্রায় সম্রাটের তুল্য ক্ষমতাশালী।

চিনদেশীয়েরা সাতিশয় বুদ্ধিমান্ লোক! মুদ্রাঙ্কনের ফলোপধায়কতা, বারুদের উপকারিত্ব, এবং চুম্বক পাথরের গুণ প্রথমে ইহারাই প্রকাশ করে। যে পট্টবস্ত্র এবং কাঁচের বাসন ইউরোপে এখন বাহুল্য রূপ চলিতেছে, তাহাও চিনদেশে প্রথমে উৎপন্ন হয়।

ইউরোপীয়েরা এক্ষণে শিল্প বিদ্যার প্রভাবে উক্ত কয়েক বিষয়ের সাতিশয় উন্নতি করিয়াছেন। স্বজাতীয় বিদ্যা অপর দেশীয়দিগের নিকট কোন মতে প্রকাশ না হয়, ইহা চিনদেশীয়গণের নিতান্ত বাসনা বটে, কিন্তু তাহারা তাহা সিদ্ধ করিতে পারে নাই। ইউরোপীয় লোকেরা দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের সকল বিদ্যাই শিখিয়া লইয়াছে।

কিম্বদন্তী আছে, রোমীয় খৃষ্টমতাবলম্বী এক জন যাজক, গোপন ভাবে এক গাছি শূন্যগর্ভ যষ্টির ভিতরে তুঁতপোকার ডিম্ব আনয়ন করিয়া ইউরোপে পট্টের সৃষ্টি করেন।

চিনদেশীয় লোকদিগের ভাষার ন্যায় কঠিন ভাষা পৃথ্বীতলে আর নাই। বর্ণ সংযোগ দ্বারা আমাদিগের যেরূপ এক একটি বাক্য হয়, তাহাদিগের সেরূপ হয় না, প্রত্যেক কথাই তাহারা এক একটি অঙ্ক

অথবা প্রতিমূর্তি দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদিগের লেখনী নাই, তুলিকা দ্বারা ঐ কর্ম নিষ্পাদিত হয়! চিত্রকরেরা তৈল অথবা জলপাত্রে যেরূপ বিবিধ বর্ণের বটিকা ঘর্ষণ করিয়া ক্রমে চিত্র কর্ম সম্পন্ন করে, তাহারাও সেইরূপ মর্মর প্রস্তরময় পাত্রে মসির বটিকা ঘর্ষণ করিয়া মসির কর্ম করে। কালী তুলি জল এবং মর্মর প্রস্তর ব্যতিরেকে তাহাদিগের লিখন কার্য হয় না, এজন্য এই চারি বস্তুকে তাহারা অমূল্য পদার্থ কহে।

অপর সভ্যদেশীয় লোকদিগের ন্যায়, চিনদেশে বিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষকেরা বড়ই সম্মানিত হন, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা বিধানের নিয়ম বড় ভাল নহে, মুখস্থ করাকে তাঁহারা এ কর্মের সার কর্ম বলিয়া মানেন! তুলিয়া ধরিয়া যে বালক শব্দ চিত্রিত করিতে পারে, যাহার স্মৃতিশক্তি বড়ই তীক্ষ্ণ, বুঝুক বা না বুঝুক তোতা পাখীর ন্যায় যে সকলই মুখস্থ বলিতে পারে, সেই বালকই উপদেশকের বড় স্নেহভাজন হয়, আর উত্তম বলিয়া তাহাকে সকলেই সমাদর করে। শিক্ষক পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া থাকেন, বালকেরা চীৎকার শব্দ করিয়া পাঠ মুখস্থ বলে।

চিনদেশীয় লোকেরা সাতিশয় শান্তপ্রকৃতি রাজনিয়মানুরক্ত, বিবাদ বিসম্বাদ দাঙ্গা হাঙ্গামে হঠাৎ প্রবৃত্ত হয় না। অপরাধীর দণ্ড বিধানার্থ সে দেশে যে সকল কঠিন নিয়ম আছে ; তাহাতে লোকে যে সচ্চরিত্র হইবে তাহা বড় অসম্ভবনীয় নয়।

বংশযষ্টি প্রহারই তত্রস্থ অপরাধী লোকদিগের দণ্ড। অপরাধের লঘু গুরুত্ব অনুসারে ঐ দণ্ড বিবিধ প্রকার হয়, অর্থাৎ সামান্যাপরাধে ৪ অবধি ২০ বংশযষ্টি প্রহার, তদপেক্ষা গুরুতর হইলে ২০ অবধি ৪০ ঘা পর্যন্ত প্রহার হয়, আর যে সকল ব্যক্তি দেশান্তর করণের উপযুক্ত অপরাধী, তাহাদিগের দণ্ড পঞ্চাশৎ অবধি এক শত পর্যন্ত হইয়া থাকে। শেষোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে প্রায় বাঁচিতে হয় না, মারি খাইতে খাইতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।

রাজবিদ্রোহ, হত্যা এবং বলপূর্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিনাশ করাকে চিনদেশীয় বিচারকেরা অত্যুৎকট দোষী বোধ করেন। এই তিন প্রকার অপরাধের একই দণ্ড ; যাহারা এই তিন প্রকারের অন্যতর অপরাধে

অপরাধী হয়, তাহারা যাবজ্জীবন দেশান্তরিত নতুবা হত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এতাদশ দোষে দূষিত হইয়া বিচারকের সাক্ষাতে স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তিনি দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া তাহাকে উহা স্বীকার করান। এ দেশে কতগুলি জেলা সম্পর্কের বিচারক আছেন ; তাঁহাদের উপাধি গ্যানচাসজী ; তাঁহারা মেণ্ডারীন অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। গুরুতর কঠিন বিষয়ে দণ্ডবিধান করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা নাই, শুদ্ধসামান্য দণ্ড তাঁহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হয়।

অপরাধীকে কাষ্ঠের তক্তার উপর শয়ন করাইয়া তাঁহারা স্বহস্তে বংশযষ্টি প্রহার করেন, অনেক ব্যক্তি প্রহারিত হওনানন্তর পৃষ্ঠদেশ পুঁছিতে পুঁছিতে সহাস্য বদনে বাটী গমন করে। গুরুতর অপরাধ হইলেই তাঁহারা রাজধানী পেকিনের ধর্মাধিকরণে জানান। বঙ্গদেশে অপরাধীর যথার্থ বিচার করিতে যত কাল বিলম্ব হয়, চিনদেশে সেরূপ হয় না, অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত বিচারকার্যের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

চিনদেশনিবাসী এক ইংরাজ লিখিয়াছেন, "আমি এক বার কোন কর্মানুরোধে সাঙ্গাইনগরের নিকটবর্তী এক প্রদেশে গিয়াছিলাম ; রাজমার্গে দেখিলাম, জন কএক সৈনিক পুরুষ এক ব্যক্তিকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তথ্য জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরীরা বলিল, এ ব্যক্তি চোর ; এক ভদ্র লোকের কন্যার আভরণ অপহরণ করিয়াছে বলিয়া আমরা ইহাকে বিচারালয়ে লইয়া যাইতেছি। তাহারা এই বলিয়া প্রস্থান করিলে আমি ঐ স্থানের এক দোকানে বসিয়া জল পান করিতে লাগিলাম ; অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে দেখিলাম, পূর্বোক্ত প্রহরিগণ সেই দোষীকে একটা আগড়ে শুয়াইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহাতে আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, মহাশয়! ও দুরাত্মার সমুচিত দণ্ড হইয়াছে, বিচারক ইহার পৃষ্ঠে দশ ঘা লাঠী মারিয়াছেন। চলিতে পারে নাই বলিয়া আমরা ইহাকে বহিয়া লইয়া বাটী যাইতেছি। এত অল্পক্ষণের মধ্যে কিরূপে বিচারকার্য নিষ্পত্তি হইল এই বিবেচনা করিয়া আমি সাতিশয় আশ্চর্যাবিষ্ট হইলাম।"

প্রত্যেক রাজধানী এবং প্রধান নগরে এক একটি বিচারালয় আছে,

মেণ্ডারিনদিগের দ্বারা ঐ সকল বিচারালয়ের বিচারকার্য নিষ্পাদিত হয়। এস্থলে যে প্রতিমূর্তিটি* দেওয়া গেল, তদ্দর্শনেই পাঠকবর্গ চিন জাতীয় লোকদিগের দণ্ড বিধানের নিম্নলিখিত সমুদায় প্রণালী কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চিত্রটির মূল তাৎপর্য এই, চিনদেশীয় স্ত্রীলোকেরা নিয়ত অন্তঃপুরে বাস করে, যাহাতে বিচার জন্য বাজধর্মাধিকরণে আসিতে হয়, এমন কর্ম তাহাদিগের দ্বারা প্রায় হয় না, কিন্তু হইলে, তাহাদিগের দণ্ড বংশযষ্টি দ্বারা না হইয়া চর্মকশাঘাত দ্বারা নিষ্পাদিত হয়।

এক জন প্রহরী অপরাধকারিণীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে মেণ্ডারিনের সম্মুখে লইয়া যায়, মেন্ডারিন তাহার মুখে যে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তাঁহার দেওয়ান তাহা লিখিতে থাকেন। লেখা শেষ হইলে বিচারক অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা প্রহরীকে তাহার দণ্ড বিধান করিতে আদেশ করেন, আদেশ করিলে ঐ সৈনিক পুরুষ তাহার গণ্ডদেশে কষাঘাত করিতে থাকে।

বিচারের সময় বিচারকেরা যেরূপ পারিচ্ছেদ পরিধান করেন, যেরূপ মালা তাঁহাদিগের গলদেশে দোলায়মান হইতে থাকে, অতি সুন্দর ময়ূরপুচ্ছশোভিত যেরূপ টুপী তাঁহারা মস্তকোপরি ধারণ করেন, এবং বিচারাসনের সম্মুখে তাঁহারা ও তাঁহাদিগের প্রধান কর্মচারিগণ দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপে বিচারকার্য নিষ্পাদন করেন, সে সকলই পুর্বোক্ত চিত্রে বিশেষরূপ চিত্রিত আছে ; পাঠকগণ অবলোকন করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চিনদেশে পেকিন, ন্যানকিন এবং ক্যানটন নামে তিনটি প্রধান নগর আছে ; তন্মধ্যে পেকিন সম্রাটের বসতিস্থান, উহাতে যেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট নানাবিধ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যান, বন, উপবন, হ্রদ এবং পাহাড় আছে, অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। ন্যানকিন নগরে একটি টাউয়ার অর্থাৎ প্রাসাদশিখর আছে, চিনদেশে তত্তুল্য অত্যুচ্চ ইষ্টকালয় আর নাই ; সর্বশুদ্ধ উহা ২০০ ফিট্ উচ্চ।

চিত্রমালা দেখুন

উপর্য্যুপরি বিনির্মিত নয়টি গৃহের উপরিভাগে উহার শিখরদেশ বিরাজিত আছে, এক এক স্থানে এক একটি ঘণ্টা ঝুলান, কোন বিশেষ পর্ব্বাদির সময় সম্রাটের অনুমত্যনুসারে কেবল ঐ ঘণ্টার বাদ্য হয়। ক্যানটন এবং সাঙ্গাই নগরে অনেক বাণিজ্য কর্ম্ম হয় বলিয়া, উহা সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত, উহার সন্নিকটে যে সকল সাগর উপসাগর এবং হ্রদাদি আছে, সকলই নৌকা এবং জাহাজ দ্বারা পরিপূর্ণ, বাণিজ্য কর্ম্মের গোলযোগ এবং শ্রমোপজীবী সামান্য লোকদিগের কলরবে তথায় কান পাতা যায় না। প্রতারক প্রবঞ্চক বলিয়া লোকে চীনদেশীয় লোকদিগের দুর্নাম করে বটে, কিন্তু বাণিজ্য ব্যাপারে তাহারা বড়ই সচ্চরিত্র ; কোন প্রকারে শঠতা ও প্রবঞ্চনা করে না, এজন্যই ঐ দেশের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

চিনদেশীয় সম্রাট তাতার বংশজাত এবং রাজ্ঞীও ঐ বংশসমুদ্ভূতা, এজন্য চীনদেশীয় লোকদিগের সমুদায় ব্যবহার ইহাঁরা অনুসরণ করেন না, তাতার বংশীয়দিগের অনেক রীতি নীতি ইহাঁদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ঐ তাতার লোকদিগের গতি নিবারণার্থ চিনেরা স্বদেশের উত্তর দিকে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

ঐ প্রাচীর দীর্ঘে এক সহস্র পঞ্চ শত ক্রোশ, প্রস্তে পঞ্চ বিংশতি ক্রোশ এবং উর্দ্ধে বিংশতি ফিট। পূর্ব্বে চিনদেশে মেণ্ডারিন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন না, এবং মেণ্ডারিনদিগকে চারি জন বাহক ও অপর ভদ্রলোককে দুই জন বাহক বহন করিয়া লইয়া যাইত। এই নিয়ম এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

নৃত্য কিরূপ আমোদজনক, চিনদেশীয় কি ছোট কি বড় কেহই তাহা জানে না ; আমোদের মধ্যে ঘুড়ি ওড়ান বিষয়ে তাহাদের সকলেরই বিশেষানুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। নির্দয় এবং স্বার্থপর বলিয়া চিনদিগের কেহ কেহ দুর্নাম করে বটে, কিন্তু তাহারা জ্ঞাতি কুটম্বের প্রতি কোন মতেই নির্দয় নহে, পরস্পর যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা এক শত লোক এক গৃহে বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরের ব্যয়ানুকূল্য করে।

চিনদেশের কৃষক

আষাঢ় মাসে 'কংফুসে' এবং পরের মাসে 'চিনদেশের কৃষক' প্রকাশ করেছিলেন 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' সম্পাদক শকাব্দ ১৭৮০তে। এই প্রবন্ধটি পড়লে কি সাম্প্রতিককালে চিনের অগ্রগতি কতটা বিস্ময়কর তা আরও স্পষ্ট হবে।

পৃথিবীর যে স্থান নানাপ্রকার শস্যোৎপাদনের শক্তি বিশিষ্ট, ও যে স্থানের লোক যথা বিহিত-মনোযোগ-পূর্বক কৃষিকর্মে অনুরত হয়, তথায় যে অর্থের প্রাচুর্য হইবেক, ও তথাকার লোকেরা যে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি? কৃষিকার্য দেশের শ্রীবৃদ্ধির এক প্রধান দ্বারস্বরূপ ; কৃষি সেই দ্বারের দ্বারপাল, এই নিমিত্ত ইহা সহজেই নির্দিষ্ট করিতে পারা যায় যে যথায় কৃষিবিদ্যার সম্যক্ উন্নতি, ও তদানুসঙ্গিক কৃষকের সমাদর ও মনঃস্ফূর্তি আছে, তথায়ই কৃষিকার্যের আতিশয্য হইয়া থাকে, সুতরাং সেই স্থানে দ্রব্যাদিও প্রচুরপরিমাণে জন্মে।

চিনদেশে এই মহতী কল্যাণকারিণী কৃষিবিদ্যাতে এই দেশের ন্যায় অনুৎসাহ ও অনাদর নাই। তথায় কৃষিবিদ্যা পূজ্য, ও কৃষিকর্ম ভদ্র ব্যবসায় বলিয়া সমাদৃত ও অবলম্বিত হয়। ফলতঃ চিনদেশীয় ব্যক্তি জ্ঞানানুশীলনের যাদৃশ সমাদর করে, কৃষিকর্মানুশীলনের তাদৃশ না করুক তথাপিও তথায় কৃষি অপরাপর ব্যবসায় হইতে অশেষগুণে মান্য।

চিনদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকর্মের অবলম্বন করে ; অপর চিনদেশও পরমেশ্বরানুগ্রহে কৃষিকর্ম-সম্পাদনের বিশিষ্টরূপে উপযোগী হইয়াছে। তথায় এত পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে যে একাল পর্যন্ত তথাকার লোকদের ইচ্ছাপূর্বক ভিন্নদেশীয় শস্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত

চেষ্টা হয় নাই ; সুতরাং তাহারা বিদেশীয়দের সহিত বাণিজ্য করা প্রায় আবশ্যক কর্ম বলিয়া বোধ করে না। এই নিমিত্ত চিনজাতীয় যাহারা বিদেশে বাণিজ্যানুরত হয় তাহারা স্বদেশে ভদ্র বলিয়া গণ্য হয় না ; সুতরাং কৃষি লইয়াই চিনজাতি এ কথা বলিলে কিছু অন্যায় হইবেক না। তদ্দেশীয় রাজারাও কৃষিদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা ও তাহাদিগকে বশবর্তি রাখা অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন।

পরন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে চিন জাতীয়েরা কৃষিকার্য-সম্পাদন-বিষয়ে যেমন নিবিষ্টচিত্ত ও তৎপর, কিন্তু তেমন কৌশলজ্ঞ নহে। বারো সাহেব বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়া বলিয়াছেন যে "চিন-কৃষিদিগের অধ্যবসায় সন্দর্শন করিলে অবশ্যই তাহাদিগের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাদিগের সে শ্রমের যে যথার্থ ফল লব্ধ হয় না এ কথাও সহজে বলা যাইতে পারে।"

ফলতঃ তাহাদিগের কৃষিকর্মের যে সকল উপকরণ আছে তৎ সমুদায় ব্যবহার করিলে সমধিক ফললাভ হইতে পারে না। তাহাদিগের হল এমত দুর্বল যে উৎকৃষ্ট মৃত্তিকাতে তাহার যোজনা করিলে তাহা চারি আঙ্গুল নিম্নেও প্রবিষ্ট হয় না। অপর এক মৃত্তিকাতেই বৎসর বৎসর শস্য উপ্ত হয়, ইহাতে ক্রমশঃ মৃত্তিকার তেজের লাঘব হইয়া যায়। পুরাতন মৃত্তিকা উলটাইয়া পুরাতন মৃত্তিকার উপর নূতন মৃত্তিকা পড়িলে বৃক্ষকে সতেজ ও সরস করিতে পারে।

কিন্তু চিনেরা তাহাতে কোন মতে মনোযোগ করেন। অপর কেবল অস্ত্রের পরিবর্তন করিয়া দিলেই যে অপেক্ষাকৃত বিশেষ কল্যাণ হইবেক এমনও বোধ হয় না, কারণ চিনদিগের ভূমিকর্ষণ-প্রণালীও উৎকৃষ্ট নহে। চিনদেশে বৃদ্ধা স্ত্রীরা কৃষাণের কর্ম করে এবং গর্দ্দভ ও অশ্বতর প্রভৃতি পশুদ্বারা হলকর্ষণকার্য সম্পাদিত হয়। যদি এই সকলের পরিবর্তে তেজঃপুঞ্জ পুরুষ, সতেজ অশ্ব, বলিষ্ঠ গো অথবা মহিষ ইত্যাদির সমাবেশ হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃ উর্বর চিন রাজ্যে যে শস্যের প্রাচুর্য হইতে পারে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

চিনদেশীয় কৃষিদিগের কার্যগতিকের পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে

এমত উপলব্ধি হয় না যে নিজ-শ্রমার্জিত শস্যদ্বারা তাহারা অন্যত্রের কুলান করিবেক এতাদৃশ অভিপ্রায় রাখে ; কারণ সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে এই রূপ ভূমিতে চাষ দেয়, অধিক ভূমি কর্ষিত করে না।

ঈদৃশ পদ্ধতির একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে যদি দুর্ঘটনাবশতঃ কোন স্থানে শস্য না জন্মিলে, অথবা কোন কারণে নষ্ট হইয়া গেলে, অন্যস্থানহইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে না। এই নিমিত্ত এতাদৃশ অপূর্ব-উর্বরত্ব-বিশিষ্ট চিনদেশেও মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ-ঘটনা হইয়া থাকে ; সে সময়ে রাজাকে নিজ-ভাণ্ডার হইতে শস্য বিতরণ করিয়া প্রজার প্রাণ-রক্ষা করিতে হয় ; কিন্তু রাজা বার্ষিক প্রজার নিকট হইতে শস্যের দশম ভাগ গ্রহণ করেন।

এই রূপে রাজভাণ্ডারে যত শস্যের সংগ্রহ হয়, তাহা হইতে সৈন্য ও অন্যান্য কর্মকারদিগের আহার নিমিত্ত অধিক শস্য অপচিত হইয়া যায়, সুতরাং দুর্ভিক্ষ ঘটনকালে রাজভাণ্ডারস্থিত শস্যে সকল প্রজার আহারের কুলান হয় না। এই কারণ-বশতঃ রাজ্যের মধ্যে ২ বিদ্রোহাদির ঘটনা হইয়া থাকে, তৎসময়ে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা প্রাণধারণের নিমিত্ত ব্যাকুল ও জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহার শস্য থাকে তাহারই কাড়িয়া লইবার চেষ্টা পায় ; এবং ঐ চেষ্টা সিদ্ধির নিমিত্ত কাহারো প্রাণ নষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হয় না। এমন কি পিতা জ্বালাতন হইয়া পুত্রের প্রাণ বধ করে, পুত্রও পিতার দুর্দ্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বহস্তে তাহার যাতনার শেষ করিয়া দেয়।

পূর্বে বলা গিয়াছে যে চিনদেশের কৃষিকার্যের প্রণালী উৎকৃষ্টা নহে, এই নিমিত্ত তথাকার অধিক ভূমি পতিত থাকে। পরন্তু নিকৃষ্ট তাদৃশ হীন বলা যায় না। বারো সাহেবের নিরূপণানুসারে চিন দেশের তিন ভাগে চাষ হয়, আর এক ভাগ পতিত থাকে। ঐ এক ভাগের মধ্যে অনেক জলা আছে।

কৃষিদিগের ভগ্নকুটীর বা মৃণময় ভোজনপাত্র অথবা যৎসামান্য শয্যা দেখিয়া মহানুভাব ব্যক্তিরা উপহাস করেন না, অতএব এস্থলে ঐ

সকলের কোন পরিচয়-প্রদান করা আবশ্যক নহে তত্রাপি ইহা বক্তব্য যে চিনদেশীয় লোকেরা এ বিষয়ে অধম নহে। সম্প্রতি ফর্চুনসাহেব চিনদেশে থাকিয়া ও স্বয়ং তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন যে "চিনজাতীয় কৃষিরা স্বল্পার্জনেও স্বচ্ছন্দে লোকযাত্রা নির্বাহিত করে, তাহারা নানাব্যঞ্জনের সহিত আহার করে ; বিলাতেরও কৃষিরা সে রূপ আহার করিতে পায় না।"

অপর চিনজাতির কৃষিরা স্বর্ণালঙ্কার-বিষয়ে দরিদ্র হইলেও সরলতা, ভদ্রতা ও সাদর-সম্ভাষণ প্রভৃতি অলঙ্কারে বিশিষ্টরূপে অলঙ্কৃত ; বস্তুতঃ তাহা থাকিলে অন্য অলঙ্কারের সকল কার্যই সিদ্ধ হয়।

পূর্বপৃষ্ঠায় যে প্রতিরূপ প্রদর্শিত করা গেল [চিত্রমালায় পুনর্মুদ্রিত] তাহাতে সপরিবার এক চিনদেশীয় কৃষক পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হইবেক। কৃষাণীর কপালে মখমলের টুপি, তাহাতে কাচের মালা শোভা পাইতেছে। তদুপরি চর্মনির্মিত পুষ্প হস্তি দন্তের কটকে সংলগ্ন আছে। স্কন্ধদেশে একটি শিশু লইয়া কৃষাণী ধূম্রপান করিতেছে। কৃষকের কটিদেশে অগ্নি তুলিবার চকমকী ও ইসপাত, ও তামাকের থলী ঝুলিতেছে। জ্যেষ্ঠা কন্যাটীর মস্তকের কেশমণ্ডল বিবিধ কৃত্রিম পুষ্পে পরিবৃত। সে এক হস্তে অন্নের পাত্র, অপর হস্তে ভোজনশলাকা * লইয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছে। ব. চা. সি.

* ইংরাজেরা যে প্রকারে কাঁটার সাহায্যে ভোজন করে, চিনজাতীয়েরা সেই প্রকারে শালাকাদ্বয়ের আশ্রয়ে অন্ন ব্যঞ্জন আস্যস্থ করে।

বাঙালির জিরাফ চিনে

প্রবল পরাক্রান্ত চিনসম্রাটের সঙ্গে একবার বাঙালিদের মজার যোগাযোগ ঘটেছিল চিনা নৌবাহিনীর এক ভুবনবিদিত নৌ-সেনাধ্যক্ষের মাধ্যমে। এই চিনা সেনানায়কের নাম অ্যাডমিরল চেংহো।

মহাপরাক্রমশালী এই নৌ-অধ্যাক্ষের কথা প্রথম শুনেছিলাম বারওয়েল সায়েবের মুখে, পরে এঁর সম্বন্ধে পড়েছিলাম লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের খ্যাতনামা গ্রন্থগারিক ডানিয়েল বুরটিচের বইতে।

বারওয়েল সায়েব একবার আমার গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণটি মজার। একটা হাসির গল্পের বই বাড়িতে পড়ছিলাম—একজন অসৎ ব্যবসায়ী সস্তায় ঘোড়া কিনে রঙ লাগিয়ে জেব্রা তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করছেন। সেই রাত্রেই আমি স্বপ্ন দেখলাম, হাওড়ার এক আস্তাবলে অসংখ্য ঘোড়াকে স্প্রেয়িং মেশিনের রঙ ছিটিয়ে জেব্রা করা হচ্ছে, কারণ জেব্রার বাজার দর বেজায়। তারপর স্বপ্ন দেখছি, পুরসভার ভেজাল জিপার্টমেন্টের ইনসপেক্টররা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের আস্তাবল-কাম-কারখানা ঘিরে ফেলেছে।

স্পেনসেস হোটেলে এসে সায়েবকে ব্যাপারটা বলায় সায়েব খুব মজা পেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'সিরিয়াস ব্যাপার, আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায় এই ভেজাল জেব্রা বিক্রি হয়েছে কিনা তা এখনই সরেজমিনে তদন্ত করা প্রয়োজন।"

শুধু জেব্রা দেখে কেউ আলিপুর থেকে ফেরে না। প্রবল উৎসাহে বারওয়েল সায়েব জিরাফের খোঁজখবরও করলেন। বললেন, বিলেতে বারওয়েল পরিবারের প্রিয় জন্তু এই জিরাফ। তোমারও জানা দরকার এই জিরাফ নিয়ে পাঁচশ বছর আগে চিন ও বাংলার মধ্যেও বেশ মনোমালিন্য হয়েছিল। ব্যাপারটা 'স্ক্যান্ডাল' পর্যায়ে চলে গিয়েছিল!

চিড়িয়াখানায় জিরাফের সামনে দাঁড়িয়ে সায়েব সেদিন চিনের কথা তুলে বললেন, "সভ্যতা-ভব্যতায় চিনের মানুষরা যে পশ্চিমীদের থেকে শত যোজন এগিয়ে ছিলেন এ-বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। ইউরোপীয়রাও সাগর অভিযানে বেরিয়েছিল। চিনারাও বেরিয়েছিল। কিন্তু স্প্যানিশ পর্তুগিজ বোম্বেটেরা যেখানে গিয়েছে সেখানে কী সর্বনাশ করেছে তা ভাবলে লজ্জার শেষ থাকে না। নির্লজ্জ এই লুণ্ঠনে শেষপর্যন্ত ইংরেজ এবং ফরাসিরাও যোগ দিয়েছে, তবে একটু ভদ্রভাবে।"

আবার চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন সায়েব। "ইউরোপীয়দের রাজ্য জয় এবং চিনাদের রাজ্য জয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত! যে-দেশ চিন সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করলো সে-দেশের রাজা সম্রাটের দূতের কাছ থেকে লক্ষ-লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং বহু মূল্যবান জিনিস উপঢৌকন পেলো, কারণ চিনা সম্রাট পরাভূত রাজাদের কাছ থেকে কিছু নেবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তো দেবেন, এই তো মানবতার আদি নীতি।"

"আর ইউরোপীয়দের নির্লজ্জ কীর্তিকাহিনি এখন বিশ্বের কে না জানে? নির্মম লুণ্ঠন ও শোষণে তারা এক-একটি দেশকে নিঃস্ব করে ছেড়েছে। পর্তুগিজরা তো শুধু সম্পদ নেয়নি, নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে বন্দী করে অন্যত্র ক্রীতদাস হিসেব বেচে দিয়েছে।"

সায়েব আবার চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন। "চিনের সম্রাটরা অবশ্য চিরকালই একটু অহংকারী ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, অন্য সব দেশ যা আমার সেনাপতিরা জয় করেছেন তাদের কী এমন থাকতে পারে যা আমাদের গ্রহণের যোগ্য?"

সায়েব এবার হাসলেন। "আমি যখন পড়লাম বাঙালিরা এই পরিস্থিতিতেও চিন-সম্রাটের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল তখন একজন 'বাঙালি' হিসেবে আমারও খুব আনন্দ হলো।"

"আমাদের মনে রাখতে হবে জিরাফ একটি পিকিউলিয়র জীব। আফ্রিকার অরণ্যে সারাজীবন সাধ্যসাধনা করলেও জিরাফের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না। জিরাফ নিশ্চয় কোনো চিনা দার্শনিকের ইনফ্লুয়েন্সে পড়ে

গিয়েছিল—শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রবল রেখেও সে মৌনী হবার ব্রত নিয়েছে কত যুগ আগে।"

জিরাফের উচ্চতা নিয়েও কথা উঠল। সায়েব বললেন, "আমার ছোট ভাই স্ট্যানলি একদিন সকালে উঠে মাকে বললো সে গতরাত্রে স্বপ্ন দেখেছে একটি জিরাফ তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মা খুব স্নেহময়ী ছিলেন, তিনি সরলমনে বিশ্বাস করতে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম 'কিছুতেই জিরাফ নয়।' মা বললেন, 'স্বপ্ন দেখলো স্ট্যানলি, আর তুমি না বলবার কে, নোয়েল?' আমি বললাম, 'জিরাফের উচ্চতা অন্তত আঠারো ফুট, আর আমাদের ঘরটা মাত্র চোদ্দো ফুট. জিরাফ কী করে স্ট্যানলির ঘরে ঢুকবে মা?' স্ট্যানলি ততক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে। তখন মা বললেন, 'স্ট্যানলি ঠিকই বলছে—হয়তো বেবি জিরাফ দেখেছে সে ঘরের মধ্যে। কিংবা সে মাথা নিচু করেই ঘরে ঢুকেছে'।"

সায়েব বললেন, "সেই ছোটবেলা থেকেই বারওয়েল পরিবারে আমরা জিরাফের ওপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। ঈশ্বর এমন অদ্ভুত জীব বেশি গড়েননি। জিরাফের ধড়ের আকার প্রমাণ-সাইজের, ঘোড়া থেকে লম্বা নয়, কিন্তু ওই রণপা এবং লম্বা গলা-ই ব্যাপারটা অন্যরকম করে দিয়েছে। স্ট্যানলি তো মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, জিরাফের মা যদি বাচ্চার জন্যে মাফলার বোনে তাহলে সেটা কত বড় হবে?"

সায়েবের মা বলেছিলেন, "তুমি অযথা চিন্তা কোরো না। জিরাফের ঠাণ্ডা লাগবার উপায় নেই। জিরাফের দেশ আফ্রিকায়. সেখানে ভীষণ গরম, মাফলার জড়িয়ে দিলেও বাচ্চা জিরাফ তা গলায় রাখবে না।"

সায়েব বললেন, "জিরাফ সম্বন্ধে একটা স্ক্যান্ডাল সেই আদ্যিকাল থেকে চালু রয়েছে—বাঙালি হিসেবে তোমার জানা দরকার, এখন থেকে পাঁচশো বছর আগে বাঙালিরা জিরাফ দিয়ে কেল্লা ফতে করতে চেয়েছিলে।"

আমি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সায়েব বললেন, "পৃথিবীতে জিরাফ বলে কিছু ছিল না, থাকতও না। কিন্তু একবার এক ক্যামেলের (তোমরা যাকে বলো উট) সঙ্গে গভীর বনে এক

লেপার্ড (অর্থাৎ চিতাবাঘের) দেখা হলো। নির্জন বন, শ্রীমতী ক্যামেলেনীর সঙ্গে মিস্টার চিতাবাঘের প্রণয় হলো এবং সেই মিলন থেকে জন্ম হলো জিরাফের। বিশ্বাস না হয়, সায়েন্সের বই খুলে দেখো। জিরাফের বৈজ্ঞানিক নাম : ক্যামেলোপার্ডালিন—অর্থাৎ ক্যামেল এবং লেপার্ড এক দেহে হলো লীন!"

আমিও সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাংলা নাম ঠিক করে নিলাম—উট+চিতা=উচিতা।

শব্দটা শুনে সায়েব বললেন, "কে জানে, ৫০০ বছর আগে বাঙালিরা যে জিরাফ নিয়ে স্পেশাল খেলা দেখিয়েছিল তার নাম হয়তো 'উচিতা'ই ছিল।"

জিরাফের গবেষণায় যেসব খবর অনেকদিন ধরে সায়েব সংগ্রহ করেছেন তা এবার তিনি আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

"জিরাফ শুয়েও ঘুমোয়, দাঁড়িয়েও ঘুমোয়।"

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, "দাঁড়িয়ে ঘুমোতে গিয়ে পড়ে যায় না?"

"খুব ইম্পর্টান্ট কথা জিজ্ঞেস করেছো। জিরাফ সাধারণত একটা লম্বা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমোয়। ঘুমন্ত জিরাফের ফটো তুলবার জন্যে অনেকের খুব আগ্রহ। ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ফটোগ্রাফার ঘুরছে।"

"জিরাফের পরমায়ু?"

এবার সায়েব একটু বিপদে পড়লেন। "দাঁড়াও, দাঁড়াও মানুষের তুলনায় জীব-জন্তুদের পরমায়ু কীরকম তার এক স্পেশাল তালিকা এক সময় বহু চেষ্টায় মুখস্থ করেছিলাম! ইঁদুরের লাইফ ৩ বছর, বাদুড়ের ১৫, খরগোশের ১২, ভেড়ার ১৫, ব্যাং-এর ১২, মাকড়সার ২০।" সায়েব হুড়হুড় করে বলতে লাগলেন।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও", সায়েব নামতাব মতো মুখস্থ বলতে লাগলেন, "কুকুরের ২৪, বেড়ালের ২৭, গোরুর ৩০, সাপ এবং গিরগিটির ৩০, পায়রার ৩৫ এবং সিংহের ৩৫।"

সায়েব এখনও জিরাফের পরমায়ু স্মরণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। "শিম্পাঞ্জির ৩৯, হিপোপটেমাসের ৫৪, রুই মাছের ৫০, চিংড়ির ৫০,

কুমিরের ৬০, হাতির ৭৭, কাকাতুয়ার ৮৫!"

"শতায়ুর লিস্টে রয়েছে কেবল মানুষ, শকুন ১১৭ এবং কচ্ছপ ১৫০", সায়েবের সংযোজন।

আমি বললাম, "আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে ভূষণ্ডির কাক— দীর্ঘজীবীদের মধ্যে সিনিয়রমোস্ট!"

"কিন্তু সায়েন্স তা বলছে না", সায়েব দুঃখের সঙ্গেই প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু আমাদের ধর্মপুস্তককে অসম্মান করার জন্যেই বোধহয় জিরাফের পরমায়ু তিনি স্মরণ করতে পারলেন না।

সায়েব বললেন, "পৃথিবীতে যারা সারাক্ষণ মাথা উঁচু রেখে চলতে চায় তাদের কত অসুবিধে তা জিরাফকে দেখলেই বোঝা যায়!"

এবার মাঠের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে আমাদের পিকনিক লাঞ্চ শুরু হলো। চিকেন স্যান্ডুইচ চিবোতে-চিবোতে সায়েব বললেন, "ধন্য বাঙালিরা! জিরাফের চালটা তারা যেভাবে দিয়েছিল ৫০০ বছর আগে!"

সায়েব এবার শুরু করলেন, "তুমি চেংহোর নাম শুনেছো?"

"শুনিনি।"

"এই পৃথিবীতে সবাই কলম্বাস, ড্রেক, ভেসপুচি এবং ভাস্কোডাগামার কথা আলোচনা করে। কিন্তু চিনের বিশ্ববিজয়ী খোজা অ্যাডমিরাল চেংহোর নাম তারা শোনেনি।" সায়েব দুঃখ করলেন।

"জেনে রেখো, শৌর্য, বীর্য, সাফল্যে তিনি কোনো ইউরোপিয়ান বা অ্যামেরিকান অ্যাডমিরাল থেকে কম ছিলেন না। বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে চিন থেকে বেরিয়ে তিনি সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছিলেন কলম্বাসের অনেক আগে। ইচ্ছে করলে তিনি সমগ্র বিশ্ব বিজয় করতেও পারতেন। কিন্তু, যা তোমায় বলেছি চিনা সম্রাটদের বিশ্ববিজয় মানে লুঠ এবং শোষণ নয়, বরং সাম্রাজ্য বিজয় করে পরাজিত এবং পদানতকে যথাসম্ভব দান করা। এইভাবে দান করতে-করতে এবং একের-পর-এক দেশে বিজয়বাহিনী প্রেরণ করতে-করতে চিনা রাজকোষের এমন অবস্থা হলো যে, এক সময়ে চিনের অর্থমন্ত্রীদের বিশ্ববিজয়ে ঘেন্না ধরে গেলো! রাজকোষের বেহাল অবস্থা সামাল দিতে গিয়ে একজন সম্রাট শেষ পর্যন্ত

আইন পাস করলেন, তখন থেকে কোনো চিনা সাগরপারে পাড়ি দেবে না। সাগরপারে পাড়ি দেওয়া যেতে পারে এমন নৌকা যে-চিনা তৈরি করবে তার তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড হবে!"

চেংহোর কাহিনি! মানব ইতিহাসের সে এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায়। ডানিয়েল বুরটিচের বই পড়ে যথাসময়ে আরও কিছু জানতে পেরেছি এবং বিস্মিত হয়েছি।

অস্পষ্ট অতীতের স্মৃতি থেকে যা স্মরণ করতে পারছি, চেংহোর সুদূর প্রাচ্য এবং এশিয়া বিজয় সম্পর্কে সায়েব তেমন কিছু বলেননি, কেবল শুনিয়েছিলেন বাংলাদেশেও তাঁর যুদ্ধজাহাজ এসেছিল এবং বাঙালিরা মহাপরাক্রমশালী চিন-সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব সবিনয়ে স্বীকার করে সেখান থেকে প্রচুর উপঢৌকন ম্যানেজ করেছিল।

এরপরেই চিনের মহাপরাক্রমশালী মহীপালকে অভিভূত করার পালা। স্বর্ণ, বস্ত্র, মণিমাণিক্য—এসব চিনা সম্রাটের রত্নভাণ্ডারে যথেষ্টই আছে। চিনের সম্রাজ্ঞীরা এমন বিনয়ী ছিলেন এবং নিজেদের বৈভব দেখানোর ব্যাপারে তাঁদের এতই লজ্জা ছিল যে মহামূল্যবান ব্রোকেড পরেও তার ওপর সবিনয়ে তাঁরা একটি অতি সাধারণ বস্ত্রখণ্ড জড়িয়ে নিতেন। প্রাচিন চিনা গ্রন্থে এই বিনীত মনোবৃত্তির বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

সায়েব বললেন, "সম্রাট দয়ালু বটে, কিন্তু তাঁর ঔদ্ধত্যও ভীষণ। পদানত পরাভূত সামন্ত রাজারা যে-উপহারই পাঠান তা দেখে তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এই পৃথিবীর নন্দনকানন চিন, অন্য হতভাগ্য দেশ সেখানে কী পাঠাতে পারে?"

নাম কেনার জন্যে এবং সম্রাটকে তাজ্জব বানাবার প্রচেষ্টায় বুদ্ধিমান বাঙালিরা শেষে এক অভিনব উপায় বের করলো।

১৪১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিন-সম্রাটের রাজধানীতে প্রবল উত্তেজনা শুরু হয়ে গেলো—সম্রাটকে বাঙালিরা এমন এক উপহার পাঠাচ্ছে সেটা যা বিশ্বের বিস্ময়! চিনের হাজার-হাজার বছরের ইতিহাসে এমন বিচিত্র উপহারের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

রাজধানীতে গুজব রটে গেলো, যেমন সম্রাট তাঁকে তেমন অত্যাশ্চর্য

উপহার পাঠাতে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাঙালিরাই পারে! যে-সম্রাট কারও কাছ থেকেই গ্রহণ করবার যোগ্য কিছু খুঁজে পান না তিনিও এবার উপহার পেয়ে আনন্দিত হবেন। ধন্য চেংহো, ধন্য বঙ্গভূমি!

অবশেষে সেই শুভদিন এল। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতো দিন—১৪১৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর।

সেদিন মহাপরাক্রমশালী চিন-সম্রাটের বিত্তময়ী নগরীতে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করলো। দূর সমুদ্র পথে চেংহোর রণতরীতে বিস্ময়কর এক জীব বন্দরে উপস্থিত হয়েছে। রাজধানীর বিস্মিত চিনা নাগরিকরা বিপুল ঔৎসুক্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলে-দলে চলেছেন সেই উদ্যানে যেখানে কিংবদন্তির বিচিত্র জীব চি-লিনকে স্বচক্ষে দেখা যাবে। একমাত্র সুদূর অতীতে ঋষিরাই তপস্যাবলে এই আশ্চর্য জীবকে অবলোকন করেছেন। চি-লিন অথবা 'নিরামিষাশী বাঘ'।

সমস্ত মহানগরীতে সেদিন উৎসবের সাজ—চি-লিন আসছেন। বঙ্গভূমির বাঙালিরা অবশেষে স্মরণীয় এক কীর্তি রাখলেন, এমন এক উপহার পাঠালেন যা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর চিন সম্রাটের কৌতূহল জাগাতে সমর্থ হয়েছে!

এরপর সম্রাটের মন্ত্রিসভা বিশেষ এক অধিবেশনে চি-লিন সম্বন্ধে দীর্ঘ গোপন আলোচনা করলেন। সম্রাটের সভাকবিরা আনন্দে পুলকিত হয়ে দীর্ঘ গাথা রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। লেখনী ধারণ করলেন। স্তাবকরা সঙ্গীত ও বাদ্যসহকারে শুরু করলেন সম্রাটের জয়গাথা। ধন্য এই দেশ, ধন্য এই দেশের নদনদী পর্বতমালা। ধন্য এদেশের প্রজাবৃন্দ। এর আগে অন্য কোনো সম্রাটই নিজের প্রতিভা ও শক্তিবলে এমন মহাকীর্তি স্থাপন করতে পারেননি যার ফলে স্বর্গীয় সুষমায় ভরা এই দেশে চী-লিনের পাদস্পর্শ ঘটেও সে-দেশে জনগণের প্রত্যাশার আর কী থাকতে পারে?

স্বর্গীয় এই জীবের বর্ণনায় যেসব উত্তেজনাপূর্ণ গাথা রচিত হলো তাও কম বিস্ময়কর নয়। কী বিস্ময়কর এই চি-লিন! স্বর্গীয় এই ব্যাঘ্রের দেহটি হরিণের মতন কিন্তু ল্যাজটি ষাঁড়ের ল্যাজের মতন। মহাপরাক্রমশালী এই

জীব, কিন্তু সজ্ঞানে কারও ক্ষতি করে না, কোনো প্রাণীভক্ষণেও তার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। সামান্য ঘাসপাতা খেয়েই বিশ্বের বিস্ময় এই চি-লিন সন্তুষ্ট।

চিনা সম্রাটের অনুরক্ত সাধারণ নাগরিকরাও আজ ধন্য। অবশেষে এই রাজ্যে স্বর্ণযুগের আগমন হলো। বিরাট বৈভব এর আগেই এখানে এসেছে, মহাপরাক্রমে ধরণীকে শাসন করেছেন নরপতিরা, কিন্তু কোনো মহাবীরই তো এতোদিন চী-লিনের পাদস্পর্শে এই রাজ্যকে পবিত্র করে তুলতে পারেননি।

সুগম্ভীর সম্রাট নতমস্তকে সমস্ত প্রশস্তি শ্রবণ করলেন। স্তাবকরা তখন ইঙ্গিত করছেন, শুধু মানবিক শক্তিতে এই মহত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের মধ্যে দেবতাকেও যেন দেখতে পাচ্ছি আমরা। না-হলে অবশেষে চী-লিনের আবির্ভাব হবে কেন?

শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে সম্রাট যথাসময়ে রাজকীয় উদ্যানে উপস্থিত হলেন এবং ভেজিটারিয়ান টাইগার চি-লিনকে দেখলেন। নাগরিকদলও তখন সেখানে উপস্থিত এবং সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত। অবশেষে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে সম্রাটের জয়ধ্বনি উঠলো—স্মরণীয় এই মুহূর্তের ইতিহাস যুগযুগান্তর ধরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, স্বয়ং সম্রাটের জন্যে চি-লিন এসেছেন রহস্যময় বঙ্গভূমি থেকে।

"তারপর?" আমি এবার সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সায়েব বললেন, "বাঙালিরা একটি জিরাফ পাঠিয়েই বাজিমাত করছেন এটা বোঝা গেলো।

"সম্রাট এরপর আজব জন্তুটিকে দেখে বিস্মিত হলেও রাজকীয় সৌজন্যে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, বাংলাদেশের কোথায় এই চি-লিনকে পাওয়া গেলো এবং কোন্ গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চি-লিনকে বাঙালিরা নিজেদের কাছে না রেখে চিন-সম্রাটের কাছে পাঠালো?"

সায়েব এবার একটু হাসলেন। "এরপরেই গোলমাল হয়ে গেলো

একটু। বঙ্গভূমির দূত, যিনি জিরাফের সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি মিথ্যাবচনে তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না। সহজেই তাঁর মুখ দিয়ে গোপন কথাটি বেরিয়ে পড়লো যা শ্রবণ করে মহান সম্রাটের মুখ মুহূর্তে মেঘগম্ভীর হয়ে উঠলো। বঙ্গভূমি সম্পর্কে তাঁর সমস্ত বিস্ময় মুহূর্তে নষ্ট হতে চলেছে। সম্রাট শ্রবণ করেছেন, জিরাফের জন্ম বাংলায় নয়। অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি করে চতুর বাঙালিরা এই সেকেন্ড-হ্যান্ড চি-লিনকে সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছে।

"না। সম্রাটের কীর্তিসূর্য তাহলে তো এখনও মধ্যগগনে উপনীত হয়নি। সম্রাট ভেবেছিলেন, চী-লিনের আদিভূমিকেই তিনি পদানত করেছেন এবং সেই পদানত দেশের জনগণই নতমস্তকে চি-লিনকে পাঠিয়েছে তাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ।"

"তারপর?" আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি।

সায়েব মৃদু হাসলেন। "চিন-সম্রাটদের রাজকীয় মেজাজের কথা বিশ্ববিদিত, বুঝতেই পারছো। জিরাফটিকে বাঙালিরা অন্য দেশ থেকে জোগাড় করেছে শুনে সম্রাটের আনন্দ সম্পূর্ণ স্তিমিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হলো রাজধানীর আনন্দোৎসব। আদেশ হলো বাদ্যগীত এখনই বন্ধ করো। সম্রাট এবার ডেকে পাঠালেন নৌসেনাপতি খোজা চেংহোকে। আদেশ দিলেন, তুমি আমার কীর্তিকে সমস্ত বিশ্বে আশানুরূপভাবে স্থাপিত করার ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্গভূমিতে চি-লিনের উৎপত্তি নয়, তার জন্ম সুদূর আফ্রিকা মহাদেশে, মানিস্কি নামক রাজ্যে।

"সম্রাটের নির্দেশ মানিস্কি রাজ্যকে পদানত করে তাঁর জন্য আর একটি চি-লিনকে এক বৎসরের মধ্যে এই রাজধানীতে আনতে হবে, রাজসিংহাসনের সম্মান তবেই অক্ষত থাকবে।"

এবার সায়েব হাসতে লাগলেন। আমি চিন্তিত হয়ে জানতে চাইলাম, "বাংলাদেশের প্রতিনিধির মুণ্ডচ্ছেদ হলো না তো?"

সায়েব বললেন, "যতদূর জানি তিনি প্রাণে বাঁচলেন, তবে বাংলার ভাবমূর্তি কিছুটা নষ্ট হলো—চি-লিন সেখানে জন্মায় না বলে।"

তারপর চেং হো কী করেছিলেন জানবার জন্যেও আমি তখন বেশ

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি।

সায়েব পিকনিকের খাওয়া শেষ করে, কাগজের ন্যাপকিনে মুখ মুছতে-মুছতে বললেন, "তুমি যদি চাও আর্থার ওয়ালিকে এই ব্যাপারে আমি বিলেতে চিঠি লিখবো। তবে এইটুকু জেনে রাখো, খোজা চেংহো সম্রাটের মুখ রক্ষা করেছিলেন। আফ্রিকার মানিস্কি রাজ্যকে সম্রাটের পদানত করে মহাবীর চেংহো পরের বছরেই আর একটি জ্যান্ত জিরাফকে চিনের রাজধানীতে এনে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন।"

এবার আমরা দু'জনেই চিড়িয়াখানার জিরাফকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলাম। মহাপরাক্রমশালী চিন-সম্রাটকে শত-শত বৎসর আগে এমনভাবে বিস্মিত করার মতো কী আকর্ষণ আছে এই জন্তুটির তা আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

সায়েব হাসতে-হাসতে বললেন, "মনে নেই তোমার? চৈনিক ঋষিরা কী বলে গিয়েছেন? জ্ঞানই মানুষের শত্রু। যে যত কম জানে সে তত সুখী! এ-যুগের মানুষ বইপত্রের মাধ্যমে সব বিষয়েই বড্ড বেশি জানে, তাই তারা সহজে বিস্মিত হতে চায় না। চলো, আমরা এবার বাড়ি যাই, ভেজিটারিয়ান বাঘ এখানেই পড়ে থাক।" এই বলে আমার হাতটা ধরে সায়েব আলিপুর চিড়িয়াখানার পূর্বদিকের গেটের সন্ধানে মনের আনন্দে হাঁটতে লাগলেন।

চিনেব দুঃখে কলকাতাব আফিম

রবীন্দ্রনাথ চিনের মাটিতে যে চিন ও ভারতবর্ষের কথা বলেছিলেন সে তো শত শত বছর আগেকার কথা। যে চিনের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ও কলকাতার নিত্যসম্পর্ক ছিল তা কবির স্মরণে থাকলেও একবারও তার উল্লেখ করেননি। আমরা উনিশ শতকের চিনের সঙ্গে কলকাতার অহিফেন বিজনেসের কথা বলছি।

আফিমখোর চিনকে আরও আফিম খাওয়ানোর জন্য কলকাতা ও বোম্বের ইংরেজ এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন প্রবল উৎসাহ। এই উৎসাহের সঙ্গে কলকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে জড়িত এবং তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দাদামশাই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। আফিম সংগ্রহ করে চিনে পাঠানো ছাড়াও, প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের একই পণ্য নিজের জাহাজে চিনের বন্দরে পাঠানোয় তাঁর ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

এই ব্যবসায় দ্বারকানাথের নিজস্ব সমুদ্রগামী জাহাজগুলি যে বড় ভূমিকা নিয়েছিল তার ইতিহাস পুরানো কলকাতার প্রাচীন সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় পেয়ে যাবেন। সেকালের ইংরাজি সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হত আফিম নিলামের বিস্তারিত বিবরণ। আফিং বিক্রি করে ভারতবর্ষ যে রেকর্ড করেছে তারও সর্বত্র বিবরণ ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন ১৮৫৯ সালের ১৫ মার্চ জানানো হচ্ছে, এ বছর ভারতে সরকার আফিং বিক্রি করে তিন কোটি সাতষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশ তিন টাকা চার পাই আয় করেছে। কলকাতা-ক্যান্টনের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ইদানীং এক আধ জন ভারতীয় কথাসাহিত্যিকের নজর কেড়েছে, তাঁরা খোঁজ করছেন সেই সব স্থানীয় চরিত্রের যাঁরা নিঃশব্দে এই বাণিজ্যকে সফল করবার জন্য সাগরযাত্রায় প্রবল উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

উনিশশতকে কলকাতার সঙ্গে চিনের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান এবং সেই সূত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্মরণীয় ভূমিকা সম্পর্কে বেশ খানিকটা আলোচনা করেছেন আমেরিকান গবেষক ব্লেয়ার ক্লিং তাঁর বিখ্যাত বই পার্টনার ইন এঙ্গায়ার বইতে।

এই বইতে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা অনেকটা এইরকম। ১৮৩৭ সালে কলকাতায় চিনার সংখ্যা: পুরুষ ২৪৩, নারী ১১৯। ১৮১৭-১৮৪০ কলকাতা থেকে কাঁচামাল আমদানি আড়াই কোটি টাকা, রপ্তানি তাঁর ডবল—পাঁচকোটি টাকা। বাণিজ্যে ইংলন্ডের পরবর্তী স্থান চিনের—এঁদের প্রধান আমদানি অবশ্যই আফিম। এই আফিম কেনা হতো কলকাতার সরকারি নীলাম থেকে।

এই কাজে দ্বারকানাথের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন ডোনাল্ড ম্যাকলাউড গর্ডন—এঁকে ১৮৪০ সালে দ্বারকানাথ তাঁর কার টেগোর কোম্পানির পার্টনার করে নেন। চিনা বাণিজ্যে ঠাকুর পরিবারের ভূমিকা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকলে জেনে রাখুন, এগারোটি চিনাগামী জাহাজে তাঁর মালিকানা অথবা কর্তৃত্ব ছিল। ওয়াটারউইচ জাহাজটি (৩৬৩ টন) এই খিদিরপুরে তৈরি হয়েছিল ১৮৩১ সালে। এই জাহাজের অর্ধেক তাঁর, বাকিটার মালিকানা উইলিয়াম স্টর্ম এবং জাহাজের কমান্ডার অ্যানড্রু হোল্ডারম্যানের। প্রায় একই সময় কলকাতার পার্সি বিজনেসম্যান রুস্তমজী কাওয়ানজী হাওয়ায় দুখানি ক্লিপার জাহাজ তৈরি করান। ১৮৩০ সালে আফিম রপ্তানি চড়াং করে তিনগুণ বেড়ে যায়, এবং এই উন্নত ক্লিপারগুলি দ্রুতগতিতে এমনসময়ে চিনে পৌঁছতে পারতো যখন চিনাবাজারে আফিমের দাম তুঙ্গে। দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে জাহাজের গতি নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ১৮৩৮ সালে দ্বারকানাথের ক্লিপার ওয়াটারউইচ ২৫ দিনে কলকাতা থেকে ক্যান্টনে পৌঁছে রেকর্ড ভঙ্গ করলো।

দূরদর্শী দ্বারকানাথ ১৮০৩ সালে আকায়ান থেকে মাভি বলে এবং ১৮৩৭ সালে খিদিরপুর থেকে আরিয়েল বলে জাহাজ তৈরি করালেন। শেষের জাহাজটি নিষিদ্ধ আফিম সহ চিনের হাতে ধরা পড়ে।

নভেম্বর ১৮৩৯—ওপিয়াম যুদ্ধের সময় দ্বারকানাথের ভাগ্য তুঙ্গে। মার্চ ১৮৪২ ক্যাপ্টেন জনস্টনের হিসেব অনুযায়ী গুনগামী জাহাজের সংখ্যা এক ডজন, এদের মোট হর্সপাওয়ার ২,০৫০ এবং এদের সফল রাখতে বছরে ১৩ লাখ টন কয়লা দরকার। বলা বাহুল্য এই সময় দ্বারকানাথই এদেশের বৃহত্তম কোলিয়ারি মালিক।

রবীন্দ্রনাথ যে এই পারিবারিক ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আদৌ অবহিত ছিলেন না তা ভাবতে মন চায় না। তবে একথাও মনে রাখতে হবে, বিদেশে পিতামহের দেহাবসানের পর রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। শোনা যায়, পিতামহের ব্যবসা সম্পর্কীয় বহু চিঠি ও কাগজপত্র তিনি নিজেই একসময় আগুনে সঁপে দিয়েছিলেন। তাই এক মহা তাৎপর্যপূর্ণ বাংলা-চিন ব্যবসায়িক সম্পর্কের দৈনন্দিন বর্ণনা আমরা বোধহয় চিরদিনের মতন হারিয়ে ফেলেছি। থাকার মধ্যে রয়েছে কেবল নগর কলকাতার কয়েকটি স্থান নাম, যেমন বড়বাজারের আফিম চৌরাস্তা এবং আফিম ব্যবসা ও পরিবহনের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন বৃহৎ ব্যবসায়ীর নামাঙ্কিত কয়েকটি রাস্তা।

স্বভূমিতে চিনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্পর্কে তো কিছু বলা গেল, কিন্তু খোদ কলকাতায় চিনা উপস্থিতির ইতিহাস প্রক্ষিপ্ত হলেও কম আকর্ষক নয়। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ১৭৯৮ সালের সেনসাস রিপোর্ট আমাদের হাতের বাইরে নয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতা শহরের দশটি বাড়ির মালিকানা চিনাদের হাতে। তখন কলকাতায় মোট বাড়ির সংখ্যা ৭৮,৭৬০, তার মধ্যে সায়েববাড়ি ৪৩০০, হিন্দুবাড়ি ৫৬, ৪৬০ এবং মুসলমানদের বাড়ি ১৪৭০০।

কিন্তু এরও অনেক আগে পলাশির যুদ্ধের অর্ধশতাব্দি আগে (১৭০৯) একজন খ্রিস্টান যাজক এক অতীব ধর্মপ্রাণা চিনা ক্রিশ্চান মহিলার উল্লেখ করছেন, ইনি 'গোলিকাতা'র বাসিন্দা! এই ক্যাথলিক যাজক ভক্ত ও ভক্তিমতিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যতদিন তিনি 'বেঙ্গলা'-তে পদার্পণ করেছেন ততদিন থাকা-খাওয়ার জন্য তাঁকে একটি 'আধলা' খরচ করতে

হয়নি। এই যাজকের নাম ফাদার মাতিও রিপা।

কলকাতায় পরবর্তী চিনা উল্লেখ ১৭৮০ নাগাদ। নায়ক মিস্টার ইয়ং অ্যাচিউ, ইনি কলকাতার ১৫ মাইল দক্ষিণে এই বসতির পত্তন করেন। তারপরের বিখ্যাত নাম মিস্টার টম্ ফ্যাট—ইনি ৪ঠা মার্চ ১৭৮৪ কলকাতার কাগজে একটি অবিস্মরণীয় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞাপনদাতার বক্তব্য কলকাতায় যাঁদের পুকুর আছে এবং সেই পুকুর যাঁরা পরিষ্কার করতে চান তাঁরা খুব ন্যায্য দামে কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। চাইনিজ পাম্পের সাহায্যে বাংলার যে কোনো প্রতিযোগীর থেকে দ্রুত এই কাজ করা হবে। কলকাতার ওপারে সালকেতে 'রাম' ওয়ার্কসে মিস্টার ফ্যাটের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইনি ইউরোপীয় মানের 'লোফসুগার' ও চমৎকার সুগার ক্যান্ডিও তৈরি করেন। এছাড়াও পেতে পারেন আকর্ষণীয় চাইনিজ কাঠের ক্যাবিনেট।

মিস্টার টম ফ্যাটের আর একটি বিজ্ঞাপন কাগজে বেরোয় একই বছরের জুন মাসে। দেখা যাচ্ছে, তাঁর সালকের মদের (রাম) কারখানা বিক্রির চেষ্টা চলেছে।

১৭৯৮ সালের পর কলকাতায় চিনাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাবার কারণটি জেনে রাখা ভাল। তখন ছেলেধরারা চিনা বালকদের কিডন্যাপ করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাহাজের কাজে লাগিয়ে দিতো। বিদেশগামী এইসব জাহাজের প্রথম গন্তব্যস্থল কলকাতা বন্দর। ফলে প্রথম সুযোগেই হতভাগ্যদের কেউ কেউ জাহাজ থেকে পালাতো। যারা কলকাতায় নামতে পারতো না তারা ইংলন্ডের লিভারপুলে জাহাজ থেকে পালাতো।

১৮২১ সালের এক আন্দাজে কলকাতায় চিনার সংখ্যা ৪১৪। কিন্তু ১৬ বছর পরে ১৮৩৭ সালে কলকাতার পুলিস সুপার ক্যাপটেন বার্কের হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা ৩৬২। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় কলকাতায় চিনার সংখ্যা ৫০০০। এই সংখ্যাটি তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ পরবর্তী সময়ে আমরা দেখছি

ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় শহরের মধ্যে কলকাতানিবাসী চিনার সংখ্যা বৃহত্তম—২০০০০। এই সংখ্যা পরবর্তী সময়ে অবশ্যই পড়তির দিকে, কলকাতার চিনারা এখন ভাগ্যসন্ধানে ভারতের অন্যান্য শহরে চলে যাচ্ছেন, তরুণ চিনাদের অনেকের নজর কানাডার দিকে। কিন্তু একসময় জুতা, ট্যানারি, ডাইংক্লিনিং, কারপেন্টারি এবং রেস্তোরাঁর মাধ্যমে পরিশ্রমী ও সৎ চিনারা হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ভুললে চলবে না দূরদর্শী চিনারই কলকাতায় রিকশার পত্তন করেছিলেন। আর ছিল গ্রামেগঞ্জে চিনা জাদুকর ও ফেরিওয়ালা—একটা আধটা অবিস্মরণীয় গল্প এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই জীবন ও জীবিকা (নীল আকাশের নিচে) আজও প্রবীন জনমানসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের চিনাবাড়ির জুতো একসময়ে খ্যাতির শিখরে আরোহন করেছিল—সেরা জুতোর শিল্পী হিসেবে এঁদের নাম আমরা ১৮২৯ থেকে শুনতে পাচ্ছি।

বাঙালি মানসে চিনাদের স্থান চিরকালই যে বেশ উঁচুতে তার প্রমাণ কলকাতায় সেই বহুল প্রচারিত উক্তিটি : 'হুজুগে বাঙালি, হিকমতে চিনা'। তুলনামূলক এই উক্তিতে ভদ্র বাঙালিরা কখনও আপত্তি করেনি। খাওয়ার ব্যাপারে একদা বিশেষ রক্ষণশীল বাঙালির বহির্বিশ্বের খানাপিনায় প্রথম দুঃসাহসী পদক্ষেপ চিনা ভোজনালয়ের মাধ্যমে—ফ্রায়েড রাইস, চাউমিনে এবং সুইট সাওয়ার চিকেনের মাধ্যমে বাঙালির রসনা প্রথম বিশ্বপথিক হবার দুঃসাহস অর্জন করে বলাটা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। তবে চিনা জীবনযাত্রার সবটাই নির্ভেজাল প্রশংসার দিক নয়। চিনাপাড়ায় শহরের নেশাখোর নাগরিকদের যথেচ্ছ গমন এবং চিনাগুণ্ডাদের বেআইনী কাজকর্মের কথা আমাদের সাহিত্যেও রসদ জুগিয়েছে একসময়।

বাজির শব্দদূষণ সম্পর্কে ইদানীং আমরা আইন আদালতে ও পুলিস সূত্র থেকে অনেক কিছু সাবধানবাণী শুনি। কিন্তু ১৮৩২ সালে কলকাতার 'জন বুল' পত্রিকায় আদালতের এক রিপোর্ট আছে। ম্যাজিসট্রেট রবিনসন কাশিটোলায় (বেন্টিংক স্ট্রিটে) আঁচু নামে

দোকানদারের বিরুদ্ধে সকালে প্রচুর শব্দবাজি ফোটাবার অভিযোগ করেন আর এক ম্যাজিসট্রেট ব্ল্যাকোয়ার কাছে। এই আওয়াজ শুনে ম্যাজিসট্রেটের ঘোড়া নাকি ভীষণ ভয় পেয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। পুলিস কনস্টেবল পেরি তাঁর রিপোর্টে বলেন, যখন তিনি আঁচুকে ধরতে যান তখন দেখেন জুতোর দোকানের মেঝেতে প্রচুর ব্যবহৃত বাজির খোল। অভিযুক্ত আঁচুও ছাড়বার পাত্র নন, তাঁর বক্তব্য তিনি এই দোকানের মালিক নন এবং সকালে এখানে কোনো বাজি ফোটানো হয়নি। চিনা নববর্ষ উপলক্ষে সেই সময় বাজি ফোটানো হতো এবং দোকানের মালিক এর জন্য স্থানীয় নেতা কয়চও-এর অনুমতি নিয়েছিলেন, এবং শেযোক্ত নেতাটিও পুলিসের আগাম অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। এরপর আঁচু ধর্মাবতারকে যে পুলিস লাইসেন্স দেখায় তাতে লেখা কারুর শ্লীলতাহানি না করে নাচ-গানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কাশিটোলার এক চিনা মন্দিরে। শেষ পর্যন্ত কারও কোনো শাস্তি হয়নি, আঁচুকে সাবধান করে দেওয়া হয় সামনের বছরে তাকে কোনো লাইসেন্স দেওয়া হবে না!

শুধু বেন্টিংক স্ট্রিটের অতি সাধারণ চিনা দোকানের কর্মী নয়, সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার পদস্থ চিনা কূটনীতিকের বর্ণনাও রেখে গিয়েছেন জন কিম্‌স বলে এক ইংরেজ। শ্যালোনের অ্যালাবাস্টার বলে চিনা ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসের এক খুদে অফিসারকে বন্দি অবস্থায় ক্যান্টন থেকে টালিগঞ্জে পাঠানো হয়েছিল। আবার এঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইয়ে নামে আর একজন চিনা বন্দি। মোটা লম্বা স্বল্পদাড়ির এই কুৎসিতদর্শন চিনার সঙ্গে কলকাতার কারও কারও দেখা হয়েছিল। কিছু প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, কারণ বর্বরদের এই দেশে দেখার যোগ্য কিছু নেই। জানা যাচ্ছে, এঁর সহকারী মিস্টার ল্যাম ছিলেন বেজায় আমুদে মানুষ—চিনা রান্নায় তাঁর প্রচুর হাত যশ, সেই সঙ্গে নির্জলা ব্র্যান্ডি ঢক ঢক করে পান করতে মানুষটি বিশেষ পারদর্শী। এই রিপোর্টের সময়কাল ১৮৫৯।

লেখক রুডইয়ার্ড কিপলিং কলকাতার নাইটলাইফ সম্বন্ধে জানবার

আগ্রহে ১৮৯২তে পুলিসের সঙ্গে চাইনিজ জুয়ার আড্ডায় বেশ সময় কাটিয়ে তার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। পুলিস এই খ্যাতনামা সাহিত্যিককে পরামর্শ দিয়েছিল, কখনও কলকাতার কোনো চিনাবাড়িতে একলা যেও না।

পুরনো ইংরিজি সংবাদপত্রে কলকাতার চিনাপল্লির নাইটলাইফের বর্ণনা যত বেরিয়েছে তা ধৈর্যসহকারে সাজালে একটা বই হয়ে যায়। ক্লড ব্রাউন বলে এক সায়েব সম্পাদকের কলমে সেকালের কলকাতার চিনাপল্লির একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, পরিশ্রমী চিনারা কুঁড়ে ও ফাঁকিবাজ স্থানীয় লোকদের মোটেই পছন্দ করতো না, তবে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় এরা ওয়েটারের চাকরি পেত। কিন্তু চাইনিজ রান্নাঘরে ভূমিপুত্রদের স্থান অবশ্যই নেই। ইউরোপীয় মহলে মাঝে মাঝে চিনাপল্লিতে ডিনারপার্টি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল তখন। একই সময়ে চিনাপাড়ায় বাড়িতে বসতো বাড়িতে জুয়ার আড্ডা—একটি চিনা খেলার নাম ফ্যানট্যান। এইসব খেলায় চিনারা যখন মশগুল তখন পুলিসের নির্দেশে এসব বাড়িতে ইউরোপীয়দের প্রবেশ নিষেধ।

জুয়ার আসরে নো এনট্রি, কিন্তু চিনা রেস্তোরাঁয় সবাই সুস্বাগতম্। প্রবেশদ্বারেই সহাস্য মালিক দাঁড়িয়ে আছেন অতিথিদের স্বাগত জানাতে এবং সোজা পর্দায় ঘেরা একটা ছোট্ট খুপরিতে বসিয়ে দিতে। কাঠের সিটে কোনোরকম গদি নেই, কিন্তু টেবিলে ধবধবে পরিষ্কার টেবিলক্লথ। এখানকার রান্না তো দুনিয়ার সেরা। দেওয়ালে সুন্দরী ইংরেজ মেমসায়েবদের ছবি—এবং পরিবেশে স্বাদু রান্নার পাগলকরা গন্ধ। রেস্তোরাঁয় মেনু কার্ড দুটি—একটি চাইনিজ, আরেকটি ইউরোপিয়ান। সাংবাদিকদের পরামর্শ লম্বা চাইনিজ লিস্ট থেকে খাবার নির্বাচন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখানকার প্রতিটি পদ গরম—এবং আলাদা আলাদা করে রান্না। প্রত্যেকটি প্লেটে খাবারের পরিমাণ দু'জনের পক্ষে পর্যাপ্ত। টেবিলে সাধারণ কাঁটাচামচ ছুরি সাজানো আছে, চাইনিজ চপস্টিকও চাইলে পাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে এই চপস্টিক সুভেনির হিসেবে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। খাওয়ার মধ্যেই চিনি দুধবিহীন চাইনিজ টি অর্ডার

দেওয়াই রীতি। হার্ড ড্রিংকও সরবরাহ হতে পারে, তবে রাত এগারোটা পর্যন্ত। কথায় বলে, ইন্ডিয়ার চাইনিজরা কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চায় না। সত্যিকথা বলতে কি ইন্ডিয়ান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপিয়ানদের তুলনায় চিনারা পুলিসকে অনেক কম হাঙ্গামায় ফেলে।

আফিম-এর কথা এক কাহন না বললে চিন-ভারত সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিশ শতকে আফিম-এর প্রভাব শুধু প্রতিবেশী চিনে নয় আমাদের এই বাংলাতেও যথেষ্ট। বাংলার পাড়ায় পাড়ায় তখন আফিম-এর সরকারি দোকান এবং কলকাতার সর্বত্র আফিমখোর বুড়োদের ভিড়। কথায়-কথায় নানা রোগে তখন আফিম-এর প্রেসক্রিপশন, বিশেষ করে পেটের এবং হজমের নানা অসুখে। আমরা জানি, কোনো চিকিৎসক একসময় ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ দত্তকেও দৈনিক আফিম খাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা শুনে একজন অনুরাগী আঁতকে উঠে এই সর্বনাশা নেশা জমে ওঠার আগেই প্রবল বাধা দিয়েছিলেন।

আফিম-এর সঙ্গে ভারতবর্ষের কত দিনের পরিচয়? জনৈক অস্ট্রেলীয় গবেষক সম্প্রতি তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছেন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নাকি আফিমের উল্লেখ নেই। সায়েবকে সরল মনে মেনে নিতে মন চাইছে না, কারণ অহিফেন শব্দটির উৎপত্তি এবং প্রতিপত্তি তা হলে কোথা থেকে? অহিফেন ঐতিহাসিকদের সবিনয় নিবেদন, খ্রিস্টের জন্মের তেরশ বছর আগেই সাইপ্রাসের উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা মদের সঙ্গে আফিম মিশিয়ে মিশরীয়দের কাছে বিক্রি করছেন। তারও ১৪০০ বছর পরে আফিম পরিচিত হয়ে উঠেছে ভারত ভূখণ্ডে। বিদেশ থেকে আসা ভ্রমণকারীরা ষোড়শ শতাব্দির শুরুতেই আফিমের দীর্ঘ প্রশস্তি গাইছেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটদের কেউ কেউ যে এর মায়ামোহে পড়ে গিয়েছেন তা ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন। শুধু স্বপ্নসুখ নয়, আয়ুর্বেদের চিকিৎসকরাও বেদনা নিগ্রহে আফিমের

প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লন্ডনের জনৈক বিখ্যাত ডাক্তার ১৭০০ সালে রহস্যময় আফিম সম্পর্কে বিশাল এক বই লিখে ফেললেন এবং সেই বইতেও পূর্ব ভারত (কলকাতা?) থেকে পাঠানো আফিমের নানা গুণাবলীর দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। আরও সাত দশক পরে (১৭৬৭) দেখা যাচ্ছে কলকাতা বন্দর থেকে দু'হাজার পেটি আফিম প্রতি বছর বিদেশযাত্রা করছে। ওয়ারেন হেস্টিংস স্বয়ং আফিমকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং বস্তুটি যে স্বাস্থ্যকর নয় তা আন্দাজ করে এর উৎপাদন সীমিত করবার চেষ্টা চালান। এর বহুল প্রচার রোধ করবার জন্য হেস্টিংস চেয়েছিলেন কোম্পানির হাতে এর একচেটিয়া ব্যবসা থাকুক। কিন্তু বাজার ছোট হওয়া তো দূরের কথা, হেস্টিংসের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আফিমের প্রচার ক্রমশই বাড়তে লাগলো। ফরাসি, ডাচ ও দিনেমার (ডেন)রা নানা ফাঁকফোকর দিয়ে এই লাভজনক ব্যবসায় ঢুকে পড়লেন। সবচেয়ে বেশি কেরামতি দেখালেন শ্রীরামপুরের ডেনরা, আফিম ব্যবসা থেকে তাঁদের লাভের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে বছরে বিশ হাজার পাউন্ড পেরিয়ে গেল—শোনা যায় শ্রীরামপুর রক্ষণাবেক্ষণের পুরো খরচটাই এই আফিম থেকে উঠে আসত।

বলাবাহুল্য এই বাংলার অনেকেই আফিম চাষের নানা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠেন। সবাই জেনে গেল দশ রকমের আফিম হয় এই দেশে এবং তাদের পাপড়ির রঙ পাঁচ রকমের। ইংরেজরা তাঁদের সিপাইদের আফিম দিতেন এবং তারও আগে রণক্ষেত্রে মত্ত হস্তিকে শান্ত করবার জন্য মোগলরা আফিম খাওয়াতেন।

কৌতূহলীরা ১৮৭২-এ প্রকাশিত জুল ভার্নের 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ' বইতে হংকং-এর ওপিয়াম ডেনের বর্ণনা পড়তে পারেন। একটা হলঘরে তিরিশ জন নেশাখোর কীভাবে আফিম সেবনের সুখ উপভোগ করছেন। লাল রঙের মাটির পাইপে গোলাপের ঘ্রাণ মেশানো আফিমের গুলির ধোঁয়া খেয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠছেন নেশাখোররা। জুল ভার্নে জানাচ্ছেন, ইংরেজরা নির্লজ্জভাবে এই

মারাত্মক নেশার সামগ্রী বিক্রি করে কোটি কোটি পাউন্ড রোজগার করছে। রইস আফিমখোরকে দিনে আটবার এই আফিমসুখ উপভোগ করতে হয়। কিন্তু এরা কেউ পাঁচবছরের বেশি বাঁচবে না।

চিনের আফিমের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্রে অবশ্যই কলকাতা। শহরের নীলাম থেকে কেনা আফিম দ্রুতগামী ক্লিপার জাহাজে চড়ে চলে যাচ্ছে ৩৭০০ মাইল দূরের ক্যান্টন বন্দরে। পণ্ডিতরা বলছেন সেকালের চিনে বিদেশি পণ্যের তেমন চাহিদা ছিল না, তাই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের জন্য আফিমই সায়েবদের প্রধান ভরসা। স্বাভাবিকভাবেই স্বদেশপ্রেমী চিনারা কিছু করতে চাইলেন, তাঁরা আফিমের ব্যবসা বন্ধ করতে উন্মুখ নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য।

ইংরেজের সামনে তখন দুটি পথ খোলা—আফিম চালান বন্ধ করে দেওয়া অথবা চিনে সৈন্য পাঠানো। এইভাবে শুরু হলো বিখ্যাত ওপিয়াম ওয়ার (১৮৪০-৪২)। প্রবলপ্রতাপ ইংরেজবাহিনী সেবার দুরন্তগতিতে হংকং দখল করল এবং চিনের দুঃখ ও অপমানের শেষ রইল না।

সেই সময় ভারতের সায়েবরাও আফিমের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে তৎপর হলেন। ভারতকে আফিম উৎপাদন বন্ধ করতে বলা মানে পাশের দেশ চিনের আধিপত্য বিস্তার করা ভারতের ওপর।

১৮৩৩ সালের সায়েবদের লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, কলকাতার আফিমের ব্যবসায় অনেক স্থানীয় লোক ভালভাবেই জড়িয়ে পড়েছেন। ফাটকায় কেউ ধনপতি হচ্ছেন, আবার কেউ দেউলিয়া হচ্ছেন।

কলকাতায় আফিমের নিলামের রমরমে ব্যবসার বিবরণ রেখে গিয়েছেন বোস্টনের মার্কিনী ব্যবসায়ীরা। বারাণসী ও পাটনার আফিমের প্রাথমিক গন্তব্যস্থল কলকাতা, সেখানে বছরে বারোবার নিলামে চড়ে আফিম। এই নিলামঘরের দৃশ্য রোমাঞ্চকর। ইউরোপের সব দেশের লোকরা সেখানে সাগ্রহে হাজির! এছাড়া অবশ্যই আছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। সেই সঙ্গে রয়েছেন আর্মেনিয়ান, পার্শিয়ান, গ্রীক, ও আফ্রিকান ও এশিয়ান নীলামদাররা। কিন্তু ডাক হবার আগেই প্রচণ্ড

ফাটকাবাজি।

নাম কা ওয়াস্তে ১৮৬০ সালে আফিমের উৎপাদন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হল, কিন্তু অজ্ঞাত পথে চিনে আফিমের সরবরাহ বেড়েই চললো—কলকাতা ও বোম্বাই বন্দর থেকে ১৮৮০ সালে বিদেশে আফিমের রপ্তানির পরিমাণ ৯০,০০০ পেটি! এক পেটিতে তখন থাকতো দেড়শ পাউন্ড আফিম।

ঐতিহাসিক ওপিয়াম ওয়ারের দুটি পর্ব। প্রথমটির সূচনা ১৮৩৯ সালের বসন্তকালে, ওই সময় চিনা কর্তৃপক্ষ আমদানিকরা আফিম বাজেয়াপ্ত করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রত্যুত্তরে ইংরেজরা যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে ক্যান্টন অধিকার করে নেয়।

ব্রিটেনের সামরিক শক্তির কাছে চিন তখন নস্য মাত্র, বারবার পরাজিত হয়ে ১৮৪২ সালে সন্ধি হলো যার নাম ট্রিটি অফ নানকিং। এমন অপমানজনক শর্ত কোনো পরাজিত জাতের ভাগ্যে বোধহয় সম্প্রতিকালে জোটেনি। বৃটিশ নাগরিকরা যদি চিনের মাটিতে কোনো অপরাধ করে তবে চিনা আইনে বিচার না হয়ে বৃটিশ আইনে তাদের বিচার হবে। বাণিজ্যের জন্য পাঁচটি বন্দরে ইংরেজের ঢালও স্বাধীনতা।

আফিমের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকায় কয়েক বছরের মধ্যে আফিমের ব্যবসা ডবল হলো।

দু'বছর পরে একই অপমানজনক শর্তে ঢালাও সুবিধা দেওয়া হলো শক্তিমান ফ্রান্স ও আমেরিকাকে। কিন্তু তাতেও বিদেশিদের মনস্কামনা পূর্ণ হতে চায় না।

বিভিন্ন অজুহাতে দ্বিতীয় ওপিয়াম যুদ্ধের শুরু হলো ১৮৫৬। এর অবসান ১৮৫৮—আর এক অবমাননাকর চুক্তি তিয়েনসেনের সন্ধি। পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশিরা চিনের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার পেলেন, খ্রিস্টানরা ধর্মপ্রচারের অনুমতি পেলেন এবং সম্পত্তি কেনার অধিকার। সুযোগ বুঝে রাশিয়া ও আমেবিকা একই সবিধে আদায় করে নিল পথক সন্ধির মাধ্যমে।

চিনের পথে স্বামী বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কলকাতায় বড় হয়ে ওঠা যে মানুষটি চিনের মাটিতে নিঃশব্দে পা দিয়েছিলেন এবং পীতজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন তিনি অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার উদ্দেশে বোম্বাই থেকে তিনি জাহাজে উঠে পড়েছিলেন। ১০ জুলাই ১৮৯৩ তিনি ইয়োকোহামার ওরিয়েন্টাল হোটেল থেকে তাঁর ভক্তদের কাছে এক চিঠিতে চিনের মাটি স্পর্শ করার বিবরণ দিচ্ছেন উৎসাহের সঙ্গে।

"বোম্বাই থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে ছিল। এই সুযোগে আমি নেমে শহর দেখতে গেলাম। গাড়ি করে কলম্বোর রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। সেখানকার কেবল বুদ্ধ-ভগবানের মন্দিরটির কথা আমার স্মরণ আছে : তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ পরিনির্বাণ-মূর্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে। মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁরা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানে না বলে আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। ওখান থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যদেশে অবস্থিত কান্ডি শহর সিংহলী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার সেখানে যাবার সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ—কি পুরুষ কি স্ত্রী—সকলেই মৎস্য মাংস-ভোজী, কেবল পুরোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মান্দ্রাজিদের মতো। তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না ; তবে উচ্চারণ শুনে বোধহয়, উহা তোমাদের তামিলের অনুরূপ।

"পরে জাহাজ পিনাঙে লাগল : উহা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে

একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র। উহা খুব ক্ষুদ্র শহর বটে, কিন্তু অন্যান্য সুনির্মিত নগরীর ন্যায় খুব পরিষ্কার-ঝরিষ্কার। মালয়বাসীগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে এরা ছিল সওদাগরি জাহাজসমূহের বিশেষ ভীতির কারণ—বিখ্যাত জলদস্যু। কিন্তু এখনকার বুরুজওয়ালা যুদ্ধজাহাজের প্রকাণ্ড কামানের চোটে মালয়বাসীগণ অপেক্ষাকৃত কম হাঙ্গামার কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

“পিনাঙ থেকে সিঙ্গাপুর চললাম। পথে দূর হতে উচ্চশৈল-সমন্বিত সুমাত্রা দেখতে পেলাম ; আর কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালের জলদস্যুগণের কয়েকটি আড্ডা অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাতে লাগলেন। সিঙ্গাপুর প্রণালী-উপনিবেশের (straits settlement) রাজধানী। এখানে একটি সুন্দর উদ্ভিদ-উদ্যান আছে, তথায় অনেক জাতীয় ভালো ভালো ‘পাম’ সংগৃহীত। ‘ভ্রমণকারীর পাম’ (Traveller’s palm) নামক সুন্দর তালবৃন্তবৎ পাম এখানে অপর্যাপ্ত জন্মায়, আর ‘রুটিফল’ (bread fruits) বৃক্ষ তো এখানে সর্বত্র।

মান্দ্রাজে যেমন আম অপর্যাপ্ত, এখানে তেমন বিখ্যাত ম্যাঙ্গোস্টিন অপর্যাপ্ত, তবে আমের সঙ্গে আর কিসের তুলনা হতে পারে? এখানকার লোকে মান্দ্রাজিদের অর্ধেক কলোও হবে না, যদিও এ স্থান মান্দ্রাজ অপেক্ষা বিষুবরেখার নিকটবর্তী। এখানে একটি সুন্দর জাদুঘরও (Museum) আছে। এখানে পানদোষ ও লাম্পট্য বেশি মাত্রায় বিরাজমান, এটাই এখানকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের যেন প্রথম কর্তব্য। আর প্রত্যেক বন্দরেই জাহাজের প্রায় অর্ধেক নাবিক নেমে এরূপ স্থানের অন্বেষণ করে, যেখান সুরা ও সংগীতের প্রভাবে নরক রাজত্ব করে। থাক সে কথা।

“তারপর হংকং। সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত হলেও সেখান থেকেই মনে হয় যেন চিনে এসেছি।—চিনের ভাব সেখানে এতই প্রবল। সকল মজুরের কাজ, সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বোধহয় তাদেরই হাতে। আর হংকং তো খাঁটি চিন ; যেই জাহাজ কিনারায় নোঙর করে, অমনি শত শত চিনে নৌকা এসে ডাঙায় নিয়ে যাবার জন্য তোমায়

ঘিরে ফেলবে। এই নৌকাগুলো একটু নতুন রকমের—প্রত্যেকটিতে দুটি করে হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকাতেই বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির স্ত্রী-ই হালে বসে থাকে, একটি হাল দু-হাত দিয়ে ও অপর হাল এক-পা দিয়ে চালায়।

"আর দেখা যায় যে, শতকরা নব্বই জনের পিঠে একটি কচি ছেলে এরূপভাবে একটি থলির মতো জিনিস দিয়ে বাঁধা থাকে, যাতে সে হাত-পা অনায়াসে খেলাতে পারে। চিনে-খোকা কেমন মায়ের পিঠে সম্পূর্ণ শান্তভাবে ঝুলে আছে, আর ওদিকে মা—কখনো তাঁর সব শক্তি প্রয়োগ করে নৌকা চালাচ্ছেন, কখনো ভারী ভারী বোঝা ঠেলছেন, অথবা অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে এক নৌকা থেকে অপর নৌকোয় লাফিয়ে যাচ্ছেন—এ এক বড় মজার দৃশ্য!

আর এত নৌকা ও স্টিম-লঞ্চ ভিড় করে ক্রমাগত আসছে যাচ্ছে যে, প্রতিমুহূর্তে চিনে-খোকার টিকিসমেত ছোট মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে ; খোকার কিন্তু সে দিকে খেয়ালই নেই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্মজীবনের কোনো আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মতো ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু-এক খানা চালের পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার গঠনতন্ত্র (anatomy) জেনেই সন্তুষ্ট।

"চিনে-খোকা একটি রীতিমতো দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কাজ করতে যায়। সে বিশেষরূপেই প্রয়োজনীয়তার দর্শন শিখেছে। চিন ও ভারতবাসী যে 'মমিতে' পরিণত প্রায় এক প্রাণহীন সভ্যতার স্তরে আটকে পড়েছে, অতি দারিদ্র্যই তার অন্যতম কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চিনবাসীর পক্ষে তার প্রাত্যহিক অভাব এতই ভয়ানক যে, তাকে আর কিছু ভাববার অবসর দেয় না।

"হংকং অতি সুন্দর শহর—পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্মিত ; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক বাস করে ; ইহা শহর অপেক্ষা অনেক ঠান্ডা। পাহাড়ের উপরে প্রায় খাড়াভাবে ট্রাম-লাইন গিয়েছে ; তারের দড়ির সংযোগে এবং বাষ্পীয় বলে ট্রামগুলি উপরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

"আমরা হংকং-এ তিনদিন ছিলাম। সেখানে থেকে ক্যান্টন দেখতে গিয়েছিলাম, হংকং থেকে একটি নদী ধরে ৮০ মাইল উজিয়ে ক্যান্টনে যেতে হয়। নদীটি এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্যন্ত যেতে পারে। অনেকগুলো চিনে জাহাজ হংকং ও ক্যান্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বিকেলে একখানি জাহাজে চড়ে পরদিন প্রাতে ক্যান্টনে পৌঁছলাম। প্রাণের স্ফূর্তি ও কর্মব্যস্ততা মিলে এখানে কি হইচই! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলেছে। এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়, হাজার হাজার নৌকা রয়েছে গৃহের মতো বাসোপযোগী। তাদের মধ্যে অনেকগুলো অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলো দুতলা তেতলা বাড়ির মতো, চারিদিকে বারান্দা রয়েছে, মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে ; কিন্তু সব জলে ভাসছে!!

"আমরা যেখানে নামলাম, সেই জায়গাটুকু চিন গভর্নমেন্ট বৈদেশিকদের বাস করবার জন্য দিয়েছেন ; এর চতুর্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল জুড়ে এই বৃহৎ শহর অবস্থিত—এখানে অগণিত মানুষ বাস করছে, জীবন-সংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলে ফেলে চলেছে—প্রাণপণে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার চেষ্টা করছে। মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসীসংখ্যা যতই হোক, এখানকার কর্মপ্রবণতা যতই হোক, এর মতো ময়লা শহর আমি দেখিনি। তবে ভারতবর্ষের কোন শহরকে যে হিসেবে আবর্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসেবে বলছি না, চিনেরা তো এতটুকু ময়লা পর্যন্ত বৃথা নষ্ট হতে দেয় না ; চিনাদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই বলছি, তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখনো স্নান করবে না।

"প্রত্যেক বাড়িখানি এক একখানি দোকান—লোকেরা উপরতলায় বাস করে। রাস্তাগুলো এত সরু যে, চলতে গেলেই দুধারের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চলতে না চলতে মাংসের দোকান দেখতে পাবে ; এমন দোকানও আছে, যেখানে কুকুর-বেড়ালের মাংস বিক্রয় হয়। অবশ্য খুব গরিবেরাই কুকুর-বেড়াল খায়।

"আর্যাবর্তনিবাসিনী হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দা আছে, তাদের যেমন

কেউ কখনো দেখতে পায় না, চিনা মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সামনে বেরোয়। এদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটি স্ত্রীলোকের পা তোমাদের ছোট খোকার পায়ের চেয়ে ছোট ; তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঠিক বলা যায় না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ থপ করে চলছে।

"আমি কতকগুলি চিনে মন্দির দেখতে পেলাম। ক্যান্টনে যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি আছে, তা প্রথম বৌদ্ধ এবং সর্বপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্তি ; তাঁর নীচেই সম্রাট বসেছেন, আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্তি—সব মূর্তিগুলিই কাঠে খোদিত।"

কেদারনাথের চিনযাত্রা

দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯। সেবারে জাহাজে উঠেছিলেন খোদ কলকাতা থেকে. কিন্তু সেবার যাত্রা পূর্বমুখো নয়, তাই চিনের বন্দরে ক্ষণেকের পরিব্রাজক হওয়ার সুযোগ ঘটেনি।

কিন্তু সেই সময় কলকাতার সঙ্গে চিনের জাহাজী যোগাযোগ আরও উন্নত এবং নিবিড় হয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে একজন খ্যাতনামা বাঙালি সাহিত্যিকের চিন যাত্রার খবরাখবর পাওয়া গেল। এই চিনযাত্রীর নাম কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেদারনাথের জন্ম ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩—অর্থাৎ তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সমবয়সী। তাঁর পিতা গঙ্গানারায়ণ কাজ চালাবার মতন ইংরাজি জানতেন, তীর্থে বেরিয়ে লাহোরের সন্নিকটে তিনি আটকে যান। তখনকার দিনে ধর্মশালা বা চটিতে ইংরাজি জানা বাঙালি এলে নাকি স্থানীয় সাহেবকে জানাতে হত। সেই সূত্রে ধরা পড়ে—ফিরোজপুরে গঙ্গানারায়ণকে চাকরি স্বীকার করতে হয়েছিল। কেদারনাথও পাকেচক্রে মিলিটারি বিভাগে চাকরি নেন। তারপর "চিনে বকসার হাঙ্গামা সম্পর্কে আদেশমতো ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে চিনযাত্রা করি।"

১৯০৫-এর আগস্ট পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বছর চিনে কাটিয়ে কেদারনাথের নিজস্ব জবানি অনুযায়ী, ১৯০৯-এর নভেম্বরে ছুটি নিয়ে কাশী যান এবং পরের বছর মে মাসে মেডিকেল সার্টিফিকেটের সাহায্যে চাকরি থেকে নির্ধারিত সময়ের আগে রিটায়ার করেন।

রাঁচির জনপ্রিয় নেতা সাহিত্যপ্রেমী জ্ঞানশঙ্কর মজুমদারকে আমি একবার কেদারনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে

আমাকে পাটনার বিহার বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কেদার রচনাবলী প্রথম খণ্ড উপহার দেন। এই খণ্ডেই আমি ইদানীং পাঠকদের ভুলে যাওয়া 'চিনযাত্রী' বইটি গভীর আনন্দ নিয়ে পাঠ করি।

ভেতো বাঙালিবাবুর চিনযাত্রার বিস্তারিত কাহিনি এই প্রথম পড়লাম। আরও এমন বই চিন পরিব্রাজক কোনো বাঙালি সেই অশান্তসময়ে লিখেছেন কিনা আমার জানা নেই।

জাহাজ থেকে নামবার আগে কেদারনাথ চিন সম্পর্কে একটি গান লিখেছিলেন। "কাল চরণার্পণে চিনকে চরিতার্থ করিবার বন্দোবস্তে সকলকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। চিনে উপস্থিত হইলে কিরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাও অনুমান করা কঠিন...এরপরেই বাঙালি সহযাত্রীদের সামনে লেখক যে কবিতা পাঠ করেছিলেন তা একশ বছর পরেও নিরর্থক হয়নি। সেটি তুলে ধরার লোভ সামলানো যাচ্ছে না—

'একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!"
অত ঘেঁসে যেওনাকো,—মরিয়া এখন রাধা প্যারী॥
চিনের রাধা পা' চালালে,
চোট্‌কে তোমার যাবে পীলে,
বেটক্করে লেগে গেলে
এক্কেবারে যাবে মরি॥

একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!
ও-নহে পদ-পল্লব,—
বিশুদ্ধ লৌহ ভৈরব ;
হাত বুলুতে সাধ্ যদি হয়—
(হরি) কর সে কাজ উকো (file) ধরি।

একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি॥
সমঝে কেষ্ট কর কাজ,
রাধার এখন্ পুরো ঝাঁজ,

ওই steel frame-এর —প্রেমের গুঁতো—
(তোমার) সইবে না হে বংশীধারী!
একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি॥

মিলিটারি বিভাগে চাকরি করলেও লেখকের সিমপ্যাথি যে চিনের ওপর, গায়ের জোরে দুর্বলের ওপর ঝাঁপিয়ে-পড়া ইংরেজ এবং অন্য ইউরোপীয়দের দিকে নয় তা কেদারনাথের এই লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট। একটু উদ্ধৃতি প্রয়োজন ;

"আমরা যত বড় দাসত্ব করি না কেন, হনুমানকে হারাইতে পারিব না। দাসত্ব করিয়া তিনি চির-অমর হইলেন, এবং ত্রিভুবন-জোড়া যশের অধিকারী হইয়া রহিলেন ; ঋষি বাল্মীকি তাঁহার গুণ-গানে সহস্র মুখ। উদার লোকই আলাদা ; হনুমানকে তিনি দেবতা বানিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাদের দগ্ধভাগ্যে ডি এল রায় মহাশয়-বর্ণিত ঋষিরাই জুটিলেন।

"জন্মেছিলাম মানুষ, বানিয়ে দিলেন জানোয়ার ; কারণ—দাসত্ব করি। কেন, আর কি সুখে যে করি, তাহা ঋষিরা যোগের সাহায্যে না খুঁজিয়া, গোলযোগের দ্বারাই বুঝিয়া রাখিলেন। যাক, হনুমান মরিয়া হইয়া স্ব-ইচ্ছায় ও স্ববলে, সাগরপাড়ে পাড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার সংসার ছিল কি না জানিনা ; অন্তত থাকার প্রমাণাভাব। আমাকে অনিচ্ছায় ও অগত্যা, পরের বলে পা বাড়াইতে হইয়াছিল। তাহা হইলেও, আমার যে নিজের বলের কোনো আবশ্যকই হয় নাই, এমন নহে। তবে তাহার প্রকাশ্য নজির করা কঠিন ; তাহা মনস্তত্ত্বজ্ঞের মারফতই প্রাপ্তব্য।

কতকটা রবিবাবুর "যেতে নাহি দিব" কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে। বাঙালির হাতে কাঁদুনির ভূমিকা শেষ হইতে জানে না ; অতএব সরাসরি শুরু করাই ভালো।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চিনে "বক্সার ট্রব্‌ল্" বা "বক্সার হাঙ্গামা" বলিয়া একটা গোলমাল উপস্থিত হয়। 'বক্সার' নামে চিনে একটা উগ্রদল দেখা দেয়। "ফরেনার" বা বিদেশীয়দের সহযোগিতা বর্জনই বোধহয় তাহাদের মূলনীতি ছিল। যে সব চিনেরা বিদেশীয়দের চাকরি করিত,

তাহাদের সাহায্য করিত বা সংস্রবে থাকিত, আর যাহারা বিদেশী পাদ্রিদের উপদেশে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিতেছিল, বা করিয়াছিল, বক্সারদের বিষ-দৃষ্টিটা সেই সব চিনেদের উপরই বিশেষ করিয়া পড়ে।

নিষেধ ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা মনোমত ফল লাভ না হওয়ায়, ক্রমে তাহারা সংহারমূর্তি ধারণ করে ও সেই সব চিনেদের ঝাড়েমূলে ধ্বংসকার্যে ব্রতী হয়। ন্যায়-ধর্ম-পরায়ণ পাদ্রিরা ও অন্যান্য বিদেশিরা, সেই সব আশ্রিত ও বিপন্ন চিনেদের রক্ষার্থে প্রয়াস পান। উন্মত্ত বক্সারেরা তখন ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁদেরও আক্রমণ করে ও খুন জখম আরম্ভ করিয়া দেয়। ক্ষিপ্তেরা তখন ভাবে নাই যে—'এ বারতা যবে পাইবেন রক্ষোনাথ', তখন ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে ও কতদূর গড়াইবে। ফল তাহাই হইল। একটা হাসির গান আছে—

"কামিখ্যেতে কাক্ মরেছে, বৃন্দাবনে হাহাকার।"

এ-ক্ষেত্রে সেটা কান্নার গান হইয়া, এক মুহূর্তে সমগ্র সভ্য জগতের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা জাগাইয়া দিল। শক্তিশালীদের মধ্যে সাজসাজ সাড়া পড়িয়া গেল। তারির ঝাপ্‌টায়, সমুদ্র-যাত্রার পাপটা, আমাদেরও জড়াইয়া ধরিল। সেই অভিযানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মজলিসে, অন্যান্যদের সঙ্গে আমারও ডাক্ পড়িয়াছিল।

বিদায়ের বিবরণটা কেবল ব্যথায় ভরা, সেটা বাদ দেওয়াই ভালো। সেদিনও প্রাতে পাখি আনন্দে গাইয়া থাকিবে, ফুল সহাস্যে ফুটিয়া থাকিবে, বায়ু সুমন্দ বহিয়া থাকিবে, কবি কবিতা লিখিয়া থাকিবেন ; কিন্তু আমার প্রাণে মনে বা নয়নে, তাহার কোনো সাড়াই পৌঁছে নাই। তখন আমি কেবল উদাসপ্রাণে একান্ত অনুভব করিতেছিলাম—আমার ক্ষুদ্র গ্রামের ও আমার দেশের, অতি তুচ্ছ তৃণটিও আমার কতটা আপনার। আর এতটা দীর্ঘদিনের তাচ্ছিল্যের জন্য, মনে মনে তাহাদের নিকট অবনত হইয়া ক্ষমা চাহিতেছিলাম। এতটা চেতন অচেতন, ক্ষুদ্র বৃহৎ, আদৃত অনাদৃত ও অবজ্ঞাত যে এক মুহূর্তে আমারই অংশরূপে আমার মধ্যে অভিন্ন হইয়া দেখা দিতে পারে, তাহা কখনও এবং তখনও ভাবিতে পারি নাই।

আমার সুদূর যাত্রার সম্বলের সহিত একটু দেশের মাটি (গঙ্গামৃত্তিকা) আর একখানি গীতা, প্রিয় ও পরম সুহৃদের স্থান অধিকার করিল।

চীনযাত্রী বইটি শুরু বড়ই সহজভাবে, "১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই বেলা আটটার সময় আমাদের লইয়া "ক্লাইভ" নামক সরকারি জাহাজ খিদিরপুর ডক ছাড়িল। বারকয়েক দুর্গানাম স্মরণ করিলাম ও বঙ্গভূমিকে প্রণাম করিয়া বললাম—'মা, আবার যেন তোমার কোলে ফিরে আসতে পারি।' চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ কোনোদিকেই দৃষ্টি ছিল না।

বোঝা যাচ্ছে এই জাহাজে বাঙালির সংখ্যা মন্দ নয়। "আমরা বাঙালি কয়েকটি যেন ছুটির দিনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। সকলেরই বরযাত্রীর বেশ। মিহি আসবাবে দেহ ও ট্রাঙ্ক বোঝাই, কাহারও দু' একটি পুরাতন প্যান্ট থাকিতে পারে। ...হাজার খানেক যাত্রীর মধ্যে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভদ্রের সংখ্যা শতাধিক ছিল না ; ফলোয়ারদের অর্থাৎ সাহায্যকারী শ্রমিকদের সংখ্যাই অধিক ছিল। একালের পাঠকরা জেনে অবাক হবেন, প্রত্যেক যাত্রী সঙ্গে নিয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণ গঙ্গামৃত্তিকা। বই বলতে, প্রত্যেকের সঙ্গে একখানি গীতা। আরও একজন সহযাত্রী দত্তমশায়ের সঙ্গে একটি ট্রিগ্-নোমেট্রি। রেঙ্গুন সমাগত এক চাটুজ্যের কাছে একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও দাশরথি রায়ের পাঁচালি।

কলম্বো হয়ে সেকালের সিঙ্গাপুরের একটা বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা কেদারনাথের রচনায় পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৯৩-এর সিঙ্গাপুরের একটা ছবি আমরা বিবেকানন্দের চিঠিতেও পেয়েছি। এবার শুনুন ১৯০২-তে কেদারনাথের বর্ণনা :

"ডিঙি ডাঙা স্পর্শ করিতে না করিতে, সকলে লম্ফ দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া বাঁচিলাম ; কারণ 'সপ্ত দিবা বিভাবরী' ভূমির দর্শন বা স্পর্শন ঘটে নাই। তদ্ভিন্ন, এই লম্ফটা অনেক দিক রক্ষা করিল ; সাগর-পারের সনাতন নিয়মটা এইভাবে রক্ষা হইয়া গেল ; বোধহয় এতদ্বারা

সাগর-পারের দেবতাটিরও সম্মান বজায় রহিল। আমাদের নামিতে দেখিয়া ঘোড়াগাড়ি ও রিক্সাবাহকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

"রিক্সাগুলি বগিগাড়ির 'বাবালোগ্' বা বাচ্চা বলিলেও চলে। রিক্সা কথাটার ব্যাখ্যা আজ অনাবশ্যক, এখন তাহাদের কলিকাতার পথেঘাটে পা ছড়াইয়া থাকিতে নিত্যই দেখা যায়। আমরা একখানি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়া, গাড়োয়ানকে হুকুম করিলাম—'পোস্ট অফিস' ; কারণ জাহাজে-লেখা পত্রগুলির মধ্যে 'সাতশো রাক্ষসীর প্রাণ' রহিয়াছে ; অন্তত সকলের ইহাই ধারণা।

"এই শতকের পরিচ্ছন্ন সিঙ্গাপুরের বর্ণনায় পঞ্চমুখ যাঁরা এখনকার কর্তৃপক্ষের গুণগান করেন তাঁরা জেনে রাখুন বিশ শতকের শুরুতেও সিঙ্গাপুর অপরিচ্ছন্ন ছিল না। বাঙালি কেদারনাথ লিখছেন : "দেখি, সিঙ্গাপুরের পথগুলি প্রশস্ত, পরিষ্কার ও পাকা। দুই পার্শ্বে সুদৃশ্য উদ্যান ও তন্মেধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চভূমি বা পর্বতখণ্ডের উপর, অতি সৌখীনভাবে নির্মিত বাংলো (Bunglow) ধরনের বাড়ি। কোনটি নীল, কোনটি হলদে, কোনটি সবুজ এবং কোনটি বা গোলাপী,—যেন ছবিগুলি। দেখিতে দেখিতে ডাকঘরে পৌঁছিলাম।

"ডাকঘরটি ছোট অথচ বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার। কর্মচারীগণ অধিকাংশই সাঙ্গাই-যুবক। যিনি আমাদের পত্রগুলি লইলেন, তিনি ইংরাজি বোঝেন ও ইংরাজিতে কথাবার্তা কহিতে পারেন। টিকিট কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া ফ্যাঁসাদে পড়িলাম ; আমাদের টাকা এখানে অচল! এত সাধের চিঠিগুলি চড়ায় ঠেকিল।

"সৌভাগ্যক্রমে সকল বাঙালিই আমার মতো বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা লইয়া ঘরের বাহির হয়েন নাই। কেহ কেহ জাহাজের কর্মচারীগণের নিকট হইতে পূর্বাহ্নেই টাকা বদলাইয়া ডলার ও সেন্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে আমার মতো বুদ্ধিমানের কিনারা হইল।

ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে এবার নতুন দেশ দেখাবার পালা। কেদারনাথ লিখছেন, "এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া সিঙ্গাপুর শহর ভ্রমণে বাহির হওয়া

গেল। গাড়োয়ানকে হুকুম করা গেল 'মার্কেট'। সুদৃশ্য উদ্যান, হর্ম্য, কলকারখানা দেখিতে দেখিতে বাজারে উপস্থিত হইলাম।

প্রায় এক বিঘা জমির উপর পাকা নাটমন্দির সুদৃশ্য ইমারত—মাঝে মাঝে থাম দেওয়া। আমরা বাঙালি—শাক্-সবজি ও মাছ খাইয়াই মানুষ, সুতরাং সবজি-বাজারেই প্রবেশ করা গেল। দেখিলাম নটে, পালং, কলমী পর্যন্ত বর্তমান। সুশনী শাকটা বোধ করি বঙ্গদেশে যাঁহারা কোমর-ভাঙা পড়া পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপাক উপাধিগুলি গ্রাস করতঃ এখন অজীর্ণজন্য ধোয়ামুগ ও জলসাগুর আশ্রয় লইয়াও অনিদ্রার অশান্তি এড়াইতে পারিতেছেন না, তাঁহাদেরই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

"যে কারণেই হউক, সুশনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। পুঁই শাক্টাও বোধহয় বঙ্গদেশের একচেটে ঐশ্বর্য, নচেৎ একান্নবর্তী পরিবার প্রতিপালন দুঃসাধ্য হইত। বেগুনের বাঢ় বিষম। মুলো অপেক্ষাকৃত বেঁটে, কিন্তু খর্বতাটুকু পরিধিতেই পূরণ করিয়া লইয়াছে। আলু, রাঙাআলু, কপি, কচু, কিছুরই অনটন নাই। ওল এখন সাঁতরাগাছির উপর সদয় ; তিনি গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া জেন্টলম্যান্ হইয়াছেন। গাড়ি করিয়া কলিকাতায় আসেন, আর কোষ্ঠকাঠিন্য বাবুদের রুমালে বা গ্লাডস্টোন্ ব্যাগে স্থান পান ; তাই এসব অঞ্চলে বড় একটা নজর রাখেননি।

"ফলের বাজারে চাহিলে চক্ষু জুড়ায়। একা আনারসই যেন কিংখাপের আবরণে চারিদিক আলো করিয়া রাখিয়াছে ; তাহাদের মিষ্টগন্ধে বাজার ভরপুর। যেমনি সরস তেমনি সুমিষ্ট, কেহ কণামাত্র চিনির মুখাপেক্ষী নহে।

"সিঙ্গাপুরী কলা ও নারিকেল সুপ্রসিদ্ধ। শ্রদ্ধা সহকারে কিঞ্চিৎ কলা সংগ্রহ করা গেল ; কারণ, নিরাপদে সমুদ্র পার হইবার পক্ষে, উহাই ক্রেতাযুগের ছাড়পত্র। সিঙ্গাপুরের শশাগুলি কিঞ্চিৎ কৃশ, কিন্তু দৈর্ঘ্যে তাহা পূরণ হইয়াছে। চাটুজ্যের মামলা ঝুলিতেছে, তাহার শান্তির জন্য কয়েকটি মুলো ও ক-জোড়া শশা লওয়া হইল। ইক্ষুদণ্ডগুলি কচি বাঁশ বলিলে চলে। লেবু প্রভৃতি অন্যান্য ফলের বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক।

"বাজারে ডাব দেখিতে না পাইয়া বড়ই দমিয়া গেলাম, কিন্তু আশা ত্যাগ করিলাম না।

"মাংসের বাজারটা দ্রুতপদেই অতিক্রম করিতে হইল ; কারণ, মাংসটা সেখানে মাংস ভিন্ন আর কিছু নয়, গো-মাংস, শূকর-মাংস, ভেড়ার মাংস বেশ সদ্ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে।

"মৎস্যের বাজারে প্রবেশ করা গেল। মৎস্য দেখিয়া যাঁহার না আনন্দ ও লোভ হইয়াছিল তিনি বাঙালিই নন। ঘুশো-চিংড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া রুই, মৃগেল, কালবোস, ভেট্‌কি সকলেই উপস্থিত। এতবড় পায়রাচাদা পূর্বে কখনও দেখি নাই, ওজনে এক একটি দেড় সের হইবে!

"ভেটকিগুলি একআধ বৎসরের শিশু অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে পারে। শঙ্কর মাছ যথেষ্ট, তদ্ব্যতীত অজ্ঞাতনামা মৎস্য যে কত প্রকারের দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা ফটো দ্বারা অধিক পরিস্ফুট করা চলে। ডি গুপ্ত মহাশয়ের জীবিত মৎস্যের ঝোলের ব্যবস্থাটা এইখানেই তামিল হওয়া সহজ, কিন্তু একটি পীলে-রোগী দেখিলাম না। ইলিশ প্রচুর।

"লাল রংয়ের মাছ আমাদের দেশের সৌখীন বড়লোকদের একটা ঐশ্বর্যের মধ্যে গণ্য। কেহ বোতলে, কেহ চৌবাচ্চায় রাখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত করেন। সেগুলির মধ্যে যাহারা খুব বড়, তাহারা আধপোয়ার মধ্যে। এখানে আধ-পো হইতে আরম্ভ করিয়া, তিনি চারি সের পর্যন্ত, লাল ও সবুজ বর্ণের মাছ দেখিলাম ; এক আধটি নয়, স্তূপাকার! প্রথম দর্শনে তাহাদের প্রকৃত বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারি না। ভাবিয়াছিলাম ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য রং মাখাইয়া রাখিয়াছে। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সত্য সত্যই তাহাদের রংই ওই।

"এইবার কর্কটের কাহিনি ; তাহাদের সংখ্যাতীত সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। এক-একটি আধসের তিনপো, শ্বেত ও ধূসর বর্ণের উপর নীলের চিত্র, নীল বর্ণের উপর শ্বেত ও লোহিত বর্ণের চিত্র অতি মনোহর। তাহারা অযোধ্যার রাজসিংহাসন পাইবার উপযুক্ত কিনা জানি

না, তবে বরুণরাজের বালাখানার বস্তু বটে।

"সুঁটকি মাছের বাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও, পাঠকের নাড়ি কয়টা স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কায় পরিত্যক্ত হইল। পরে ডিম্ব ও পক্ষিবিশেষের বাজার পার হইয়া দেখি, একদিকে রন্ধন কার্য চলিয়াছে ও দলে দলে শ্রমজীবীরা আসিয়া, সেই অধপক্ক খাদ্য, এক একটি চিনেমাটির বাটিতে করিয়া দুইটি কাঠির সাহায্যের অতি উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেছে। তন্মধ্যে শাক-সবজি, মৎস্য-মাংস, একাধারে সবই বর্তমান। জাতিভেদের জয়ঢাক এখানে একদম নীরব।

"ইতিমধ্যে ইলিশ, বাটা ও গলদাচিংড়ি খরিদ হইয়াছিল. তাহা সামান্য শাক-সবজি ও গোটাকয়েক আনারস লইয়া গাড়িতে ওঠা গেল, পান ও ডাব কিনিবার ইচ্ছা প্রবল থাকায়, একটি দ্বিভাষীকে সঙ্গে লইয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সহরের পথের দুই ধারে সমরেখায় সারবন্দী. বড়লোকদের ও সওদাগরদের বাটির সম্মুখভাগ রঙিন কাগজ, জগ্‌জগা ও সোনালির ফল ফুল পতাকা ও আলেপনে স্বত্বাধিকারীর রুচি ও অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। সাইনবোর্ডগুলি সোনার জলে লেখা।

"অনেক ভারতবাসী এখানে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। তন্মধ্যে নাকোদার এবং বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলের শেঠ ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এখানকার সাধারণ সম্প্রদায় ও মুটে-মজুরগণ, আকার প্রকার ও বর্ণে অনেকটা ব্রহ্মদেশবাসীদেরই মতো। বড়লোক সর্বত্রই স্বতন্ত্র জীব।

"আমাদের দেশে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরাই বেতের বাগানের মালিক ; তাহাদেরই কৃপায় আমাদের এই ধারণা ছিল, তাহার প্রমাণ খুঁজিতে অপরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে হইত না। কিন্তু এখানে বেতের ব্যাপার দেখিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে, এখানকার পাঠশালে পড়িতে হয় নাই!

"যাহা হউক এখানে বেতের শিল্পকার্য দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। বেতের টেবিল, চেয়ার, কৌচ, টুপি, ট্রাঙ্ক, বিবিধ প্রকারের আধার—টুল, বেঞ্চি, আলমারি, সবই বেতের। তাহাদের সূক্ষ্ম-শিল্প-সৌন্দর্য

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত এক এক পাব 'ম্যালাক্কা কেনের' সুগঠিত ছড়ি ও চাবুক সৌখীন সম্প্রদায়মাত্রেরই সোহাগের বস্তু।

"একস্থানে ডাব দেখিতে পাইয়া গাড়ি থামান গেল। আমারই উপর খরিদের ভার পড়িল। ইতিপূর্বে কখনও একত্র থাকার সুযোগ (বা কুযোগ) না ঘটায়, সহচরগণ এমন ভুলটা করিয়া ফেলিলেন। একে ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহাতে সময়টা মধ্যাহ্ন, রৌদ্রটাও খুব প্রচণ্ড থাকায় পিপাসাটাও দস্তুর মতো প্রবল দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই দরদস্তুর না করিয়াই দুইটা ডাবের মুখ কাটাইয়া ফেলিলাম।

"আশ্চর্যের বিষয়—দুইটা ডাবের জল নিঃশেষে করিতে আমরা চারিজন জখম হইয়া পড়িলাম। জলের মিষ্টতা পাইয়া নেয়ার উপর লোভ পড়িল, তাহাও অতি প্রীতির সহিত ভক্ষণ করা গেল। পান ও ভক্ষণান্তে, সে দুর্লভ বস্তুর দর-দস্তুর করা ভদ্রোচিত হয় না। একটি কাঁদিতে পাঁচটি ডাব ছিল, তাহাও গাড়িতে তুলিয়া লওয়া গেল এবং তাহারা যে মূল্য চাহিল, তাহাই দেওয়া হইল; এক একটি ডাব প্রায় ছয় পয়সা করিয়া পড়িল। বোসজা বলিলেন, 'দর করলে বোধহয় চার পয়সা ক'রে পেতেন।'

"আমি বলিলাম—'দোহাই মশায়, ওই 'বোধহয়টার' কুহকে পড়বেন না, ওটা চিরকালই লোকের শান্তিভঙ্গ করে আসছে।' পরে পান, সুপারি চুন ও খয়ের খরিদ হইল। পানগুলি কপূরী পান, খয়ের খুব খাস্তা—একটু টিপিলেই ময়দার মতো হইয়া যায়।

"...হংকং পরিদর্শনটা পদব্রজে করিবারই পরামর্শ স্থির হইল—পোস্ট অফিসের পথ ধরা গেল। হংকং-এর রাস্তাগুলি তেমন প্রশস্ত নহে, পাহাড়ের উপর সেটা সম্ভবও নহে ; তবে পরিষ্কার, বড় রাস্তাগুলি দুইধারে ফুটপাত দিয়া আঁটা। ঘোড়ার বা গরুর গাড়ির গোলমাল নাই—রিক্সাই মানরক্ষা করিয়া থাকে। রাস্তায় একদিকে ব্যাংক, পোস্টাপিস, সওদাগরী অফিস, হোটেল প্রভৃতি সাহেবী সৌষ্ঠবে শোভা পাইতেছে, অপরদিকে চিনাদের দোকান। সেদিকটায় যেন কলকাতার

রাধাবাজার, চীনাবাজার, চাঁদনী ও মুরগিহাটার একীকরণ ঘটিয়াছে, কিন্তু পারিপাট্যে ও শিল্প সমাবেশে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"এটা পাহাড় হইলেও রামগিরি নয়, এখানে মেঘ থাকিলেও তাহারা দৌত্য করে না, সে ভার পোস্টাপিসের। ইহাদের উদরকে বিশ্বাস করিতে পারিলেই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। পথের ধারে পোস্টাপিস পাইয়া নিজেদের পেটের কথা তাহারই পেটে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করিয়া, ঝাড়া হাত-পা হইয়া বাজারে প্রবেশ করা গেল।

"হংকং-এর বাজারটি একটি প্রকাণ্ড পাকা ইমারত, দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় দুই বিঘা জমি আত্মসাৎ করিয়াছে। চারিদিকে সুউচ্চ গেট, মধ্যে তিনটি সুপ্রশস্ত বিভাগ। একটিতে কপি, আলু, বেগুন, মটরসুঁটি, শাক-সবজি ; একটিতে বিবিধ ফলমূল, অপরটিতে পিঁয়াজ, রসুন, আদা, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি মশলা—সেই প্রকাণ্ড বিভাগগুলি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

"এরূপ বিচিত্র ফলমূলের সমাবেশ ও প্রাচুর্য কুত্রাপি দেখি নাই। বঙ্গদেশে ও কাবুলের পরিচিত ফলের মধ্যে বেল, আতা দেখিলাম না। আঙুর, আপেল, নাসপাতি, ডালিম, লিচু, আনারস, শশা, কলা, জলপাই, তরমুজ প্রভৃতির প্রভৃতির সৌন্দর্যে বাজারের রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখি, এই সুদূর সমুদ্র-বক্ষে ক্ষুদ্র পাহাড়টিতে তরমুজগুলির মধ্যে আমাদের সাধের চাতুর্বর্ণের বীজ রক্ষিত হইতেছে। টেবিলের উপর কাটা তরমুজগুলি বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে—তাহাদের কোনটির মধ্যে সাদা রং, কোনটির লাল, কোনটির পীত, কোনটির বর্ণ সবুজ। সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের উপর মধুমক্ষিকার গুঞ্জন মধুর মজলিস বসিয়াছে।

"আমরা পাঁচআনায বড় বড় একশত লিচু খরিদ করিলাম। প্রাপ্ত মাত্রেণ আমাদের প্রিয় পঞ্চানন পরিচয় লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল ও গালভরা কণ্ঠে বলিল—'মশাই, মজঃফরপুরকে মাৎ করেছে।'

"ক্রেতাদের হস্তে মৎস্য মাংসাদি দেখিলাম, কিন্তু এত বড় বাজারটির মধ্যে তাহাদের নাম গন্ধও পাইলাম না। তখন অনুসন্ধানে জানিলাম—এই বাজারটির নিম্নতলে মৎস্য মাংসের বাজার।

"সোপান পথে মেচোহাটায় প্রবেশ করা গেল। যে অংশে মেচোহাটা সেটি যেন সমুদ্রগর্ভের শামিল। মাছের বাজারে মেয়ে-পুরুষের প্রবেশ ও প্রত্যাবর্তনের ভিড় দেখিলে রথের ভিড়ও পাতলা হইয়া পড়ে। সহস্র কণ্ঠের বেতালা চিৎকারে চৌষট্টি যোগিনীর যোগভঙ্গ হয়। তবে মেচুনিদের মাক্‌ড়ি, নথ বা অনন্ত নাড়ার বিভীষিকা ছিল না, কারণ বিক্রেতারা পুরুষ-মানুষ। তাহাদের সম্মুখে আবক্ষ-উচ্চ টেবিল ; টেবিলের উপর তিন-চারখানি ছোট বড় সুতীক্ষ্ণ ছোরা এবং টেবিলের উপর দাঁড়িপাল্লা আঁটা। নীচের বড় টবে মৎস্য রহিয়াছে, কেবল বাছা বাছা দুই চারিটি মাছ টেবিলের উপর থাকিয়া ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ছোরার সাহায্যে অতি সত্বর ও সহজে আঁশ ছাড়ান, মাছ কোটা, কাঁটা বাছিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া—দেখিলে অবাক হইতে হয়। খুব ছোট কাঁটাই, কেবল থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। মিরগেল মাছটাই মালে ও মূল্যে বড় দেখিলাম ; বোধ হইল, এ অঞ্চলে ওই মাছটাই স্বাদু ও প্রিয়।

"এই নিম্নতলের অপরার্ধ নানাপ্রকারের মাংস, পক্ষী ও ডিম্বে পরিপূর্ণ। এখানকার গৃহস্থেরা বটে 'মৃগমাংস পক্ষমাংস যেবা ইচ্ছা হয়' বলিয়া আগন্তুক অতিথিদের অনায়াসেই আপ্যায়িত করিতে পারেন। একপ্রান্তে দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহে টগবগ করিয়া গরম জল ফুটিতেছে। জীবন্ত কুক্কুট, হংস, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীর পা বাঁধিয়া তন্মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দু'এক মিনিট পরেই তাহাদের তুলিয়া লইয়া, অতি সহজে মুহূর্ত মধ্যে উপরের পালকশুদ্ধ ছালখানি তুলিয়া ফেলিয়া, পাখিগুলি ক্রেতাদের হাতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ—এক ফোঁটা রক্ত না বাজে নষ্ট হয়, সমস্তটুকু যাহাতে ক্রেতাদের পেটে পৌঁছায়, আর যাহাতে সহজে পরিষ্কারভাবে ছালটি ছড়ান হয়—এই দুই কারণে এই বীভৎস কাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এবং লজ্জার কথাও কম নহে যে, এমন সহজ উপায়টি—যাহা চিনাদের মগজে আসিয়াছে, রক্তবীজ বধের সময় তাহা দেবগুরু বৃহস্পতিরও বুদ্ধিতে আসে নাই।

"কতকগুলি কারণে পানের প্রয়োজনটা বড় তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা ভাবিতেছেন তাহা নহে—এই অকূল জলময় বাজ্যে প্রাণ হাতে করিয়া স্ফূর্তির ফিনকিটুকু পর্যন্ত কাহারও ছিল না। জাহাজে বমন-প্রবৃত্তিটা মধ্যে মধ্যে উদয় হইয়া একটি অস্বস্তি আনিয়া দেয়, তদ্ভিন্ন আজকাল গুড়ুক্ ও গল্পেই দিন গুজরান হইতেছিল ; এইরূপ ক্ষেত্রে পাটনাই রসনার রজন্ স্বরূপ। তৃতীয়ত, আমাদের মধ্যে দু'-একটি পানের পোকাও ছিলেন যাহা হউক, একটি ফুটপাতে দেখি, দুইটি চিনা পান বেচিতেছে।

"অতি লোলুপের ন্যায় তাহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া গেল এবং দরদস্তুর না করিয়াই এক ডজন পান সাজিয়া দিবার হুকুম দেওয়া হইল। তাহারা দুইটি তুলি বাহির করায়, পঞ্চানন বলিল—'মশাই এরা তুলি বাগায় কেন, চেহারা তুলবে নাকি?'

মজুমদার ভায়া বলিলেন—'চাটুজ্যেকে একটু তফাৎ কর।' পরে দেখি, তুলির সাহায্যে পানে চুন-খয়েবের প্রলেপ লাগাইয়া প্রত্যেক পানটিতে পরিষ্কারভাবে ছাড়ানো একটি করিয়া আস্ত সুপারি দিয়া সুন্দর খিলি করিয়া দিল। ভাবিলাম, এ খিলি চর্বণ করিতে হইলে দন্ত কয়টি আর চিন পর্যন্ত পৌঁছবে না। কার্যকালে কিন্তু কোনো কষ্টই অনুভব করিলাম না ; এতই মোলায়েম যে, দন্তের নিকট তাহারা খুবই বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করিল, অথচ সুপারিগুলি কাঁচাও নহে ; চিনের হুনুর বটে! উত্তর চিনে পান পাওয়া যাইবে না, সুতরাং উদ্‌যাপনের উপযোগী আয়োজন লওয়া হইল। প্রত্যেক পানটি এক পয়সা হিসাবেই পড়িল।"

কেদারনাথের হংকং-এর বাজারের বর্ণনা থেকেও আকর্ষণীয় শতবর্ষ আগের দীর্ঘদেহী শিখদের হংকং-এ উপস্থিতি। এবং সেই সঙ্গে জবরখবর, যাঁরা ইংরেজের হয়ে চিনের ভূমিতে যুদ্ধ করে প্রাণ দেবার জন্যে বিশ শতকের গোড়ায় বিদেশে যেতেন তাঁদের মাসিক মাইনে এগারো টাকা।

কেদারনাথ লিখেছেন ; "সঙ্গীদের 'দুর্গা' বলিয়া বিদায় দিয়া, একটু ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলাম। সরকারি, আপিস, ব্যাংক, পুলিস, সর্বত্রই পাঞ্জবী শিখপ্রহরী দেখিলাম। প্রত্যেক চৌমাথাতে শিখেরাই পাহারা দিতেছে। একজনের সহিত কথা কহিয়া জানিলাম, তাহারা হংকং অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসিয়াছে, এবং ক্রমশ স্ত্রী-পুত্রও আনিয়াছে। এতাবৎ বিশেষ সম্মানের সহিত ইংরাজ বাহাদুর ২৫/৩০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ২৫০/৩০০, এমনকি তাহা অপেক্ষা অধিক বেতন দিয়াও তাহাদের রাখিয়াছেন।

"হংকং-এর শিখ-সৈন্য ইংরাজ সরকারের একটি স্পর্ধার সামগ্রী। এরূপ সুনির্বাচিত সুদীর্ঘ সুন্দরকায় ও বলিষ্ঠ পুরুষদের সমাবেশে সম্পূর্ণ রেজিমেন্ট ও পুলিস গঠন করা সহজসাধ্য নহে। ইহাদের পরিচ্ছদাদিও সুন্দর ও সম্মানসূচক। রাজপথের স্থানে স্থানে ইহারা যেন এক একটি সজীব সুদৃশ্য স্তম্ভস্বরূপ শোভা পাইতেছে।

"জনৈক শিখ-সৈনিকের সহিত আলাপ হইল ; সৈনিকটি বলিল—'আমাদের এতাবৎ যা একটু কদর ও সম্মান ছিল—চিন অভিযান, কালস্বরূপ হইয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত দিল। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে কোন ভারত-সৈন্য আসে নাই,—আমরাই সর্বাগ্রে আসিয়াছি এবং এই রাজ্য জয় ও সরকার বাহাদুরের হুকুম পালন করিয়াছি—সে জন্য সম্মান ও আদর পাইয়াছি। এখন দেখিতেছি, হিন্দুস্থান নিরন্ন হইয়াছে ; আজ কিনা সহস্র ভারত-সৈন্য, হংকংকে অর্ধপথে ফেলিয়া, সুদূর উত্তর চিনে ১০/১২ টাকা বেতনে প্রাণ দিতে চলিয়াছে! আর কি সরকার বাহাদুর আমাদের এই উচ্চ বেতন,—প্রতি তিন বৎসরে ৩/৪ শত মুদ্রা ইনাম এবং দেশে যাইবার জন্য তিন মাস করিয়া ছুটি ও পাথেয় দিয়া পোষণ করিবেন?

"এ যাবৎ আমাদের, ইংরাজ-সৈন্যের সহিত প্রায় একই পর্যায়ে ও ব্যবস্থায় রাখা হইয়াছে। আর কি আমরা তাহা আশা করিতে পারি?' ইত্যাদি। লোকটির প্রত্যেকে কথায় হতাশা ও অভিমান প্রকাশ

পাইতেছিল।

"মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া কথা সংক্ষেপে করিবার জন্য বলিলাম—'অনুমানের উপর এতটা ভয় পাইতেছেন কেন?' পরে—সেলামের আদান-প্রদান সত্বর শেষ করিয়া বিদায় লইলাম।

"দেখিলাম, হংকং-এর শহরে বিস্তর বোম্বাই অঞ্চলের লোক, সিন্ধুদেশবাসী ও পাঞ্জাবী, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীর বিভব-বিভাগটা যেন সম্মুখে সমুদ্র ও পশ্চাতে পর্বতের চাপে জড়সড় হইয়া এক বর্গমাইলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পাঞ্জাবিরা মুদিখানার দোকানও খুলিয়াছে ;—বড়ি, বেসন, পাঁপড়, পকৌড়ি—নাগাইত চানাচুর—সবই বর্তমান।"

হংকং থেকে ক্লাইভ জাহাজের সরাসরি উত্তর চিনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু টাইফুনের দাপটে জাহাজে কয়লার বেজায় টানাটানি। তাই চীফু বন্দরে নঙ্গর করতে হল। কেদারনাথের এই পর্বের বন্দর-বর্ণনাটি ভালো।

"পাড়িটা খুব লম্বা হলেও হংকং ছাড়ার পর আমাদের সরাসরি উত্তর চিনে—অর্থাৎ নির্দিষ্ট মোকামে পৌঁছবার কথা ছিল। টাইফুন—মাঝে পড়িয়া প্রাণটা লইল না বটে, কিন্তু ১০/১২ ঘণ্টার কয়লা লইয়া যায় ; জান বাঁচিল, কিন্তু হিসাবের কয়লায় টান ধরিল। কাজেই তাহার জন্য জাহাজকে চীফু বন্দরে নঙ্গর করিতে হইল। বন্দরটি শহুরে সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের বেড়া দিয়া ঘেরা নয় ; জাহাজের ভিড় কম। Battle-ship-এর বালাই নাই man-of-war-এর মোড়লীও দেখিলাম না। যেন একটি শান্ত পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সময়টাও সন্ধ্যার প্রাক্কাল ছিল—বেশ উপভোগ্য বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

কয়েকখানি ছোট গরিবী হালের ডিঙ্গি, আর দু-একখানি ছোট লঞ্চ, আমাদের জাহাজের চারিদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডিঙ্গিগুলিতে বালক ও যুবকেরা পিচ, অ্যাপেল, আঙুর, চিনের বাদাম প্রভৃতি ফল আর দেশি মদ বেচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

"পিচগুলি ভারতের পিচ অপেক্ষা তিনগুণ বড়, বর্ণও চিত্তাকর্ষক। অ্যাপেলগুলি ছোট—টকটকে লাল, যেন মোমের খেলনা, স্বাদু ও সুমিষ্ট। দশ পয়সায় (ten cent) পঁচিশটি হিসাবে অনেকেই কিনিল। দেশি মদ দশ পয়সায় এক বোতল (pint)—আবদুল্লার দল ঝুঁকিয়া পড়িল। চীফ সাহেব হুকুম দিলেন—কেহ এক বোতলের বেশি কিনিতে পারিবে না।

"বিক্রেতারা সমুদ্রউপকূলবর্তী জঙ্গলি বা অসভ্য চিনে বলিয়াই বোধ হইল—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উলঙ্গ, কাহারো কাহারো নামমাত্র লেংটি আছে। মাল বেচা শেষ হইলে তাহারা ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল—'সমুদ্রে টাকা পয়সা ফ্যালো—আমরা তোমাদের সাক্ষাতেই ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়া দেখাইতেছি, অর্থাৎ তুলিয়া লইতেছি।'

"তামাসা দেখিবার জন্য অনেকেই কিছু কিছু ফেলিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়া দেখাইতে লাগিল ও নিজের নিজের ডিঙ্গিতে সেগুলি ফেলিতে লাগিল। হায়-রে পয়সা! যাহার জন্য আজ আমরা সমুদ্রে ভাসিতেছি, তাহার জন্য এই বালকেরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছে। জগতে সর্বত্রই তোমার জয়।

"অন্যান্য বন্দরেও এই পয়সা তোলার অভিনয় ছিল ; কিন্তু শহর দেখা আর পত্র পোস্ট করার ঝোঁকটা মাত্রায় বেশি থাকায়, এটা দেখার তেমন অবসর হয় নাই। আশ্চর্য বটে—ক্ষুদ্র দুয়ানিটি পর্যন্ত তাহাদের এড়াইয়া যাইতে পারে না।

যাহারা লঞ্চে আসিয়াছিল, তাহারা চিফুর সওদাগর শ্রেণির লোক, বেশ সভ্য, তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদও সুন্দর। লঞ্চে বিবিধ বিলাস-সামগ্রী সাবান, বাতি, ছবি, সিগারেট, চা, চিনামাটির বাসন, চায়ের সেট প্রভৃতি তো ছিলই—কিন্তু তাহাদের পণ্যের মধ্যে রেশমী বস্ত্রই প্রধান—নানা রংয়ের রেশমের থান, রুমাল, সুন্দর কারুকার্য করা টেবিল দর্পণ প্রভৃতির আচ্ছাদন ইত্যাদি ইত্যাদি। সস্তাও বেশ ;—যে রুমাল কলিকাতায় পাঁচ সিকে দেড় টাকা, এখানে অনেকেই তাহা চার পাঁচ আনা করিয়া কিনিলেন।

"সাধারণ ব্যবহারের বা কর্মস্থান (আপিসে) ব্যবহারের সুট প্রস্তুত করিবার যে রেশম দেখিলাম, তাহা ash-colour-এর (ছায়ের রংয়ের)। চার পাঁচ টাকা হইতে দশ এগারো টাকার এক থান পাওয়া যায়। সাটিন জিনের মতো খোল, সার্জ বা রিবের বুনোন, খুব ট্যাকসই। এক থানে একটি সম্পূর্ণ সুট, অথবা দুইটি কোট ও একটি ওয়েস্ট কোট হয়। সুটের জন্য চার পাঁচ টাকা করিয়া থান আমরা অনেকেই লইলাম। কারণ পরিচ্ছদের আবশ্যকটা যে আমাদের কতখানি, তাহা যতই অগ্রসর হইতে ছিলাম, ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে ছিল ও পীড়া দিতেছিল।"

সেকালের চিনের ওপর ইউরোপীয়দের অত্যাচারের বর্ণনা কেদারনাথ সরকারি কর্মী হিসেবে বেশ সাহস করেই দিয়েছেন। জাহাজ তখন চিন সমুদ্রের হরিদ্রাংশ পেরিয়ে পিচিলি উপসাগরের প্রবেশ পথের কিঞ্চিৎ উত্তরে। ক্ষুদ্র দ্বীপটির নাম উই-হাই-উই।

"এটি ইংরাজের ইজারা-মহল, কি চিনের নিকট হইতে খেসারত (Indemnity) আদায়ের চাপ দখল, তাহা নাকি খোলসা কেহ জানেন না। তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় জৈষ্ঠ্য সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে—প্রশান্ত মহাসাগর শীর্ষক প্রবন্ধে—চীন-জাপান যুদ্ধে পরাজিত চিনের ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের সন্ধির সংস্রবে ও তাহার পরবর্তী তিন বৎসর মধ্যে বিবিধ ঘটনার অন্যতম রূপে, উই-হাই-উই সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়াছেন—'ইংরাজও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া উই-হাই-উই দখল করিয়া তথায় ব্রিটিশ পতাকা উড়াইলেন।'

তাহার পরেই জার্মান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ—জার্মানিও দুইজন মিশনারী হত্যার অজুহাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গায়ের জোরে কিয়াও-চাও বন্দরে ও সমগ্র শ্যান-টং প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

কোথাও কোনো দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিলে সভ্য শক্তিশালী প্রবল জাতিরা অনুগ্রহ করিয়া—নয় সালিশীরূপে, না হয় সাক্ষীরূপে, অযাচিত ভাবেই, শান্তিরক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। পরে কষ্ট স্বীকার, সময়

নষ্ট প্রভৃতি খাতে কিঞ্চিৎ লাভ বা খরচা আদায় না করিয়া ফেরেন না। ইহার নাকি একটা মস্ত উপকারিতা আছে ;—কোনো যুদ্ধমান পক্ষ বে-আইনী বা অন্যায় কিছু করিতে সাহস পান না। এই দয়ার কাজের জন্য পাঁচ হাজার মাইলের পাল্লা মারা অল্প উদারতা নহে, ত্যাগস্বীকারটাও ততোধিক।

"চিন বোধহয় মিনতি জানাইয়া জার্মানি হইতে মিশনারী আমদানি করে নাই। যাহা হউক, এইসব ব্যাপারে কাশীর এক সম্প্রদায় দালালদের কথা মনে পড়ে। কেহ কাশীর চকে কোনো দোকানে কিছু কিনিতেছেন তাঁহার অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে কোনো দালাল, দোকানদারকে একবার দেখা দিয়া বা একটা সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। তাহার অর্থ আমার প্রাপ্যটা যেন তোলা থাকে। দোকানদারও তাহা তামিল করিতে বাধ্য। তবে দোকানদার দালালিটা নিজের ঘর হইতে দেয় না—খরিদ্দারদের মুণ্ডেই চাপাইয়া নয়।—আর এসব ক্ষেত্রে দুর্বলকেই সব চাপটা সহিতে হয়, —প্রভেদ এই।"

'চিনযাত্রী' বইটির শেষ চিনের মাটিতে কেদারকাহিনীর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে। শেষটি এইরকম : 'জল ছাড়িয়া উঠিলাম।...বিশ গজ তফাতেই কমিসেরিয়েট বা রসদ গুদাম ছিল। উক্ত গুদামের ভারপ্রাপ্ত একটি পার্শী ভদ্রলোক এজেন্ট হিসেবে পরিচারকবৃন্দ লইয়া তথায় থাকিতেন। তিনি লোক ও লণ্ঠনসহ উপস্থিত হইয়া, মহাসমাদরে সকলকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। এতদিনে জাহাজি মাল ঘরে উঠিল।'

চিনযাত্রী

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

আমরা যত বড় দাসত্ব করি না কেন, হনুমানকে হারাইতে পারিব না। দাসত্ব করিয়া তিনি চির-অমর হইলেন, এবং ত্রিভুবন-জোড়া যশের অধিকারী হইয়া রহিলেন ; ঋষি বাল্মীকি তাঁহার গুণ-গানে সহস্র-মুখ। উদার লোকই আলাদা ; হনুমানকে তিনি দেবতা বানিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাদের দগ্ধভাগ্যে ডি-এল রায় মহাশয়-বর্ণিত ঋষিরাই জুটিলেন। জন্মেছিলাম মানুষ, বানিয়ে দিলেন জানোয়ার ; কারণ--- দাসত্ব করি। কেন, আর কি সুখে যে করি, তাহা ঋষিরা যোগের সাহায্যে না খুঁজিয়া, গোলযোগের দ্বারাই বুঝিয়া রাখিলেন।

যাক, হনুমান মরিয়া হইয়া স্বইচ্ছায় ও স্ববলে, সাগরপারে পাড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার সংসার ছিল কি না জানি না ; অন্ততঃ থাকার প্রমাণাভাব। আমাকে অনিচ্ছায় ও অগত্যা, পরের বলে পা বাড়াইতে হইয়াছিল। তাহা হইলেও, আমার যে নিজের বলের কোন আবশ্যকই হয় নাই, এমন নহে। তবে তাহার প্রকাশ্য নজির করা কঠিন ; তাহা মনস্তত্ত্বজ্ঞের মারফতই প্রাপ্তব্য। কতকটা রবিবাবুর "যেতে নাহি দিব" কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালীর হাতে কাঁদুনীর ভূমিকা শেষ হইতে জানে না ; অতএব সরাসরি সুরু করাই ভাল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চীনে "বক্সার ট্রব্‌ল্‌" বা "বক্সার হাঙ্গামা" বলিয়া একটা গোলমাল উপস্থিত হয়। 'বক্সার' নামে চীনে একটা উগ্রদল দেখা দেয়। "ফরেনার্‌" বা বিদেশীয়দের সহযোগিতা বর্জনই বোধ হয় তাহাদের মূল নীতি ছিল। যে সব চীনেরা বিদেশীয়দের চাকুরী করিত, তাহাদের সাহায্য করিত বা সংস্রবে থাকিত, আর যাহারা বিদেশী

পাদ্রিদের উপদেশে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিতেছিল, বা করিয়াছিল, বক্সারদের বিষ-দৃষ্টিটা সেই সব চীনেদের উপরই বিশেষ করিয়া পড়ে। নিষেধ ও ভয়-প্রদর্শন দ্বারা মনোমত ফল লাভ না হওয়ায়, ক্রমে তাহারা সংহারমূর্তি ধারণ করে ও সেই সব চীনেদের ঝাড়ে-মূলে ধ্বংসকার্যে ব্রতী হয়। ন্যায়-ধর্ম-পরায়ণ পাদ্রিরা, ও অন্যান্য বিদেশীয়েরা, সেই সব আশ্রিত ও বিপন্ন চীনেদের রক্ষার্থে প্রয়াস পান। উন্মত্ত বক্সারেরা তখন ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁদেরও আক্রমণ করে ও খুন্ জখম আরম্ভ করিয়া দেয়।

ক্ষিপ্তেরা তখন ভাবে নাই যে—'এ বারতা যবে পাইবেন রক্ষোনাথ,' তখন ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে ও কতদূর গড়াইবে। ফল তাহাই হইল। একটা হাসির গান আছে

"কামিখ্যেতে কাক্ মরেছে, বৃন্দাবনে হাহাকার।"

এ-ক্ষেত্রে সেটা কান্নার গান হইয়া, এক মুহূর্তে সমগ্র সভ্য জগতের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা জাগাইয়া দিল। শক্তিশালীদের মধ্যে সাজসাজ সাড়া পড়িয়া গেল। তারির ঝাপ্টায়, সমুদ্র-যাত্রার পাপটা, আমাদেরও জড়াইয়া ধরিল। সেই অভিযানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মরা মজ্লিসে, অন্যান্যদের সঙ্গে আমারও ডাক্ পড়িয়াছিল।

বিদায়ের বিবরণটা কেবল ব্যথায় ভরা, সেটা বাদ দেওয়াই ভাল। সেদিনই প্রাতে পাখী আনন্দে গাইয়া থাকিবে, ফুল সহাস্যে ফুটিয়া থাকিবে, বায়ু সুমন্দ বহিয়া থাকিবে, শিশু সুমধুর হাসিয়া থাকিবে, কবি কবিতা লিখিয়া থাকিবেন; কিন্তু আমার প্রাণে, মনে বা নয়নে, তাহার কোন সাড়াই পৌঁছে নাই। তখন আমি কেবল উদাস-প্রাণে একান্ত অনুভব করিতেছিলাম,—আমার ক্ষুদ্র গ্রামের ও আমার দেশের, অতি তুচ্ছ তৃণটিও আমার কতটা আপনার। আর এতটা দীর্ঘদিনের তাচ্ছিল্যের জন্য, মনে মনে তাহাদের নিকট অবনত হইয়া ক্ষমা চাহিতেছিলাম। এতটা চেতন অচেতন, ক্ষুদ্র বৃহৎ, আদৃত অনাদৃত ও অবজ্ঞাত যে এক মুহূর্তে আমারি অংশরূপে আমার মধ্যে অভিন্ন হইয়া দেখা দিতে পারে, তাহা কখনও এবং তখনও ভাবিতে পারি নাই।

আমার সুদূর যাত্রার সম্বলের সহিত একটু দেশের মাটি (গঙ্গামৃত্তিকা) আর একখানি গীতা, প্রিয় ও পরম সুহৃদের স্থান অধিকার করিল।

১৯০২ খৃস্টাব্দের ৩রা জুলাই বেলা আটটার সময়, আমাদের লইয়া "ক্লাইভ" নামক সরকারী জাহাজ খিদিরপুর ডক্ ছাড়িল। বারকয়েক দুর্গানাম স্মরণ করিলাম ও বঙ্গভূমিকে প্রণাম করিয়া বললাম—'মা, আবার যেন তোমার কোলে ফিরে আসতে পারি।' চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ কোনদিকেই দৃষ্টি ছিল না। পরে দেখি—কি নিকটের কি দূরের, সবটাই নূতন।

জাহাজের সহস্র সরঞ্জাম, কাপ্তেন সারেং মাল্লা মাস্তুল, অচেনা যাত্রিসঙ্ঘ, হরেক রকম পোশাক-পরিচ্ছদ, জাহাজের গতিবিধি ;—সহসা সকলকে আকৃষ্ট করিয়া, বিদায়-বেদনা হইতে মুক্তি দিয়াছে। সকলেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। জাহাজ মন্থরগমনে চলিয়াছে।

মানুষের বেশীক্ষণ কিছুই ভাল লাগে না বা সয় না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া সকলেই দ্রব্যান্তর খুঁজিতে লাগিলাম। সকলেই নিজের জাত খোঁজে,—দল বাঁধিতে চায়,—এক হইতে চায়। জগতের অণু পরমাণুও দানা বাঁধিবার জন্য অনুক্ষণ চঞ্চল। দেখিতে দেখিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যাত্রীগুলি পাঁচ সাত, কোথাও বা দশ বারটি করিয়া জমাট্ বাঁধিতে লাগিল। তখন পরস্পরের নাম-ধাম পরিচয় ও আলাপের মধ্য দিয়া প্রত্যেক থাকে ধীরে ধীরে আনন্দ-উৎসাহ দেখা দিল। সকলেই তখন বুঝিবার অবকাশ পাইল,—এ পথে আমিই মাত্র একা নহি ; সঙ্গে সঙ্গে একটু সাহসও অনুভব করিল। পশ্চাতের চিন্তাটা অনেকখানি পাতলা হইয়া গেল।

দেখি, নানা পক্ষী এক বৃক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোকই হাজির। বিভিন্ন সহর হইতে আমরা পাঁচটি বাঙ্গালীও আসিয়া উপস্থিত। তন্মধ্যে চারিটি, পরস্পরের কাছে পূর্ব হইতেই পরিচিত।

অপরিচিতটি রেঙ্গুন হইতে রওনা হইয়া হাজির হইয়াছেন। এই পাঁচজনই পাকা কুলীন, (পার্মানেন্ট্ চাকুরে) ; তদতিরিক্ত দুইটি উমেদার

যুবকও চলিয়াছিলেন। হায় রে নোক্‌রির নেশা, যার সন্ধানে সাত-সমুদ্র-পারেও ভদ্রসন্তানেরা ছোটে! অতএব সর্বসমেত আমরা হলাম সাতটি!

এটা ওটা দেখায়, ও এ-কথা ও-কথায় দিনটা শেষ হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে পূর্ব কূলের বনরাজি দেখিয়া কাহারও-বা,—'নবকুমার' কোনখানটায় আসিয়া পড়িয়াছিল এবং 'কপালকুণ্ডলা'ই বা এই ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে কি ভাবে বিচরণ করিত, এ কথাও উদয় হইল; কেহ-বা—'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য—' ইত্যাদি আওড়াইতে ভুলিলেন না। কিন্তু আলো ত কেবল নিজে নেবে না, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা জিনিস-দেখিয়া ভুলিয়া থাকিবার উপায়টাও নিবাইয়া দিয়া যায়। তখন যেটা প্রবল বৈচিত্র্যের মধ্যে চাপা পড়িয়া থাকে, সেটাই মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহাই ঘটিল।

একটু এদিক ওদিক করিয়া সকলেই নীরব ও বিষণ্নমুখে, শ্রান্ত শরীরে—নিজ নিজ ভাবনা বেদনা লইয়া শয্যা লইলাম। সারাদিনের সঞ্চিত অবসন্নতা এখন নিবিড় হইয়া, নিদ্রার সহায় হইল ও সত্বরই চক্ষের যবনিকা টানিয়া দিয়া, সেদিনকার পালা শেষ করিয়া দিল।

২

প্রাতে যেন অন্য জগতে জাগিলাম। সে জল নাই, সে জনপদ নাই, সে গাছ-পালা পল্লী-পুলিন নাই ; সে মাটির-জগৎ সুদূর হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল দূরবিস্তৃত নীলাম্বুরাশি—আর আমরা একখানি লোহা-বাঁধান কাঠের কেল্লায় ভাসিয়া চলিয়াছি।

তাড়াতাড়ি স্নান আর চা-পান সারিয়া, উপরের ডেকে গিয়া দেখি, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন— ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে। নাবিকেরা এইমাত্র সব মাজিয়া-ঘসিয়া ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে ; যেন কোন দেবতার আবাহন উৎসব আছে। তাহার উপর প্রাতঃ-সূর্যের কিরণপাতে সবটাই সমুজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দল অপার (উপরের) ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাক্ বাঁধিয়া বেড়াইতে বা এক এক স্থানে জমায়েত হইতে আরম্ভ করিলেন। কাল যে-যার দল খুঁজিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছিল, আজ ক্রমে এ-দলে ও-দলে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। কেবল একটি দল সদর্পে ও সশব্দে, ডেকের এ-মুড়ো ও-মুড়ো পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতেই এক একখানি নভেল্—কাহারও নূতন কাহারও পুরাতন—কখনও খোলেন্ কখনও মোড়েন—ইঁহারা কয়জনই ইউরেশিয়ান এবং প্রায় সকলেই ডাক্ বিভাগের লোক।

সমুদ্র-যাত্রী ভদ্রলোকদের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের সহিত একখানি করিয়া 'ডেক্-চেয়ার্' বা হাল্‌কা আরাম-চেয়ার লইয়া যাওয়া উচিত। তাহাতে বিশেষ সুবিধা ও আরাম পাওয়া যায়। নচেৎ সরকারী বেঞ্চ (যদি খালি পাওয়া যায়) না হয় হরদম্ বেড়ানো, এই দুইটির উপরই নির্ভর করিতে হয়। আমাদের 'নেটিভ্ মেজারিটির' জাহাজে, পাটি বা সতরঞ্চ বিছাইবার বারণ ছিল না, তাই রক্ষা। যাহা হউক, অভিজ্ঞেরা

ডেক্-চেয়ার্ লইয়া যাইতে ভুলেন নাই। তাহাতে বসিয়া সমুদ্র-দর্শন গল্প-গুজব, লিখন-পঠন, নাগাইত নিদ্রা পর্যন্ত চলে। যার যা, এ পথের ইহা একটি অত্যাবশ্যক আসবাব।

আমরা বাঙ্গালী কয়টি যেন ছুটির দিনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; সকলেরই বরযাত্রীর বেশ। মিহি আসবাবে দেহ ও ট্রঙ্ক্ বোঝাই ;কাহারও দু একটা পুরাতন প্যান্ট্ থাকিতে পারে। দেখিলে বোধ হয় যেন, গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্বে, মজলিস্-মুগ্ধকর কাপড়-কোঁচানর ধুম্ পড়িয়া যাইবে এবং খাম্বাজের মহলা চলিবে। সঙ্গে এক জোড়া করিয়া তাস থাকিলেই যাত্রাটা সর্ব-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইত।

সৌষ্ঠব রক্ষা হউক্ বা না হউক, সেটা যে বিশেষ কাজে লাগিত, তাহা দু-চার দিন মধ্যেই বেশ বোঝা গেল। হাজারখানেক যাত্রীর মধ্যে, শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত ভদ্রের সংখ্যা শতাধিক ছিল না ; ফলোয়ার্দের অর্থাৎ সাহায্যকারী শ্রমিকদের সংখ্যাই অধিক ছিল দেখি, তাহারাই বেশ তাস-তামাক গান-গল্পে স্ফূর্তিতে চলিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ, মধ্য-ভারত ও বোম্বায়ের বাবুরাও তাস পাড়িয়াছেন ; নচেৎ বিনা কাজে বাস্তবিকই দীর্ঘদিন কাটান কঠিন। বিধাতার কৃপায় বাক্যই আমাদের প্রধান সম্বল। এখন তাহা কাজে লাগিতে লাগিল। বাক্যের ব্যবহারেই, অর্থাৎ বাজে কথায়, দিন কাটিতে লাগিল।

ক্রমে পুস্তকের খোঁজ পড়িল,—কাহারও কাছে কিছু আছে কি না। আমার গীতাখানি, এ পঞ্চভূতের দরবারে পেশ করিতে সাহস হইল না ; কারণ, সে-সময়ে ও সে-সভায় তাহা স্বাদু ও গ্রাহ্য ত হইতই না, বরং তাহার সমুদ্র-সমাধিরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

আমাদের মধ্যে একজন 'দত্ত' ছিলেন, তিনি লোক-সঙ্গ বড় একটা ভালবাসিতেন না ; আহারের আসর ভিন্ন তাঁহাকে একটু তফাতে তফাতেই থাকিতে দেখিতাম। তাঁহার হাতে একখানি বই দেখিয়া, সাগ্রহে উঁকি মারিয়া দেখি—'ট্রিগ্নোমেট্রি'! কি পাপ! হতাশ ত হইলামই, তদতিরিক্ত অবাক্ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম—এমন বেসুরো লোকও

দুনিয়ায় আছে। 'সিজার্' যুদ্ধক্ষেত্রেই, অবকাশ সময়ে 'গ্রামার' লিখিয়াছিলেন, ইনিও দেখিতেছি সেইরূপ একটা অদ্ভুত কিছু করিতে চলিয়াছেন।

আমাদের রেঙ্গুন-সমাগত বাঙ্গালী বাবুটি ছিলেন 'চট্টোপাধ্যায়'। তাঁহাকে সকলে 'চাটুয্যে' বলিয়াই ডাকিতাম। তাঁহার একটু পরিচয় আবশ্যক হইবে ; কারণ তিনিই আমাদের এই বিপদ্-সঙ্কুল পথে, ভাবনা-চিন্তার দিনে, দুর্ভর সময় কাটাইবার পরম সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন,—বা 'মুশকিল আসান' ছিলেন।

বয়স ত্রিশ বত্রিশ, দেহ হৃষ্টপুষ্ট, বর্ণ এমনই 'কষ্টি-কাল' যে নয়নসুকের ধুতিতে তাহা ঢাকিত না ; চক্ষু দুইটি স্বভাবতই ঈষৎ লোহিতাভ, সহজ বিশ্বাসী, খুব সপ্রতিভ, বেশ খোলসা লোক, এবং বাঙ্গালীর বদ্‌নামের উপযুক্ত ভীতু।

আমাদের পুস্তকের প্রয়োজনটা, 'কেন,—কি হবে?' প্রভৃতি প্রশ্নের পর বুঝিয়া 'আমি দিচ্চি' বলিয়াই একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিয়দংশ, অর্থাৎ অরণ্যকাণ্ডের মাঝামাঝি হইতে লঙ্কাকাণ্ডের কতকটা এবং ঐ হালেরই, আধাআধি তৈলসিক্ত একখানি দাশরথি রায়ের পাঁচালী আনিয়া দিলেন। দেখিয়া, কেহ হাসিলেন, কেহ বাহবা দিলেন ; আমি কিন্তু ভাবিলাম—'একজন খাঁটি বাঙ্গালী পাইয়াছি, এখনও ভেজাল ঢোকে নাই।' পরে,—মেরি করেলির্ একখানি 'টেম্পোর‍্যাল পাওয়ার্'ও হস্তগত হয় ; কি সূত্রে তাহা ঠিক স্মরণ নাই। যাহা হউক, এই খোরাকেই আমাদের সমুদ্র-সফর শেষ করিতে হয়।

৩

বঙ্গোপসাগরের বুকে ঝাঁপ দিয়া পর্যন্ত ভয়, বিস্ময় ও আগ্রহ, এই ত্র্যহস্পর্শ লইয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম। যাঁহার যিনি উপাস্য, এতদিন পরে সকলের নিকটই তাঁহাদের জোর্ ডাক্ পড়িয়াছিল। বিপদই মানুষের একমাত্র চাবুক ; সেটা না থাকিলে বিশ্বটা যে কি এক অদ্ভুত মাংসপিণ্ড বহন করিত তাহা বলা যায় না।

সেদিন সকলের সকল কাজের মধ্যে একটা সত্যের সুর সর্বক্ষণই সজাগ ছিল। আমার তখন মনে কি মুখে ঠিক্ স্মরণ নাই, অতি দ্রুত দুর্গা নামের তরঙ্গ চলিতেছিল। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে, (লোকা ধোপা), শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রার পালা শুনাইয়া আমার হৃদয়ে দুর্গানামের বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল। জগতে কে যে কোন্ সূত্রে কাহার গুরু, তাহা বলা কঠিন।

এখন আমরা বাস্তবিকই—'জল, মেঘ ও বায়ু রাজ্যে' প্রবেশ করিয়াছি। সে অসীম বিশালত্বের যে দিকেই চাই, সবটাই—ভয় বিস্ময়ের দৃশ্য। সে উত্তাল তরঙ্গ দেখিলে, প্রলয়ের প্রারম্ভ বলিয়া মনে হয়। ভীষণ বাত্যাতাড়িত বিজন অরণ্য-শঙ্খ, সে অরণ্য শূন্য দেশে সর্বদাই চলিয়াছে।

পরদিনের প্রভাত হৃদয়ে যেন চিরদিনের অন্ধকার ঘোষণা করিয়া দেখা দিল। চক্ষু চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সম্মুখে যেন কালের ভীষণ ছায়া দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই ঘন কৃষ্ণ-ছায়ার কবলে আসিয়া পড়িলাম। ইনিই সেই স্বনাম-ধন্য 'কালাপাণি'। রূপ দেখিয়া ভাবিলাম,—নামটি সার্থক বটে! যেমনি কাল, তেমনি গাঢ় ও দুর্গন্ধময় ; আবার গর্জন, আস্ফালন ও আলোড়ন ততোধিক ; নির্বাসনের নিখুঁত স্থান বটে! সে রংয়ের সামনে আমাদের চাটুয্যে ফিকে হইয়া গেল। সে সময়ে অতি-বড় নির্ভীকের মুখেও হাসি-তামাসার অবকাশ ছিল না। তুষারাবৃত পর্বতসদৃশ ফেন-মুখী ঊর্মির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া যুগবৎ মনে হইল যেন,

শক্তিসঙ্গিনী ডাকিনীর দল অট্টহাস্যে দানব-দলনে ছুটিয়াছে। রায়-গুণাকরের—

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে—আঁচল ধুলায় পড়ে,
আলু থালু কবরী বন্ধন।"—

যেন মূর্তি ধরিয়াছে।

জাহাজ ভয়ঙ্কর দুলিতে লাগিল ; সকলকেই চঞ্চল ও শশব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছু না ধরিয়া, বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন সময় চাটুয্যে, নিতান্ত ভয়াকুলভাবে ও কাতরকণ্ঠে 'প্রেস্ক্রাইব' করিলেন—'সকলে হনুমানকে স্মরণ করুন।' প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ শুনিয়া, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ভয় ত ভাগিলই, একজন হাসির হিড়িকে পড়িয়াই গেল।

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত দেখিতেছিলাম, ফিরিঙ্গী কয়জন ফুরসৎ মত ডেকের উপর পায়চারি করেন। তাঁদের মধ্যে একটির ফুরসৎ, অফুরসৎ ছিল না, অপেক্ষাকৃত সশব্দে ও দ্রুত তিনি সর্বক্ষণই ঘুরিতেন। সঙ্গে সঙ্গে নভেল পড়া ও মাঝে মাঝে টক্কর খাওয়াও চলিত। আমার হাতে 'টেম্পোর্যাল্ পাওয়ার' দেখিয়া, হঠাৎ একদিন তাঁর গতিরোধ হয় ও দুচার বাৎচিৎ করিয়া ফেলেন। সেই সময়, উপদেশচ্ছলে 'সি-সিক্‌নেস্' এড়াইবার একটু টোটকাও বলিয়া দেন, যথা—'জাহাজের উপর সর্বদা বেড়াবে. কদাচ বসে থাকবে না।' অর্থাৎ Nothing like leather !

চতুর্থ দিনে মিস্টারটিকে নিত্যকর্মে গরহাজির দেখিয়া, অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি Sea-sickness-এ শয্যা লইয়াছেন ; রোজাকে ভূতে পাইয়াছে, কালাপাণির দোলায়, ঝোলায় (হ্যামকে) শুইয়াছেন!

পরদিনও সেই এক ভাবই চলিতেছিল। ক্রমে, অনেকেরই সি-সিক্‌নেস্ দেখা দিল। রোগটার দৃশ্যও যেমন কদর্য, ভোগটাও তেমনি কষ্টকর,—আগাগোড়াই ন্যক্কারজনক। ভালর মধ্যে বাঙ্গালীদের কাছে তখনও সে ঘেঁসে নাই।

সহসা দেখি আমার আলাপী মিস্টারটি, খোলা বাতাসে বেঞ্চের উপর

বসিয়া, বিকৃত বদনে—জ্যাম্-মাখানো বিস্কুট্ চর্বণ করিতেছেন, আর ওয়াক্ ওয়াক্ করিতেছেন। তাহারাও গলার নীচে নামিবে না তিনিও তাহাদের কবল-মুক্ত করিবেন না। কষ্টে দু-একটি কথা কহিলেন মাত্র; তাহারই ফাঁকে বুঝাইয়া দিলেন—'যখনই বমন হইবে, তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গেই জোর করিয়া পেটে কিছু গমন করান অত্যাবশ্যক; এটিও এ-রোগের একটি অমোঘ টোট্কা।' আমি কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপার আর তাঁর কদর্য কস্ত দেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলাম। উল্লেখে রুচি ছিল না; তবে, সকলের ত ধাত সমান নহে—যদি কাহারও কাজে লাগে, তাই উল্লেখ করিলাম।

সমুদ্র-সফরে ও-রোগটা আছে; সেজন্য যাত্রীরা যথাসাধ্য প্রস্তুত হইয়াই আসেন। আমরাও কেহ কেহ কিছু কিছু ফল, বিশেষ করিয়া নেবুটা, সঙ্গে লইয়াছিলাম, এবং যখন-তখন ও দরকারে-অদরকারে তাহারই ব্যবহার চলিতেছিল। সর্বোপরি চাটুয্যে ফলগুলির উপর এমন ভর করিলেন যে, একদিন দেখি,—ডাব্ ও আনারস্ একটিও নাই; কয়েকটি কাগজি নেবু মাত্র গড়াগড়ি যাইতেছে। আমরা চিন্তিত হওয়ায়, তিনি অভয় দিয়া বলিলেন,—'আমার ফল ত সবই মজুত আছে, সিঙ্গাপুর পর্যন্ত খুব চলে যাবে।' শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

উমেদার যুবকদ্বয়ের অন্যতম ছিল পাঁচু, তাহার সম্মুখের দন্তগুলি কিছু বড় ছিল এবং সে সর্বদাই হাসিত। চাটুয্যের অভয়বাণী শুনিয়া সে, সব দাঁতগুলি অনাবৃত করতঃ খক্ খক্ কবিয়া হাসিতে লাগিল। হাসির কারণ কিছু বুঝিলাম না; চাটুয্যেও না বুঝিয়া একটু হাসিল মাত্র। তবে, ইতিমধ্যে যুবকদ্বয়ের সহিত চাটুয্যের প্রণয়টা কিছু গাঢ়তর বোধ হইতেছিল; ভাবিলাম—এ-সব হাসি, সেই হিসাবেরই অন্তর্গত হইবে।

৪

পরিবর্তনই প্রকৃতির ধর্ম; আবার জলের রং ফিরিল। নয়নরঞ্জন নবদূর্বাদলশ্যামবর্ণ দেখা দিল; জলরাশি অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্তি ধরিল; বশিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্র যেন পরাস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

অভাব ও অপ্রাচুর্যই সকল বস্তুর মূল্য বাড়ায়। আজ কয়দিন জল ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই; আকাশও তাহার অসীম শূন্যমধ্যে মেঘ ও বায়ু ভিন্ন কাহাকেও প্রবেশাধিকার দেয় নাই। আজ সহসা একটি পাখী দেখা দেওয়ায়, জাহাজ-শুদ্ধ লোক তাহা দেখিতে বালকের মত উপরের ডেকে ছুটিল। এই কয়দিন মধ্যে পাখীটাও দুর্লভ বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুনিলাম সিঙ্গাপুর সন্নিকট। একটা আশ্বাসের নিশ্বাস পড়িল। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি যেন পাঠশালায় পরিণত হইল। রকমারি কাগজ, দোয়াত, কলম, ফাউন্টেন্-পেন্ ট্রঙ্ক হইতে বাহিরে আসিয়া বাঁচিল। সকলেই পত্র লিখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কারণ সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াই পোস্ট্ করিতে হইবে;—সূর্যমুখীর মাথার দিব্যটা এই-ভাবেরই ছিল।

কেহ কেবিনে, কেহ ডেকে, কেহ চেয়ারে, কেহ বেঞ্চে বসিয়া গেলেন। এরূপ নাটকোচিত ক্ষেত্র পাইয়া, অনেকেই মনে মনে অনেক রকম ভাব ভাঁজিয়াছিলেন। কেহ বা একটি মাত্র বিরহ চ্যাপ্টারের চপেটাঘাতে, 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রে'কে চাটুয্যে মহাশয়ের দোকান হইতে মশলার দোকানে নির্বাসিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বিধাতার বেয়াদুবী কাহাকেও বড় একটা অগ্রসর হইতে দেয় নাই। হঠাৎ একটা জোর হাওয়া, জাহাজের গায়ে ও ভাবের ঘরে, ভীষণ ধাক্কা দেওয়ার অনেকেরই ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল। পত্র শেষ হইল বটে, কিন্তু অত নড়াচড়ার মধ্যে ভাবটা জমিল না—দিস্তে পড়ে গেল!

বেলা ৮টা হইতে সুদূর দিগন্তে পর্বতমালা দেখা দিল। তাহারাই আমাদের দৃষ্টিকেন্দ্র হইয়া ক্রমশঃ সন্নিকট হইতে লাগিল। জাহাজ এখন যেন 'শ্যাম-সায়রে' চলিয়াছে ; জলের সে দুরন্ত ভাব নাই, জাহাজেরও গতি মন্থর। তখন 'কূল' বলিয়া যে একটা কিছু আছে তাহা বঙ্গদেশ ও 'দেবীবরের' পেঁতে ছাড়িয়া, আমাদের দুই পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত। সকলেরই বদনে যেন—'আঃ বাঁচিলাম,' এই ভাবটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল ; 'ত্রাহি ত্রাহি' ভাবটা তফাতে গিয়া দাঁড়াইল।

বোসজা ছিলেন আমাদের বড়বাবু। তাঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি খুব কাজের লোক, বুদ্ধিমান ও মিশুক মানুষ বলিয়া শোনা মাত্র ছিল। আমাকে 'আপনি আপনি' বলিয়াই কথা কহিতেন। তিনি বলিলেন, 'কেদারবাবু, সিঙ্গাপুর ত সন্নিকট ; একবার ভাঁড়ারটার যদি খোঁজ নেন ; সঙ্গে কিছু ফলের ব্যবস্থা ত থাকা চাই? অবস্থা বুঝে স্টুয়ার্ডকে অর্ডার দি।' (স্টুয়ার্ডই যাত্রীদের আহার্য যোগাইয়া থাকেন, এবং সে জন্য কোম্পানীর কাছে নির্দিষ্ট হারে মূল্য পান। অনুরোধ করিলে ও মূল্য দিলে আবশ্যক মত অতিরিক্ত দ্রব্যাদি আনাইয়াও দেন।)

বোসজাকে বলিলাম—'চাটুয্যে বলেচে, তার সব মালই মজুদ্, সামান্য কিছু অর্ডার দিতে পারেন।' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'বাঁড়ুয্যেদের সহজ-বিশ্বাসী ব'লে একটা সুনাম আছে বটে, তার আনন্দ তাঁরা নিজেরাই উপভোগ করুন.—তাতে কারুর আপত্তি নেই,—আর পাঁচজনকে জড়াবেন না প্রভু!' আমি চাটুয্যের আশ্বাসবাণী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ না পাইয়া বলিলাম,—'কেন বলুন দিকি, সে কি মিছে কথা কয়েছে?' বোসজা বলিলেন,—'আমি তা' বলচিনা, তবে চাটুয্যে যে কাবুলী-মেওয়া আনেনি সেটা বোধ হয় অনুমান ক'রে নেওয়া কঠিন নয় ; সুতরাং সে ফলগুলি সাপ্তাহিক কাল সজীব না থাকাই সম্ভব।'

এই সময়, মলিন ও ছিন্ন একখণ্ড লাল পাছাপেড়ে কাপড়ে বাঁধা একটা মোট হস্তে, চাটুয্যেকে অস্বাভাবিক চালে আসিতে দেখিয়া, আমাদের কথাটা থামিয়া গেল। চাটুয্যে আসিয়াই সজোরে সেই মোটটা ঝপ করিয়া বোসজার সম্মুখে ফেলায়, ভক্ কবিয়া একটা তীব্র দুর্গন্ধ,

সকলের নাসিকাকেই কুঞ্চিত করিয়া দিল। বোসজা ব্যস্তভাবে নাকে কাপড় দিয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি?'

চাটুয্যে সরোষে বলিল—'ঐ চারপেয়েদের আবার চাকরি হবে? কি সর্বনাশটা করেচে দেখুন,—এক টুক্‌রি ফলের মধ্যে এই রেখেছে!' সকলে নাকে কাপড় দিয়া ঝুঁকিয়া দেখি,—একটি তাল, দুটি অর্ধপক্ক কাঁচকলা, গণ্ডাকয়েক কাঁচা লঙ্কা (অধুনা চেনা কঠিন), কতকগুলি কাঁটালবীচি ও কাঁটালের পরিত্যক্তাংশ, আর দীর্ঘ-প্রস্থে অঙ্গুলি পরিমাণ ছয়-সাতটি শিকড়। পরে শুনিলাম, পূর্বাশ্রমে ও পূর্বাবস্থায়, তাঁহারা ছিলেন 'মূলো'! দেখিয়া সকলেই অবাক্।

ঊর্ধ্বে রুষ্ট কালকেতু সদৃশ চাটুয্যে, নিম্নে এই দৃশ্য, এতদুভয়ের মধ্যে হাসিটা কেবল সকলের কণ্ঠের কাছে হোঁচট্ খাইতে লাগিল! বোসজা বেসামাল হইবার ভয়ে, গাম্ভীর্য রক্ষার্থে, খুব ছোট্ট কথা খুঁজিয়া বলিলেন—'আর কিছু ছিল?' চাটুয্যে বলিল, 'তার কি চিহ্ন রেখেচে মশাই—চেটে খেয়েছে।' ফলের চেহারা দেখিয়া সকলে নির্বাক হইয়া ত ছিলই, কিন্তু এই পর্যন্ত শুনিয়া মজুমদার ভায়া আর থাকিতে না পারিয়া—'ওরে বাবারে, সে আবার কি ফলরে বাবা', বলিয়া বেধড়ক্ হাসিতে হাসিতে কুব্জাকারে ছুটিয়া অপর একখানি বেঞ্চে গিয়া বসিয়া হাসির ধাক্কা সামলাইতে লাগিল।

চেটে খাবার ফলটা যে কি, সত্যই তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিতেছিল না। মজুমদারের উপর একটি কঠিন কটাক্ষপাত করিয়া, চাটুয্যেই বলিল—'তিন্-তিন্‌পো গুড়ের এক গুঁড়োও রাখেনি! কত বড় অন্যায়! মশাই—প্রথম গাছের ফল, সেই নধর শশাটি, সে আমাকেই খেতে ব'লে দিয়েছিল, বোকোসেরা—' এইখানে বাধা দিয়া মজুমদার চীৎকার করিয়া হাসি ও কান্নার সুরে—'মেরে ফেল্লেরে বাবা,—পারে আর পৌঁছুতে দিলে নারে বাবা' বলিতে বলিতে আবার একছুটে তৃতীয় বেঞ্চিতে গিয়া শুইয়া ধুঁকিতে লাগিল।

বোসজা রাগের ভাণ করিয়া বলিলেন—'বড় ছেলে মানুষ ত'। আমার 'বফার স্টেটের' (Buffer-state-এর) মত অবস্থা দাঁড়াইল ; না হাসিতে

পারি—কারণ চাটুয্যের কাছে আমার একটু বেশি সম্মান ছিল, পাছে খেলো হইয়া পড়ি ; অথচ সে-আসরে হাসি চাপাও মস্ত বীরের কাজ। ভগবান রক্ষা করিলেন, একটা দমকা হাওয়ায় একজন ফিরিঙ্গির চ্যাটায়ের টুপিটা উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার পশ্চাতে আমার হাসিটাকে বেদম্ দৌড় করাইয়া দিয়া, সে-যাত্রা মান ও প্রাণ দুই-ই রক্ষা করিলাম। বোসজা বুঝিতে পারিযা সহাস্যে বলিলেন, 'ও টুপিটার দাম কম নয় কেদারবাবু!'

চাটুয্যে ছাড়িবার পাত্র নয়, সে বলিল—'আপনাকে এর বিচার করতেই হবে বড়বাবু।' বোসজা বলিলেন—'নাঃ—এ বড় অন্যায় কথা, এ-সব চেপে যাওয়া চলে না। আজ ফল গেল, কাল ঘট্‌টে-বাট্‌টে যেতে পারে, গরু-বাছুর থাকলে স্বস্তি থাকত না। সিঙ্গাপুর দেখা যাচ্ছে, এখন সকলের মন ঐদিকেই থাকবে। তুমি নাব্‌চ ত? ফিরে এসে এই নিয়ে পড়া যাবে, আমি ছাড়চি না।' চাটুয্যে ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

আমরা নাকের কাপড় খুলিয়া ও সঞ্চিত হাসিটা যথাসাধ্য শেষ করিয়া বাঁচিলাম। মজুমদার তখনো প্রকৃতিস্থ হয় নাই, সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'ফলের বহরটা দেখলেন ত—লঙ্কা মূলো গুড়! ওরে বাবারে—সাক্ষাৎ ফলহরির আবির্ভাব!'

এ-সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, এই প্রহসনের যখন পরিপূর্ণ পরিণত অবস্থা, তখন আমাদের ট্রিগনোমেট্রি-দত্ত মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এতটা হাসির হল্লার মধ্যে, তাঁহার বদনের কোন অংশে এতটুকু হাসির রেখা কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। চলন্ত গাছ-পাথরের মত তিনি একটু তফাতে নাড়িয়া গেলেন মাত্র।

জগতের সুন্দর ও সুবিখ্যাত বন্দরগুলির মধ্যে সিঙ্গাপুর বন্দরটি অন্যতম। বন্দরটির উভয় তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা ও বিবিধ বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত ভূখণ্ড, মধ্যে মধ্যে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে উপবন-বেষ্টিত কুটির, নিম্নে নীলবর্ণ সমুদ্র,—বন্দরটিকে অতি নয়নারাম করিয়া রাখিয়াছে। অধিত্যকাভূমিতে সুন্দর সুন্দর ক্ষেত্র ও ফুল-ফল-পরিশোভিত উদ্যান, এবং নানা জাতীয় সুদৃশ্য পক্ষীসকলের কলকণ্ঠ দূরদেশাগত দর্শক মাত্রকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া থাকে।

নানা বর্ণের ও নব নব গঠনের জাহাজ, স্টিমার, লঞ্চ্ ও নৌকা, ভিন্ন ভিন্ন পতাকায় পরিশোভিত হইয়া বন্দরটির দুই কূলের শোভা বর্ধন করিতেছে। একটু গভীর জলে বিভিন্ন জাতীয় রণতরীসকল, আপন আপন গৌরব ও গাম্ভীর্যভাবে স্থির রহিয়াছে। যেন একটি আর একটির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকটিকে যেন অবহেলার চক্ষে দেখিতেছে।

সমরপোতগুলি শ্বেতবর্ণের ; দূর হইতে বিপক্ষের দৃষ্টি এড়ানই বোধ হয় এই শ্বেত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। যাহা হউক, রংটা কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণ হইলে, সাক্ষাৎ যম বা ছিন্নমস্তার প্রতিকৃতি বলিয়া ভ্রম হইত। তাহারা যেন এক একটি অভেদ্য অগ্নিগর্ভ লৌহ-প্রাসাদ ;—দিবারাত্র সসজ্জ ও প্রস্তুত থাকিয়া তর্জন গর্জন সহ ধুম উদ্গিরণ করিতেছে। প্রত্যেকটিই যেন আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতেছে ;—

'কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বিতংসে।'

—আপসোস্, সেখানে অতিবিজ্ঞ বা বুদ্ধিমানদের ব্যবস্থা চলে না ; চলিলে অকাজে এই লক্ষ লক্ষ টন কয়লা এরূপ বৃথা পুড়িতে পাইত না। 'কাজের সময় আগুন দিলেই হবে' নীতিটা এখানে একদম্ অগ্রাহ্য।

এইবার সিঙ্গাপুর দেখিতে যাইবার ছাড় পাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ দুই ঘণ্টার ছাড় পাইলেন ; কারণ জাহাজ বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না. কয়লা লইয়া সেইদিনই আবার গন্তব্য পথাভিমুখী হইবে। তখন সযত্ন-বক্ষিত মহামূল্য পত্রগুলি লইয়া জাহাজ ছাড়িয়া ডিঙ্গিতে উঠা গেল।

ডিঙ্গিগুলির উত্তর দক্ষিণে 'কিঞ্চিৎ চাপা।' বাল্যকালে পৃথিবী সম্বন্ধেও এই কথা পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম, কল্পনাটা এ-ক্ষেত্রেও অসংলগ্ন হয় নাই ; কারণ, এই ডিঙ্গিগুলি এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ বলিলেই হয়। ডিঙ্গির স্বত্বাধিকারীদের জন্ম, কর্ম, বিবাহ, মৃত্যু এই ডিঙ্গির মধ্যেই হইয়া থাকে। সে-ই তাহাদের গৃহ, সে-ই তাহাদের সংসার ও কার্যক্ষেত্র, তাহাতেই রন্ধন, তাহাতেই শয়ন। গৃহিণী কোলের ছেলেটিকে পিঠে বাঁধিয়া হাল ধরিয়াছে, স্বামী ও পুত্র-কন্যারা দাঁড় টানিতেছে। স্ত্রীলোকের

হাতে হাল দেখিয়া, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে একবার একটু ইতস্ততঃ ভাব যে আসে নাই এমন নহে।

ডিঙ্গির ভিতর আটজন আরোহী বেঞ্চিতে বসার ন্যায় পা ঝুলাইয়া বেশ বসিতে পারেন। আমরা ততটা ভরসা না করিয়া চারজনে একখানি ডিঙ্গি দখল করিলাম, এবং কর্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমরা আটজনের পয়সা দিব। ডিঙ্গি পালভরে চলিল। ডিঙ্গিওয়ালী সহাস্যমুখে আমাদের বলিল—'ভয় পাইও না, নড়িও না।' আমাদের হিসাবে ভয়ের যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, অভয়ার জাতের অভয় বাক্যে নির্ভর করা ভিন্ন তখন আর অন্য উপায় ছিল না।

ডিঙ্গির পালখানি নৌকার পরিমাণে ও আমাদের দেশের পালের তুলনায় অনেক বড় ; এমন কি আমাদের দেশের মাঝিরা ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় নৌকাতেও এত বড় পাল সংযত করিতে ও সামলাইতে পারে না।

বাংলাদেশে জোর হাওয়ায়, পালতোলা নৌকা বড়ই ভয়ের বস্তু। একটু বেশী হাওয়া লাগিলে, মাঝি পর্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে, এবং আরোহীদের প্রাণ শুকাইয়া যায়, নিঃশ্বাস মূলাধারে গিয়া আশ্রয় লয়। পালের দড়ি ছিঁড়িলে পুরোহিত সুদ্ধ নিরঞ্জন। সে অবস্থায় পালখানি নামাইতে বা 'মারিতে' দুইজন বলবান লোকের আবশ্যক।

এখানে কিন্তু খুব সামান্য ও সহজ উপায় বর্তমান ; হাওয়ার বেগ বুঝিয়া প্রয়োজন মত পালের সঙ্কোচ ও বিস্তার করা চলে। পালের দড়িগাছটি কর্ণধার-রূপিণী কর্ত্রীর হাতেই থাকে, তিনি বায়ুর ন্যূনাধিক্য অনুসারে, পাল কমান্ বা বাড়ান্। একটু বেশী হাওয়া সংগ্রহ করিবার বা আটকাইবার ইচ্ছা করিলে, যতটুকু আবশ্যক পালখানি বাড়াইয়া দেন। অনেকটা রঙ্গমঞ্চের পটের হিসাব, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ ও সামান্য উপায়ে এ কার্য সাধিত হয়। পালগুলি প্রায়ই চেটায়ের বা মাদুরের। এমনভাবে বোনা যে চট্ বলিয়া ভ্রম হয় ; অথচ তাহা বেশ কার্যোপযোগী ও সস্তা।

৫

ডিঙ্গি ডাঙ্গা স্পর্শ করিতে না করিতে, সকলে লম্ফ দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া বাঁচিলাম ; কারণ 'সপ্ত দিবা বিভাবরী' ভূমির দর্শন বা স্পর্শন ঘটে নাই। তদ্ভিন্ন, এই লম্ফটা অনেক দিক রক্ষা করিল সাগর-পারের সনাতন নিয়মটা এইভাবে রক্ষা হইয়া গেল ; বোধ হয় এতদ্দ্বারা সাগর-পারের দেবতাটিরও সম্মান বজায় রহিল।

আমাদের নামিতে দেখিয়া ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সাবাহকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রিক্সাগুলি বগিগাড়ীর 'বাবালোগ্' বা বাচ্চা বলিলেও চলে। রিক্সা কথাটার ব্যাখ্যা আজ অনাবশ্যক, এখন তাহাদের কলিকাতার পথে-ঘাটে পা ছড়াইয়া থাকিতে নিত্যই দেখা যায়।

আমরা একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া, গাড়োয়ানকে হুকুম করিলাম—'পোস্টঅফিস' ; কারণ জাহাজে-লেখা পত্রগুলির মধ্যে 'সাতশো রাক্ষসীর প্রাণ' রহিয়াছে ; অন্ততঃ সকলের ইহাই ধারণা।

দেখি, সিঙ্গাপুরের পথগুলি প্রশস্ত, পরিষ্কার ও পাকা। দুই পার্শ্বে সুদৃশ্য উদ্যান এবং তন্মেধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চভূমি বা পর্বতখণ্ডের উপর, অতি সৌখীনভাবে নির্মিত বাংলো (Bunglow) ধরনের বাড়ী। কোনটি নীল, কোনটি হলদে, কোনটি সবুজ এবং কোনটি বা গোলাপী,—যেন ছবিগুলি।

দেখিতে দেখিতে ডাকঘরে পৌঁছিলাম। ডাকঘরটি ছোট অথচ বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার। কর্মচারিগণ অধিকাংশই সাঙ্গাই-যুবক। যিনি আমাদের পত্রগুলি লইলেন, তিনি ইংরাজি বোঝেন ও ইংরাজিতে কথাবার্তা কহিতে পারেন। টিকিট কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া ফ্যাসাদে পড়িলাম ; আমাদের টাকা এখানে অচল! এত সাধের চিঠিগুলি চড়ায় ঠেকিল। সৌভাগ্যক্রমে সকল বাঙ্গালীই আমার মত বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা লইয়া ঘরের বাহির হয়েন নাই। কেহ কেহ জাহাজের কর্মচারীগণের নিকট

হইতে পূর্বাহ্নেই টাকা বদলাইয়া ডলার ও সেন্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে আমার মত বুদ্ধিমানের কিনারা হইল।

এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া সিঙ্গাপুর সহর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। গাড়োয়ানকে হুকুম করা গেল 'মার্কেট্'। সুদৃশ্য উদ্যান, হর্ম্য, কলকারখানা দেখিতে দেখিতে বাজারে উপস্থিত হইলাম। প্রায় এক বিঘা জমির উপর পাকা নাটমন্দির সদৃশ্য ইমারৎ—মাঝে মাঝে থাম দেওয়া।

আমরা বাঙ্গালী—শাক্-সব্জী ও মাছ খাইয়াই মানুষ, সুতরাং সব্জী-বাজারেই প্রবেশ করা গেল।

দেখিলাম—নটে, পালম্, কল্‌মী পর্যন্ত বর্তমান। সুশনী শাকটা বোধ করি বঙ্গদেশে যাঁহারা কোমর-ভাঙ্গা পড়া পড়িয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গুরুপাক উপাধিগুলি গ্রাস করতঃ এখন অজীর্ণ-জন্য ধোয়ামুগ ও জলসাগুর আশ্রয় লইয়াও অনিদ্রার অশান্তি এড়াইতে পারিতেছেন না, তাঁহাদেরই জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যে কারণেই হউক, সুশনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। পুঁই শাক্‌টাও বোধ হয় বঙ্গদেশের একচেটে ঐশ্বর্য, নচেৎ একান্নবর্তী পরিবার প্রতিপালন দুঃসাধ্য হইত। বেগুনের বাড়্ বিষম। মূলো অপেক্ষাকৃত বেঁটে, কিন্তু খর্বতাটুকু পরিধিতেই পূরণ করিয়া লইয়াছে। আলু, রাঙাআলু, কপি, কচু, কিছুরই অনটন নাই। ওল এখন সাঁতরাগাছির উপর সদয় ; তিনি গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া জেন্টল্‌ম্যান্ হইয়াছেন। গাড়ী করিয়া কলিকাতায় আসেন, আর কোষ্ঠ-কঠিন বাবুদেব রুমালে বা গ্লাড্‌স্টোন্ ব্যাগে স্থান পান ; তাই এ-সব অঞ্চলে বড় একটা নজর রাখেননি।

ফলের বাজারে চাহিলে চক্ষু জুড়ায়। একা আনারসই যেন কিংখাপের আবরণে চারিদিক আলো করিয়া রাখিয়াছে ; তাহাদের মিষ্টগন্ধে বাজার ভরপুর। যেমনি সরস তেমনি সুমিষ্ট, কেহ কণামাত্র চিনির মুখাপেক্ষী নহে।

সিঙ্গাপুরী কলা ও নারিকেল সুপ্রসিদ্ধ। শ্রদ্ধা সহকারে কিঞ্চিৎ কলা সংগ্রহ করা গেল ; কারণ, নিরাপদে সমুদ্র পার হইবার পক্ষে, উহাই ত্রেতাযুগের ছাড়পত্র। সিঙ্গাপুরের শশাগুলি কিঞ্চিৎ কৃশ, কিন্তু দৈর্ঘ্যে

তাহা পূরণ হইয়াছে। চাটুয্যের মামলা ঝুলিতেছে, তাহার শাস্তির জন্য কয়েকটি মূলো ও ক-জোড়া শশা লওয়া হইল! ইক্ষুদণ্ডগুলি কচি বাঁশ বলিলে চলে। লেবু প্রভৃতি অন্যান্য ফলের বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। বাজারে ডাব দেখিতে না পাইয়া বড়ই দমিয়া গেলাম, কিন্তু আশা ত্যাগ করিলাম না।

মাংসের বাজারটা দ্রুতপদেই অতিক্রম করিতে হইল ; কারণ, মাংসটা সেখানে মাংস ভিন্ন আর কিছু নয়, গো-মাংস, শূকর-মাংস, ভেড়ার মাংস বেশ সদ্ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে!

মৎস্যের বাজারে প্রবেশ করা গেল। মৎস্য দেখিয়া যাঁহার না আনন্দ ও লোভ হইয়াছিল, তিনি বাঙ্গালীই নন। ঘুশো-চিংড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া রুই, মির্গেল, কালবোস, ভেট্‌কি সকলেই উপস্থিত। এত বড় পায়রাচাঁদা পূর্বে কখনও দেখি নাই, ওজনে এক একটি দেড় সের হইবে। ভেট্‌কিগুলি একআধ বৎসরের শিশু অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে পারে। শঙ্কর মাছ যথেষ্ট, তদ্ব্যতীত অজ্ঞাতনামা মৎস্য যে কত প্রকারের দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা ফটো দ্বারা অধিক পরিস্ফুট করা চলে।

ডিঃ গুপ্ত মহাশয়ের জীবিত মৎস্যের ঝোলের ব্যবস্থাটা এইখানেই তামিল হওয়া সহজ, কিন্তু একটিও পীলে-রোগী দেখিলাম না। ইলিস প্রচুর। লাল রংয়ের মাছ আমাদের দেশের সৌখীন বড়-লোকদের একটা ঐশ্বর্যের মধ্যে গণ্য। কেহ বোতলে, কেহ চৌবাচ্চায় রাখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত করেন। সেগুলির মধ্যে যাহারা খুব বড়, তাহারা আধ-পোয়ার মধ্যে। এখানে আধ-পো হইতে আরম্ভ করিয়া, তিন চারি সের পর্যন্ত, লাল ও সবুজ বর্ণের মাছ দেখিলাম ; এক আধটি নয়, স্তূপাকার!

প্রথম দর্শনে তাহাদের প্রকৃত বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য রং মাখাইয়া রাখিয়াছে। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সত্য সত্যই তাহাদের রংই ঐ। এইবার কর্কটের কাহিনী ; তাহাদের সংখ্যাতীত সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। এক-একটি আধসের তিনপো, শ্বেত ও ধূসর বর্ণের

উপর নীলের চিত্র, নীল বর্ণের উপর শ্বেত ও লোহিত বর্ণের চিত্র অতি মনোহর। তাহারা অযোধ্যার রাজসিংহাসন পাইবার উপযুক্ত কি না জানি না, তবে বরুণরাজের বালাখানার বস্তু বটে। সুঁট্‌কি মাছের বাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও, পাঠকের নাড়ী কয়টা স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কায় পরিত্যক্ত হইল।

পরে ডিম্ব ও পক্ষিবিশেষের বাজার পার হইয়া দেখি, একদিকে রন্ধন কার্য চলিয়াছে ও দলে দলে শ্রমজীবীরা আসিয়া, সেই অর্ধপক্ক খাদ্য, এক একটি চীনেমাটির বাটিতে করিয়া, দুইটি কাঠির সাহায্যে অতি উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেছে। তন্মধ্যে শাক-সব্জী, মৎস্য-মাংস, একাধারে সবই বর্তমান। জাতিভেদের জয়ঢাক এখানে একদম নীরব।

ইতিমধ্যে ইলিস, বাটা ও গল্‌দাচিংড়ি খরিদ হইয়াছিল, তাহা ও সামান্য শাক-সব্জী এবং গোটাকয়েক আনারস লইয়া গাড়ীতে ওঠা গেল। পান ও ডাব কিনিবার ইচ্ছা প্রবল থাকায়, একটি দ্বিভাষীকে সঙ্গে লইয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম! সহরের পথের দুইধারে সমরেখায় সারবন্দী, বড়লোকদের ও সওদাগরদের বাটীর সম্মুখভাগ রঙিন কাগজ, জগ্‌জগা ও সোনালীর ফল ফুল পতাকা ও আলেপনে স্বত্বাধিকারীর রুচি ও অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। সাইন্‌বোর্ডগুলি সোনার জলে লেখা।

অনেক ভারতবাসী এখানে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। তন্মধ্যে নাকোদার এবং বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলের শেঠ্ ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এখানকার সাধারণ সম্প্রদায় ও মুটে-মজুরগণ, আকার প্রকার ও বর্ণে অনেকটা ব্রহ্মদেশবাসীদেরই মত। বড় লোক সর্বত্রই স্বতন্ত্র জীব।

আমাদের দেশে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরাই বেতের বাগানের মালিক ; তাহাদেরই কৃপায় আমাদের এই ধারণা ছিল, তাহার প্রমাণ খুঁজিতে অপরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে হইত না। কিন্তু এখানে বেতের ব্যাপার দেখিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে, এখানকার পাঠশালে পড়িতে হয় নাই!

যাহা হউক এখানে বেতের শিল্পকার্য দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।

বেতের টেবিল, চেয়ার, কৌচ, টুপি, ট্রঙ্ক, বিবিধ প্রকারের আধার—টুল, বেঞ্চি, আলমারি, সবই বেতের। তাহাদের সূক্ষ্ম-শিল্প-সৌন্দর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত এক এক পাব 'ম্যালাক্কা কেনের' সুগঠিত ছড়ি ও চাবুক সৌখীন সম্প্রদায়মাত্রেরই সোহাগের বস্তু।

একস্থানে ডাব দেখিতে পাইয়া গাড়ী থামান গেল। আমারই উপর খরিদের ভার পড়িল। ইতিপূর্বে কখনও একত্র থাকার সুযোগ (বা কুযোগ) না ঘটায়, সহচরগণ এমন ভুলটা করিয়া ফেলিলেন। একে ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহাতে সময়টা মধ্যাহ্ন, রৌদ্রটাও খুব প্রচণ্ড থাকায় পিপাসাটাও দস্তুর মত প্রবল দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই দর-দস্তুর না করিয়াই দুইটা ডাবের মুখ কাটাইয়া ফেলিলাম। আশ্চর্যের বিষয়—দুইটা ডাবের জল নিঃশেষ করিতে আমরা চারজন জখম্ হইয়া পড়িলাম। জলের মিষ্টতা পাইয়া নেয়ার উপর লোভ পড়িল, তাহাও অতি প্রীতির সহিত ভক্ষণ করা গেল। পান ও ভক্ষণান্তে, সে দুর্লভ বস্তুর দর-দস্তুর করা ভদ্রোচিত হয় না।

একটি কাঁদিতে পাঁচটি ডাব ছিল, তাহাও গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া গেল, এবং তাহারা যে মূল্য চাহিল, তাহাই দেওয়া হইল ; এক একটি ডাব প্রায় ছয় পয়সা করিয়া পড়িল। বোসজা বলিলেন, 'দর করলে বোধ হয় চার পয়সা ক'রে পেতেন।' আমি বলিলাম—'দোহাই মশায়, ঐ 'বোধহয়টার' কুহকে পড়বেন না, ওটা চিরকালই লোকের শান্তিভঙ্গ করে আসছে।' পরে পান, সুপারি চুণ ও খয়ের খরিদ হইল। পানগুলি কর্পূরী পান, খয়ের খুব খাস্তা—একটু টিপিলেই ময়দার মত হইয়া যায়।

আর বিলম্ব করা যায় না, নির্দিষ্ট সময় সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং জাহাজে ফেরা গেল। স্টুয়ার্ডকে ফল আনিবার ফর্দ দেওয়া হইয়াছিল ; তিনি প্রচুর ডাব, আনারস, কলা, নেবু প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিলেন ; জাহাজও ছাড়িল।

৬

আবার সেই অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ সিন্ধু। সমুদ্রবক্ষে জাহাজের অবিরাম গতি আবার আরম্ভ হইল। জলের উপর থাকিয়া জলের কথা লিখিবার অনেক থাকিলেও তাহা কোন পক্ষেরই স্বাস্থ্যকর নহে ; সুতরাং দু'একটা অন্য প্রসঙ্গে হংকং পৌঁছিবার চেষ্টা করাই ভাল।

জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌঁছিবার কিছু পূর্বে বোসজা মহাশয়, সঙ্গী যুবকদ্বয়কে ডাকিয়া, চাটুয্যের শশা-চুরির ইতিহাসটা সবিস্তারে শুনিতে চান। তাহাতে দীর্ঘদন্তী পাঁচুর বা পঞ্চাননের দন্তগুলি একেবারে বদনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং বর্ণনার ব্যাঘাত উৎপাদন করে।

সে বহু বাধা ঠেলিয়া আরম্ভ করিল—'মশাই, উনি কোন্ দেশের লোক জানি না, মরণ-বাঁচনের পথে রাজ্যের অযাত্রা নিয়ে, আমাদের ডোবাতে এসেছিলেন।' বোসজা বলিলেন—'এসেছিলেন কি হে? এখনও ত রয়েছেন। আবার অযাত্রাটা কি পেলে?' পাঁচু উৎসাহের সহিত বলিল—'রয়েছেন বটে, কিন্তু সে বিষ আর নেই, আমরাই সেটা সাবার ক'রে দিয়েছি, চাকরি-বাকরি নেই, যেতে হয় আমাদেরি যাওয়া ভাল!' বোসজা হাসিয়া বলিলেন,—'একটু শীগ্‌গির সারো।' পাঁচু বলিয়া চলিল—'লোকটা মশাই খাঁটি aboriginal, একদম আদিম আমলের আর দস্তুরমত দাশুরায়-ঘাঁটা ;—অপচার আর অযাত্রার মধ্যেও অনুপ্রাসের ঘটা কি!' বোসজা অধীর হইয়া বলিলেন,—'নাঃ, তোমার কাছে শুনতে হ'লে এ-জন্মে কুলোবে না—হরিপদ, তুমিই বল।' হরিপদ মাথা হেঁট করিয়া বলিল,—'আজ্ঞে ও-ই সবটা জানে, আমার পাঁচ কোষেই পেটের অসুখ করেছিল।' শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। মজুমদার ভায়া বলিলেন,—'ওরে বাবা! এযে বোসজা মশা'র যাত্রার দল হয়ে দাঁড়ালো। চলতে দিন্ মশাই—বেশ চল্‌চে।'

কোন একটা ভারি রকমের আশা ভরসা বা উৎসাহ পাইলে লোকের

বুক পাঁচ হাত বাড়িয়া যাইতে শুনিয়াছি, দাঁত বাড়িয়া যাইবার কথা কুত্রাপি শুনি নাই ; এ ক্ষেত্রে একেবারে সরেজমিনে সেটার দর্শনলাভ ঘটিল, পাঁচুর দাঁত সামলান সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

সে আবার আরম্ভ করিল—'মশাই, ঝোলায় হাত দিয়ে দেখি—কলা, কাঁটাল, কাসুন্দি, 'ক'য়ের কেয়াবাৎ কমিটি! বাকি ফলগুলি ত' দেখেছেনই! মূলো, লঙ্কা যদি ফল হয়, ত কাসুন্দিটে হবে না কেন? ফল না বলেন, 'ফলেট' বলতে পারেন ; ওতে থাকেন—তেঁতুল, সর্ষে, হলুদ, সবই ত গেছো জিনিস।' বোসজা বলিলেন,—'বাবা ক্ষেমা দাও, আমার ঘাট হয়েছে।' 'সে কি মশাই'—বলিয়া পাঁচু তাড়াতাড়ি বোসজা মশায়ের চরণ স্পর্শ করিল ও বলিল,—'মশাই, সে কি দু'কথার জিনিস, একদম মধুবন!—পেল্লায় দু'ছড়া কাঁচকলা,—যেন মালসা পোড়াতে চলেছি! একটা কেঁদো কাঁঠালের আধ-পচা আধ-খানা, একটি প্রকাণ্ড পাঁড় শশা, গুটিকয়েক মূলিকা (পালমের গোড়াও বলা চলে), তদুপরি গুড়, কাসুন্দি লঙ্কা,—একেবারে জয়ডঙ্কা,—ফলের ফ্যামিলি গ্রুপ্! অযাত্রাগুলি রেখে কি স্বস্তি ছিল মশাই, আপনারা দয়া ক'রে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, ও-বিপদ কি আমাদের স্কন্ধে রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?' মজুমদার তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'বটেই ত, বেঁচে থাক ভাই, বেশ করেছ ; কিন্তু বেচারার সেই কচি শশাটি—' পাঁচু তাড়াতাড়ি বলিল—'ওঃ, সে এক ভীষণ প্যাথেটিক চ্যাপ্টার্।

একদিন চাটুয্যে-মশাই শশাটি বার করে বল্লেন,—'এটি আমাদের গাছের প্রথম ফল কি না তাই আমাকেই খেতে বলে দিয়েছেন।' এই বলেই কাঁদ কাঁদ হয়ে পড়লেন ; সেটি নেড়ে চেড়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। বোধ হয় গাছটির গোড়া পর্যন্ত তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছিল। আহা, দেখাতে পারলাম না, সেটি মশাই দেখবার জিনিস ছিল,—পাক্কা পাটকিলে রঙ্গের শিবলিঙ্গ বল্‌লে হয়, চন্দনের ফোঁটা টেনে প্রতিষ্ঠা করা চলত। তাই আমি মশাই তাতে ঘেঁশিনি, হরিপদ বামনের ছেলে—ও-ই উদরস্থ করেছে। কলকেতায় থাকলে বিচিগুলো ডেন্টিস্টদের কাছে দরে বিক্রি হত। বোসজা যেন ভীতভাবে প্রশ্ন

করিলেন—'বিচিগুলো শুদ্ধ গিলেছে নাকি?' পাঁচু বলিল,—'ফ্যালে কোথায় বলুন আস্‌ছে জন্মে আমারি মত 'খলু দন্তবন্ত' হবেন আর কি! তা মশাই, এ-সব কাজ ত আর ধীরে-সুস্থিরে করা চলে না,—অমন্ আমড়ার মত কাঁটাল বিচিগুলোই আধাআধি পেটে গেছে। সে-সব 'ক্রিটিকেল্ মোমেন্ট্'—ভবানী-ভ্রূকুটি-ভঙ্গির মত, ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝতে পারবেন না।'

হাসির রোল পড়িয়া গেল। হাসির বিরাম ত ছিলই না, তাহা তালে তালে উঠিতে নামিতেছিল,—সেটা বাদ দিয়াই লিখিতেছি। মজুমদার মুগ্ধ হইয়া পঞ্চাননের বচন-পারিপাট্য উপভোগ করিতেছিল। বোসজা বলিলেন,—'শেষ হ'ল যে, বাঁচলুম।' পাঁচু বলিল,—'সে আর কতক্ষণের জন্যে মশাই ও নরুকে-টুকরি বর্তমান থাকতে, ও-তল্লাটের কারুর কি আর বাঁচবার আশা আছে।' বোসজা বলিলেন,—'ঐ কথাটার জন্যেই ত ডেকেছিলুম ; তোমার ব্যাখ্যায় বেহোঁস ক'রে দিয়েছে। দ্যাখ—আমরা চাটুয্যেকে নিয়ে নাব্‌চি, আমাদের ফেরবার আগেই ও-বিপদটি বিসর্জন দিয়ে ফেলো।' পাঁচু বলিল—'তারপর উনি এসে কি আর আমাদের ডাঙ্গায় রাখবেন!'

বোসজা বলিলেন,—'সেই কথাটাই ত বলচি ; জিজ্ঞাসা করলে বোলো—জাহাজের চিফ্-সাহেব ঘুরতে ঘুরতে আমাদের মহলে ঢুকেই নাকে রুমাল দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে থমকে দাঁড়ালেন, তারপব চতুর্দিকে দেখে বেড়াতে বেড়াতে টুকরির কাছে এসেই লাফিয়ে উঠলেন, আর চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে প্রশ্ন করলেন—'এ ডার্টি জঞ্জাল কার?' আমি বিপদ বুঝে বল্লুম—' হুজুর এ ত এখানে ছিল না, কে রেখে গেছে দেখছি, এ বাঙ্গালীর জিনিস হতেই পারে না।' সাহেব তখন একজন খালাসিকে ডেকে সেটা তুলিয়ে নিয়ে গেলেন ; তারপর কি হ'ল জানি না! যাবার সময় কেবল বললেন,—'মূর্খেরা জানেনা—জাহাজে এপিডেমিক আরম্ভ হ'লে কেউ বাঁচবেনা।' পাঁচু বলিল—'যে আজ্ঞে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' আমি সাক্ষী ত'য়েরের তারিফ করিয়া বলিলাম—'বোসজা মশাই, আপনি অদ্বিতীয় উকিল হ'তে পারতেন।' তিনি হাসিয়া বলিলেন,

—'আমি আনরপুর পরগনার লোক হে,—সেখানকার এক একজন চাষাও বড় বড় ব্যারিস্টারকে বোকা বানিয়ে বিদায় দেয়!'

সকলেই এই একটানা একঘেয়ে সুদীর্ঘ সফরে একটু আমোদের কিছু পাইলে বাঁচে। মজুমদার ভায়া আজ পঞ্চাননকে আবিষ্কার করিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুর দর্শনান্তে ফিরিয়া রাত্রে আহারাদির পর সকলে যখন উপরের ডেকে জমায়েৎ হওয়া গেল, সে আশা করিতেছিল, সকালের মুলতুবী মামলাটা এইবার বেশ গুলজার-ভাবে রুজু হইবে।

কিন্তু কাহাকেও সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে না দেখিয়া শেষে নিজেই কথাটা তুলিল,—'এতবড় দুনিয়াটায় এতকাল বাস ক'রে যা দেখিনি, এতটুকু জাহাজে এই ক'টা দিন মাত্র বাস ক'রে তা দেখা গেল। উষাহরণ, সীতাহরণ, পারিজাত-হরণ, বস্ত্রহরণ দেখেছি, কিন্তু বাবা শশা-হরণের সংবাদ পাইনি, সেটা এই জলে পড়ে পেলুম!' চাটুয্যে তাড়াতাড়ি একটু ঘেঁসিয়া গিয়া, নীচু সুরে বলিল—'সে-সব মিটে গেছে মশাই, ওকথা আর তুলবেন না, যেতে দিন।' বোসজা বলিয়া উঠিলেন—'সে কি, আমি যে এই গঙ্গার উপর—' কথা শেষ করিতে না দিয়া চাটুয্যে সকাতর বিনয়ে তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া, বিপদের বার্তাটা জানাইয়া, এ সঙ্কটে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিল!

বোসজা গম্ভীরভাবে সবটা শুনিয়া অভয় দিয়া বলিলেন,—'তবে কি না, ঐ চিফ্ সাহেবটি সহজ লোক নহেন, বড়ই তিরিক্ষি ;—তা হ'ক, অমন অনেক সাহেব চরিয়ে এসেছি ; তোমার কোন ভয় নেই।' বুঝিলাম ঔষধ ধরিয়াছে, পঞ্চাননের ফতে। মামলা মিটিয়া গেল। মজুমদার মন-মরা হইয়া শয়ন করিতে গেল, চাটুয্যে অনুগমন করিল। পঞ্চানন বলিল,—'যা করেছি মশাই, কলকেতা হ'লে রোজ চপ্ খাবার সুবিধে হ'য়ে যেত।' বোসজা বাহবা দিয়া বলিলেন—'আর যেন ও কথার উল্লেখ করা না হয়।' এইখানেই ফল-হরণের পালা সমাপ্ত হইয়া গেল।

৭

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত যাহা যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহার সবগুলিই অজ্ঞাত-পূর্ব ও অদ্ভুত এবং বাঙ্গালী (অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্বের বাঙ্গালীর) শোণিত-শোষক। মধ্যে মধ্যে এক একটা হাবাতে হিড়িকে হাড় হিম হইয়া যাইত।

একদিন প্রাতে ঘন ঘন ঘণ্টার ঘায়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; ব্যাপারটা জানিবার জন্য তাড়াতাড়ি অপার-ডেকে উঠিতে গিয়া বাধা পাইলাম ; জাহাজের একজন কর্মচারী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'যে যে-অবস্থায় যেখানে আছ, পথ ছাড়িয়া স্থির হইয়া দাঁড়াও, এদিক্ ওদিক্ করিওনা, গোলমাল না হয়।' শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, কারণটা বা ঘটনাটা কি তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে টাঙ্গি, হাতুড়ি, খন্তা, হাম্বোর প্রভৃতি অস্ত্রাদি লইয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও তাঁহার পশ্চাতে—কয়েকজন খালাসী দ্রুত ছুটিয়া গেল ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জন পনের লোক মোটা লম্বা লম্বা চামড়ার নল ও পম্পিংমেশিন্ লইয়া ছুটিল। পশ্চাতে অপর বারজন বালতি, দড়ি ও চেন লইয়া চলিল ; সকলেই বেজায় গম্ভীর ও ব্যস্ত। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আমাদের নাড়ীও তাহাদের এক এক দলের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর চঞ্চল হইয়া হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা দিতে লাগিল। পনের কি বিশ মিনিট অন্তর নূতন লোক যাইতে লাগিল ও পূর্ব দলগুলি ঘর্মাক্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া যায় না। অনুমানে ও কাণাঘুষায় বোঝা গেল জাহাজে আগুন লাগিয়াছে।

আবার ওদিকে জাহাজের গাত্রসংলগ্ন বা প্রলম্বিত ছোট ছোট জলিবোট্গুলির উপর দাঁড়ি-মাঝিরা গিয়া যথাস্থানে বসিয়াছে—আদেশ মাত্র বোট্-সমেত অকুলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত। জলিবোট্গুলি

উপরেই থাকে কিন্তু এমন অবস্থায় আছে যে, আবশ্যক মাত্র যথাসম্ভব আরোহিসহ জল-লগ্ন হইতে মুহূর্ত বিলম্বও হয় না। দেখিয়া শুনিয়া মন আড়ষ্ট ও প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল।

এতক্ষণ অন্তরের মধ্যে অনেকেরই অনেক বোল্ বাজিয়া উঠিতেছিল ; এইবার মনে হইতে লাগিল, 'ওগো বাবাগো', বলিয়া একটা বিকট চীৎকার বুঝি আর চাপা থাকে না! এমন সময় আবার ঘণ্টা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব 'ফায়ার্ ব্রিগেডের' ফৌজ তোড়জোড় সহ নীরবে ও ধীর-পদক্ষেপে স্বেদ-সিক্ত শরীরে ফিরিল। বিজয়ের হৈ চৈ শব্দটা না থাকায় হৃদয়ে সান্ত্বনা আসিল না, সে অধিকতর জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল। দেখি চিফ্‌সাহেব দুই হাত নাড়িয়া দুই দিকের লোকদের—'বস্— হোগিয়া, আব্ যাও' বলিতে বলিতে খালিপায়ে দ্রুত চলিয়াছেন।

দুর্গা,—ধড়ে প্রাণ আসিল ; আসন্ন ও জীবন্ত অগ্নি-সংস্কারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। নিম্নে জলরাশি, উপরে অগ্নিদেব—এই ধূপছায়া মৃত্যুর সৌন্দর্য থাকিলেও কাহারও তাহা প্রার্থনীয় ছিল না। ব্যাপারটি পুরা একটি ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল সেই এক ঘণ্টা কাল যূপকাষ্ঠে বাঁধা উৎসর্গকরা জীবের মতই কাটাইতে হইয়াছিল।

প্রাতঃকৃত্যাদি কাহারও আর স্মরণ ছিল না। রেহাই পাইয়া সকলেই অপার-ডেকের হাওয়ায় গিয়া হাঁপ ছাড়িল। আমি সঙ্গীদের সন্ধানে ছুটিলাম—বিশেষ করিয়া চাটুয্যের ; কারণ সে অত্যধিক নার্ভাস্। গিয়া দেখি—মহাপুরুষের নাক ডাকিতেছে—তখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই! ভাবিলাম ভালই হইয়াছে নচেৎ আজ একটা বিষম উৎপাত উপস্থিত হইত—তাহাকে কেহই নীরব ও স্থির রাখিতে পারিত না। সত্য বলিতে কি—আগাগোড়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এরূপ অগ্নি-পরীক্ষা দিবার সামর্থ্য কাহারই বা ছিল!

পরে অপার-ডেকে গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে এত বড় ঘটনাটা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। মনটাও অজ্ঞতার অপমানে ছোট হইয়া পড়িল এবং এত বড় বিপদটার বর্ণনার উৎসাহটা মাটি হইয়া গেল। শুনিলাম, জাহাজে সত্য সত্যই আগুন লাগে নাই। ভাবী বিপদের

প্রতিকার-কল্পে মধ্যে মধ্যে এইরূপ Practice (অভিনয় দ্বারা অভ্যাস) ও উৎসাহ, সজাগ ও 'সড়গড়' রাখিতে হয়। ও হরি! এই মিছে কাজের জন্যে এত মাথাব্যথা, আর লোকের জান্-হায়রান্! বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে বিমূঢ় বনিয়া গেলাম। এদের বুদ্ধি দিতে কি বাংলা দেশের একটিও বিজ্ঞ জোটেননি?

মজুমদার বসিয়া বসিয়া প্যালপিটেশন্ সামলাইতেছিল ; পঞ্চানন পেট টিপিতে টিপিতে আসিয়া বলিল,—'অত বড় পোষা পীলেটার পাত্তাই পাচ্ছিনা মশাই, একদম শুকিয়ে গেছে!' ট্রিগনোমেট্রি-দত্তের সংবাদ লইতে যাইতেছি, দেখি ফলোয়ার্ বা মজুর-মহলে হাসির মহা ধুম্ পড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণটা যাহা পাইলাম, তাহাতেই আমার অনুসন্ধান-স্পৃহা মিটিয়া গেল। দত্ত মহাশয়ের দাড়ি ছিল, তিনি সেই বিপদের সময় একটি 'লাইফ্‌বয়া' ঘেঁশিয়া, হাঁটু গাড়িয়া ঊর্দ্ধনেত্রে ও যুক্তকরে বসিয়া, ইংরাজিতে প্রেয়ার সুর করিয়াছিলেন, ও তাঁহার দাড়ি বহিয়া অশ্রু অনবরত টোপাইয়াছিল।

এটা ঠিক্ যে, কি হিন্দু কি মুসলমান সে সময় সকলেই ব্যাকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রাণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিল। শ্রুত ছিলাম—ভয়ে ও বিপদে মাতৃ-ভাষাই মুখে আসা স্বাভাবিক ;কিন্তু দত্তজা সকল বিষয়েই একটু অস্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাই, ফলোয়ারেরা, সেই অনুকরণে মাথা নাড়িয়া—'ও লাট্—ও লাট্' (oh lord) বলিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

বোসজা মহাশয় বুদ্ধিমান লোক, তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা সেরা উপদেশগুলি, কোন অবস্থাতেই অমান্য করিতেন না। এতটা কাণ্ড তিনি শৌচাগারেই সমাপ্ত করিয়া উঠিয়াছিলেন ; স্নানান্তে চুল ফিরাইয়া ও পিত্ত-নাশের প্রতিকার-প্রথা রক্ষা করিয়া, উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চা'য়ের কথায় সকলের চট্‌কা ভাঙ্গিল। মজুমদার বলিল,—'বেটারা নাড়ী দমিয়ে দিয়েছে, দু'কাপের কম আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।' সকলেই একথাটি একবাক্যে সমর্থন করিল। 'চা'ও আসিল, এবং প্রত্যেকে তাহার দু'কাপ করিয়া পানান্তে, শরীরে ও মনে

বলও আসিল।

আমার ইউরেসিয়ান বন্ধুটি দেখি, তাঁহাদের দলে খুব উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। মর্মটা এই—যাহাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, এরূপ একটা আতঙ্ক-উৎপাদক-ব্যাপার আরম্ভ করিবার পূর্বে, নোটিস্ দিয়া সকলকে সেটা বুঝাইয়া রাখা তাহাদের উচিত ছিল না কি? সহসা এরূপ কাণ্ডটা নার্ভাস্ লোকের পক্ষে মারাত্মক নয় কি? ইত্যাদি। বুঝিলাম, সকলেই একই রোগাক্রান্ত হইয়াছিলাম; প্রাণের মায়াটা সকলেরই সমান।

পরে দেখা গেল, সপ্তাহের মধ্যে এরূপ অন্ততঃ দুইটি অভিনয় হইয়া থাকে;—কোনটিই 'আনন্দ রহো' নহে। পূর্বোক্তটি অগ্নিভয়ের প্রতিকারকল্পে, অপরটি—হাইড্রোফোবিয়ার না হইলেও জলাতঙ্কের বটে। এটিরও বিধিব্যবস্থা মন্ত্র-তন্ত্র ঐ একইরূপ, কেবল যন্ত্রাদি স্বতন্ত্র। জাহাজের তলদেশ হঠাৎ যদি ফাটিয়া বা ফাঁসিয়া যায় তাহারই প্রতিকারকল্পে এটি অনুষ্ঠিত বা অভিনীত হইয়া থাকে। কথাটা যাহাদের জানা নাই, তাহারা সেই ছুটাছুটি, উৎকণ্ঠাজড়িত ব্যবস্থা ও তোড়জোড় দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়ে। একবার ঠকিলেও, অভিনেতাদের দক্ষতা এতই নিখুঁৎ যে, ক্ষণেকের জন্য সকলকে চমকিত ও আত্মহারা করিয়া ফেলেও ঘটনাটা সত্য বলিয়াই ধারণা হয়। পম্প্ ও যন্ত্রাদি ব্যতীত, পাট, চট, পুরাতন কাছির টুকরা ও ক্যাম্বিস্ এবং মুদ্গরই এ বিপদের পরিত্রাতা।

সেই অসীম অতলস্পর্শের মধ্যে উপস্থিত হইলে, বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতম নগণ্য বস্তুটির মূল্যও সমান হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ নাই; মহাশ্মশান বলিলে চলে। বিপদের সময় একটি ক্ষুদ্র স্ক্রুর অভাব ঘটিলে ও সেইটি উপর জাহাজখানির শুভাশুভ নির্ভর করিলে, সমগ্র ইঞ্জিন ও শত শত আরোহীদের প্রাণবিনিময়েও তাহা যদি পূরণ না হয়, তাহা হইলে সেই সামান্য সামগ্রীটির মূল্য যে কত, তাহা অনুমানের বস্তু। সুতরাং, এই অগ্নিগর্ভ জাহাজের কোন্ কথাটাই বলিব, ইহার সবটাই বিস্ময়কর। ইঞ্জিন-ঘরের অগ্নিকাণ্ড ও সেই লোহার

অসুরের খেলা দেখিলে, ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তাহারাই জাহাজকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, আবার তাহারাই নিমেষে তাহাকে ভস্মে পরিণত করিতে পারে। সেই দুর্ঘটনা হইতে রক্ষার কত না ব্যবস্থা! আবার উপরে মহামহীরুহ সদৃশ মাস্তুল জটায়ুর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করতঃ বায়ুকে কুক্ষিগত করিয়া, সশব্দে সর সর বলিতে বলিতে চলিয়াছে। কিন্তু এই প্রায় দেড়শত মণের মৈনাকটি, মাত্র চার পাঁচটি মাল্লার সাহায্যে যখন নিঃশব্দে মস্তক নত করিয়া শুইয়া পড়ে বা মস্তকোন্নত করিয়া দাঁড়ায়, তখন ম্যাজিক দেখিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। যাহা কিছু অসম্ভব, এইটুকুর মধ্যে তাহাদের যেন সম্ভব করিয়া দেখান হইয়াছে।

৮

আমাদের 'ক্লাইভ' জাহাজখানি সরকারী জাহাজ। তাহা প্রধানতঃ সামরিক কার্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সৈন্যাদি ও সৈন্য-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বহন করাই তাহার প্রধান কাজ; আবশ্যক হইলে গোলা বর্ষণ করিতেও প্রস্তুত। ইহাতে পি-এন-ও প্রভৃতি কোম্পানির জাহাজগুলির মত বাসব-বাঞ্ছিত বিলাস-ব্যসনের বন্দোবস্তের ও সাজ-সজ্জার বাড়াবাড়ি ছিল না। ছিল মাত্র রাজোচিত 'সেলুন' অর্থাৎ সর্বাংশে সুসজ্জিত কক্ষ,—মায় ফুলের বাগান, লাইব্রেরী. ক্রীড়াভূমি, গির্জাঘর, সবই সুবিন্যস্ত ও সুন্দর। মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্রে গদি-আঁটা সোফা, চেয়ার, স্বর্ণ-শিল্প-শোভন টেবিল-আচ্ছাদন, কার্পেট আঁটা (ফ্লোর্) মেজে, সুদৃশ্য মূল্যবান পর্দা, আয়না, আলমারী, ইলেকট্রিক্ আলো, ফ্যান্, সবই আমাদের হিসাবে রাজ-হর্ম্যোচিত। ইহার মধ্যে পশুশালা, গোয়াল, গারদ, সবই পাইবেন; কিন্তু সৌখীন ধনী যাত্রীদের পক্ষে ইহা নাকি পর্যাপ্ত নহে, লড়ায়ে-সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা কোন প্রকারে মাথা গুঁজিয়া গুজরান্ করেন!

ডেকগুলির কাঠের মেজে হইতে আরম্ভ করিয়া, দরজার খড়খড়ি রেলিং ও প্রত্যেক কল-কব্জাটি পর্যন্ত নিত্য নিয়মিত প্রাতে ধোয়া মাজা ঘষা হইয়া থাকে; তাহাতে জাহাজখানি নূতন ও সুন্দর ত' দেখায়-ই, তদ্ভিন্ন কোনরূপ ময়লা জমিতে না পাওয়ায়, পীড়াদি সহজে প্রবেশ পথ পায় না। ফিনাইল্ ও সাবানের বেদরদ্ ব্যবহারও নিত্যই চলে।

আমাদের অভ্যাসের উল্টা ব্যাপারগুলো দেখিয়া মনে হইত,—গরিবদের শাস্ত্রই স্বতন্ত্র। আমাদের হেঁসেলের—তেল কালি ময়লা-মাখা দুর্গন্ধিযুক্ত আমিষ রন্ধনের কড়াখানি মৃতাশৌচ বা গ্রহণাদি ক্ষেত্রেই, একবার মাজা হইয়া থাকে। অথচ, সেই ম্যাক্‌বেথের ডাইনীদের (কলড্রন্) কটাহ-সদৃশ পাত্র-পক্ক ভোজ্যই আমরা নির্বিকার চিত্তে নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকি! কানপুর সহরে একজন বাঙ্গালীবাবু একটি বেণের

বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি নিত্য উপর-তালা ও নীচের-তালা ধোয়াইতেন। এই অপরাধে বাড়ীওলা তাঁহাকে নোটিস্ দিয়া বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করে। কারণ, নিত্য ধুইলে বাড়ী কয়দিন টিকিবে! ইহাকে সনাতন অভ্যাস-অনুবর্তিতা বা অভাবে স্বভাব নষ্ট বা বুদ্ধির বাড়াবাড়ি বলিব, তাহা ঠিক্ করিতে পারি না।

জাহাজে উঠিয়া পর্যন্ত সারা দিনের মধ্যে আমার একটু একান্ত হইবার অবকাশ ছিল না। বোসজা ও মজুমদার ভায়া আমার বিরহটা একদম সহিতে পারিতেন না। পঞ্চানন প্রায় পাছু পাছুই ফিরিত ; না হয়— 'শুনেছেন মশাই' কি 'দেখেছেন মশাই' বলিয়া, একটা না একটা কিছু লইয়া, দণ্ডে দণ্ডে হাজির হইত। তদ্ভিন্ন চাটুয্যের সুখ-দুঃখের কথা, মনোনিবেশপূর্বক সম্যক্ সহানুভূতির সহিত নিত্য শোনাটা আমার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল।

একটা দিনের একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিলেই সকলে তাঁহার সুখ-দুঃখের কথার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন। একদিন দেখি, চাটুয্যে খুবই বিমর্ষভাবে রগ্ টিপিয়া বসিয়া আছে, চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, অধর ঈষৎ বক্র হইল, চাটুয্যে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—হঠাৎ কি হইল, ব্যাপারটা কি? চাটুয্যে মোটা নাকি সুরে বল্লে, 'ভোরে স্বপ্ন দেখলুম,—টেঁপি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাবা বাবা ক'রে কাঁদচে।' কি বিপদ! আমি জানিতাম,—টেঁপি তার চার নম্বরের মেয়ে এবং দেখিতে বজায় তাহারই অনুরূপ (বা দ্বিতীয় মূর্তি) হওয়ায়, তায় ভালবাসাটা তাহার প্রতিই সমধিক ছিল। তাহার এই 'ফ্যাক্‌সিমলিটি'র জন্য দুর্ভাবনাটা আমাকে কিন্তু তখন বিচলিতই করিয়াছিল।

যাহা হউক, আমি বলিলাম, 'তুমি তাকে বেশী ভাব ব'লেই স্বপ্ন দেখেছ, তাতে হয়েছে কি! স্বপ্ন কি আর সত্য হয়!' চাটুয্যে পূর্ববৎ থাকিয়াই বলিল, 'ভোরের-স্বপ্ন যে বাঁড়ুয্যে মশাই।' বলিলাম, 'আচ্ছা তাই যদি হয় ত' তাতে এতটা ব্যাকুল হবার কি আছে, টেঁপি তোমার খুব 'ন্যাওটো,' তোমার তরে তাঁর কাঁদাটা ত খুবই স্বাভাবিক।' চাটুয্যে

এবার একটু নাদ ও খাদ মিশ্রিত সিক্তসুরে বলিল,—'সে তবে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কেন?' কি ফ্যাসাদ! বড়ই মুশকিলে পড়িলাম, ওপথে সুবিধা হইল না। বলিলাম,—'যদি স্বপ্নে বিশ্বাসই কর ত ভাবনা কি; ও বিষয়ে শাস্ত্র যা বলেন তা মানতেই হবে, আর ও সম্বন্ধে 'খনাম্বুধির' চেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থও আর নেই। স্বপ্নাধিকারে খনা স্বয়ং বল্‌চেন—

হাসির চেয়ে কান্না ভাল—কাঁদলে পথে ঘাটে,
স্বপ্নের সেরা শোণিত দেখা—সামনে যদি কাটে।

এত' মেয়েরাও জানেন; তুমি যেটা ভেবে ব্যাকুল হচ্চ, সেটা সম্পূর্ণ সুস্বপ্ন; যাকে তাকে বোলোনা, তিন কান করতে নেই, নিষেধ আছে। অদৃষ্ট প্রসন্ন না হ'লে—ও স'ব দেখা প্রায়ই ঘটে না;—সাহেবের খিঁচুনি, আর পাওনাদারদের তাগাদার বিকটমূর্তিই এসে হাজির হয়।'

'ঠিক্ বলেচেন মশাই, এক একদিন আঁৎকে উঠি,' বলিয়া চাটুয্যে একদম্ চাঙ্গা হইয়া হাসিয়া ফেলিল, পূর্ব ভাবটা একেবারে কাটিয়া গেল। আমি বাঁচিলাম, কোথাকার জল কোথায় আসিয়া মরিল! তাহাকে লইয়া চা খাইতে গেলাম। সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা ছাড়া, এইরূপ অসাধারণ ফ্যাঁসাদও মধ্যে মধ্যে লাগিয়া থাকিত।

'দত্ত' আমার পূর্ব-পরিচিত ,এক ক্ষেত্রে কলিকাতায় কাজ করিয়াছিলাম। আমার উপর তাঁহার একটু ভাল ধারণা (good opinion) থাকায়, বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ কাটাইতেই হইত, ও বড় বড় উপদেশ-বাণী, অসামান্য আলোচনা এবং সুগভীর তত্ত্ব সকল হজম করিতে হইত; নচেৎ তাঁহার অভিমানের পরিসীমা থাকিত না।

ভারতের মানুষগুলার হাতগুলাকে পা'য়ের পর্যায়ে ফেলিয়াই তিনি দেখিতেন। তিনি পাকা পেসিমিস্ট ও সিনিক্ ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার আদর্শ খুবই উচ্চ ছিল। রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এবং জস্টিস রাণাডে ও চন্দ্রভার্কার ভিন্ন তাঁহার মুখে কাহারও সুখ্যাতি শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তবে, সাহেবদের রীতি-নীতি ও কার্যকলাপের তিনি পরম পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি ও অধ্যবসায়, দুইটিই উল্লেখযোগ্য ছিল। কেরানিগিরি করিতে করিতে,

ন্যূনাধিক ৪০ বৎসর বয়সে তিনি ফাস্ট্ আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হন। এইরূপ প্রকৃতির লোকেরা প্রায়ই সাধারণ-ঘেঁসা হন না ও সাধারণের অনেক উপরে নিজেরাই নিজেদের স্থান নির্দেশ করিয়া রাখেন। তাই, সাধারণেও সেই অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের আঘাতটা তাচ্ছিল্যের দ্বারাই পরিশোধ করিয়া, তাঁহাদের মতটাকে ও মেজাজটাকে আরো তিক্ত করিয়া তোলে। ফলে, তাঁহারা ঠিক সামাজিক লোক হইতে পারেন না! অভ্যাস বশতঃই হউক, বা অধিকারবোধেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক—কোন বিষয়ে কিছু বলিতে গিয়া, তাঁহারা এতবার ও এত অধিক 'আমি' ও 'আমার' শব্দ দুইটি ব্যবহার করেন, এবং 'আমি' ও 'আমার' কথা বা উদাহরণ আনিয়া ফেলেন যে, তাহা সাধারণের উপভোগ্য ত হয়ই না, বরং তাহা আত্ম-মহিমা-প্রকাশেই পরিণত হইয়া পড়ে।

দত্তর গুণাংশই অধিক ছিল, এবং আমি তাঁহার গুণগুলির খুবই পক্ষপাতি ছিলাম। কিন্তু তাঁহার ঐ 'আমি' আর 'আমার' ভাল প্রসঙ্গ গুলিকেও পীড়াদায়ক করিয়া তুলিত। যাহা হউক সকাল হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত আমার একান্ত হইবার অবসর ছিল না। এরূপ ঘটিবার প্রধান কারণ,—আমি সকলের সকল কথারই খুব সহিষ্ণু শ্রোতা ছিলাম। তাঁহারা আমাকে বক্তার অপবাদ দিলেও, সত্য কথাটা ঐ।

আকাশ পর্বত সমুদ্র ও জনশূন্য গভীর অরণ্য না দেখিলে, হৃদয় প্রশস্ত ও উদার হয় না এবং বিশ্বস্রষ্টার আভাসমাত্রও তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় না, এইরূপ ধারণাটা বরাবরই ছিল। এতদিনে ভাগ্যে যদি সমুদ্র দর্শন ঘটিল তাহা উপভোগের অবসর ঘটিয়া উঠে না। তাই রাত্রি ১১টার পর আমাকে সময় করিয়া লইতে হইত। তখন আমি নিশ্চিন্ত মনে জাহাজের সম্মুখ সীমায় গিয়া বসিতাম। সে অনাবিল বায়ুস্পর্শে শরীর-মন যেন নিষ্কলুষ হইয়া যাইত। সে সীমাহারা বিশাল বিস্তৃতির মহান্ মহিমা না বুঝিলেও হৃদয়-মন কি এক অজানা ভাবে ভরিয়া উঠিত, মস্তক আপনা আপনি অবনত হইয়া পড়িত, গভীর শ্রদ্ধার সহিত বারবার নমস্কার করিতাম, পরক্ষণেই সহসা যেন লক্ষ লক্ষ ভেরীমুখে বিশ্ববীণা

বাজিয়া উঠিত, সচকিত করিয়া দিত।

এই অনাদি শব্দকর্মশালা হইতে, শব্দ সুর তাল লয়, দিকে দিকে দেশে দেশে নব নব শব্দ ভাষা সঙ্গীত লইয়া ছুটিয়াছে। মানব জীবজন্তু বিহঙ্গ, তাহা নিজ নিজ নির্বাচন ও প্রকৃতি অনুসারে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। কি অশ্রান্ত সৃষ্টি, কি অনন্ত সঙ্গীত, কি আনন্দ-তাণ্ডব! থাক্, ক্রমে কবির অধিকারে আসিয়া পড়িতেছি। যাহার সীমা নাই, সসীম মানুষের কি সাধ্য যে, তাহার স্বল্প আভাসকেও ভাষা দিতে পারে।

সকল দিন (রাত্রি বলাই উচিত) মনের ভাব সমান থাকিত না। কোন কোন দিন নক্রের খেলা দেখিয়াই সময় কাটিত। তাহারা দলে দলে জাহাজের সম্মুখ ঘেঁসিয়া, এমন বেগে সাঁতার দিত, যেন কোন ক্রমেই জাহাজকে তাহাদের অগ্রে যাইতে দিবে না। জগতে কেহই পরাভব স্বীকার করিতে চায় না।

বঙ্গোপসাগরে কোন কোন দিন অবাক হইয়া দেখিতাম—সাগর-বক্ষে যোজনব্যাপী অনল প্রবাহ ছুটিয়াছে ; ঊর্মি-চূড়াগুলি প্রদীপ্ত স্বর্ণ-মুকুট-মণ্ডিত। এখানকার জলে ফস্‌ফরসের অংশ এত অধিক যে, সামান্য সংস্পর্শে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। একদিন জাহাজের চার ইঞ্চি মোটা, তিন-চার রশি লম্বা লোহার চেন আর অতিকায় নঙ্গরটি দেখিয়া কত কথাই ভাবিলাম। আমাদের ব্রজের বলিষ্ঠ বলরাম ঠাকুর সে 'হল্' বহন করিতে বোধ হয় বিশেষ বেগ পাইতেন। সূতা ও বঁড়শীর মত তাহাদের বিনা আয়াসে জলে ফেলিতে ও তুলিতে দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া ভাবিতাম,—বচনকে বিদায় দিয়া, এখনও কিছুকাল হাতে-কলমে শিক্ষা পাইলে, দেশের কথা মুখে আনিবার উপযুক্ত হইতে পারিব। হতাশের একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত।

৯

আগামী কল্য হংকং পৌঁছিবার কথা ; অতএব সকলে দিনে দিনেই পত্রাদি লেখাটা সারিয়া রাখিলেন। মর্ম সেই একই,—অর্থাৎ 'এখনও বাঁচিয়া আছি' এবং বিরহের যার যতটা বহর। আর, বর্ণনার মধ্যে জল বায়ু আকাশ ও মেঘ। তাহাতে অতিরঞ্জন বা মিথ্যা আড়ম্বর স্পর্শ করিবার আশঙ্কা মাত্র ছিল না ; কারণ, যিনি যত বড় বিশেষণে তাহাদের বিভূষিত করিবার চেষ্টা করুন না কেন, ভাষায় তাহা কুলাইবে না। শুনিয়াছিলাম একটি সাদাসিদে ব্রাহ্মণ-কুমার আর আর পাঁচ জনের অন্যতম হইয়া গ্রামান্তরে 'কনে' দেখিতে যান। ফিরিয়া আসিলে সকলে তাঁহার মতটাই বিশেষ করিয়া শুনিতে চান,—'কেমন দেখলেন, সুন্দরী কি না?' ইত্যাদি। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সে আর কি বোল্‌ব,—এই এত্তোবড় খোঁপা!' এই বলিয়া দুই হস্তদ্বারা একটি আদমুণি ধামার আকৃতির আভাস দিয়া ছিলেন মাত্র ; অর্থাৎ বাকিটা যাহার বুদ্ধি আছে বুঝিয়া লও। এখানেও সেই এক কথা—'কি আর বলব।'

প্রভাত হইতে প্রথমেই পক্ষীরা তীরভূমিব অগ্রদূত সম দেখা দিল। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া সেই ভীষণ তরঙ্গোপরি গিয়া বসিতেছে এবং আনন্দে দোল খাইতে খাইতে বহু দূর ভাসিয়া চলিয়াছে। জেলেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় পাল তুলিয়া, তীর হইতে তিন চার মাইল দূর পর্যন্ত মাছ ধরিতে আসিয়াছে। যেখানে জাহাজ থাকিয়াও নিরাপদ বলা চলে না, সেখানে জেলে-ডিঙ্গির গতিবিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ভাবিলাম,—ধন্য অন্নচিন্তা, তুমি করাইতে পার না এমন কিছুই নাই। পরে, পর্বত, জাহাজ ও উপকূল দেখা দিতে লাগিল। আমাদের জাহাজের গতিও মন্থর হইয়া আসিল। ক্রম গৃহাদি সমাচ্ছন্ন একটি পর্বত দেখা গেল ; সকলে আনন্দে বলিলেন—'উহাই হংকং'। বাস্তবিক তাহাই বটে।

এখানে জাহাজ লঞ্চ বোট ও ডিঙ্গী ব্যতীত রণতরীর কিছু বাহুল্য

দেখিলাম। তাহারা বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন চিহ্নাঙ্কিত পতাকায়, ইংরাজ, মার্কিন, জার্মান, ফরাসী, রুশ, জাপান প্রভৃতি শক্তির পরিচয় দিতেছে। বিবিধ আকার প্রকারের জাহাজ ও লঞ্চ, বন্দরটি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। যেন তৎসংলগ্নেই সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সকল মাথা তুলিয়া একের গায়ে অপরটি ক্রমোচ্চভাবে, ঊর্ধ্বপথ অবলম্বন করিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে; এবং বিভিন্ন বর্ণে, আকারে ও সজ্জায়—হংকংকে সমুদ্রবক্ষে একখানি রথ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ঠিক বিপরীতে, বন্দরটির অপর তীরে, ইংরাজ সেনানিবাস বা কেন্টন্‌মেন্ট্। বলা বাহুল্য যে, হংকং সহরটি ইংরাজ-অধিকৃত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতেছিল; বেলা আন্দাজ আটটার সময়, আমাদের জাহাজ হংকং বন্দরে নঙ্গর করিল। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলেই হংকং দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। এবার আরোহিমাত্রেই 'ছাড়' পাইল, কারণ জাহাজ আজ দিবারাত্র এইখানেই, থাকিবে, গতকল্য প্রাতে গন্তব্য পথ লইবে।

১০

জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিবার সঙ্গেই সঙ্গেই দশ বারখানি ডিঙ্গি সঙ্গ লইয়াছিল। সেগুলি ব্যবসায়ীদের নৌকা, বন্দর-সমাগত প্রত্যেক জাহাজেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। কোনখানি নানাবিধ ফল-ফুলে পূর্ণ ; কেহ শাক-সব্জী আনিয়াছে ; কোনখানিতে মৎস্য মাংস ও ডিম্ব আছে ; কেহ বা মদ, বিয়ার, সোডালিমনেড, সিগারেট, চুরট, দেশালাই বিক্রয় করে, কোনখানি সর্ববিধ মনোহারী দ্রব্য লইয়া উপস্থিত ; কেহ কাপড় জামা কোট প্যান্ট মোজা রুমাল টুপি ছড়ি আনিয়াছে, ইত্যাদি।

একখানি হইতে সহসা চার পাঁচটি সহাস্য-বদনা চিনা রমণী বাহির হইয়া বিদ্যুদ্বেগে জাহাজের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, একদম উপর-ডেকে আসিয়া উপস্থিত। একবার চারিদিকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে আরোহী সাহেবদের এবং জাহাজী সাহেবদের কেবিনে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও অপ্রতিহত গতি এবং হাস্যবিজড়িত অবহেলার ভাব দৃষ্টে, বাঙ্গালী আরোহীরা সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন,— ইহারাই আমাদের দত্তজা মহাশয়ের প্রমীলার সহচরী হইবে। মোগল-আস্তিন চ্যায়নাকোটের উপর পৃষ্ঠদেশে প্রলম্বিত বেণী, পরিধানে ঢিলে পাজামা, পায়ে মোজা ও জুতা, হস্তে সুদর্শন চক্রবৎ পাখা ;—আর, ভাব ভঙ্গীতে—

'অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে,
আমরা দানবী।'

যাহা হউক, তাহারা যেন তাহাদের পরিচিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল ; দর্শকেরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পঞ্চাননের দাঁত দু'পাটি যেন দাঁত-তোলা শাঁড়াসীর মত হাঁ করিয়া কিছু একটা ধরিতে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি রমণী কয়টি প্রত্যেকেই তোয়ালেতে বাঁধা এক একটি পুঁটলী

হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে কেবিন হইতে বাহির হইল. ও আমাদের সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। চাটুয্যে একটু দূরে বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখীন হইতেই সে একটু ঝুঁকিয়া সেলাম করিল ;—কিছুই বুঝিলাম না।

অনুসন্ধিৎসু পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—'মশাই. এই যেমন চীনের পুতুল, চীনের শোর, চীনের বাদাম হয় না, তেমনি ঐ ক'বেটী চীনের ধোপানী! শুনলাম সব জাহাজেই ওদের অবাধ-গতি ; সাহেবেরা ঢালা হুকুম দিয়ে রেখেছে ওদের যেন কেউ না রোখে। ওরা একদিনেই কাপড় কেচে এনে দেয়, সাহেবেরা ওদের তাই খুব পছন্দ করে।' পঞ্চানন এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। তাহার কথা সাঙ্গ হইতেই মজুমদার ভায়া বলিয়া উঠিল—'সত্যি ধোপানী নাকি এই মরেচে দেখচি!' পঞ্চানন বলিল,—'কেন, কি হয়েছে মশাই?' 'চাটুয্যেকে একবার ডেকে আন ত পাঁচু' বলিয়া মজুমদাব হাসিতে লাগিল। পঞ্চানন তাহাকে ডাকিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

চাটুয্যে আসিতেই মজুমদার গম্ভীরভাবে বলিল—'ঐ চীনে মেয়েমানুষ ক'টিকে চেন নাকি,—রেঙুনে ছিলেন বুঝি, ওঁরা কে?' চাটুয্যে বলিল—'জানেন না! হংকং-এর চীনে লাটের মেয়ে, জাহাজে বেড়াতে এসেছিলেন, কি রূপ দেখছেন?' মজুমদার আর গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিল না, কারণ ঠিক সেই সময় বোসজা না হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'পুঁতে ফ্যালো,—পুঁতে ফ্যালো!' মজুমদার অতি কষ্টে উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিয়া ইন্‌টারমিডিয়েট্ হাস্যের মধ্যে বলিল, 'সে কি? আমরা শুনলুম ওঁরা মালপাড়ার পুরুভুজ গোস্বামীর বংশ, তুমি প্রণাম না ক'রে সেলাম করলে দেখে অবাক্ হয়েছি, তাই তাঁরাও বোধ হয় পায়ের ধুলো দিতে দাঁড়ালেন না।' চাটুয্যে সত্যই একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—'বটে? তা আমি—' বোসজা আর থাকিতে না পারিয়া বলেন—'তুমি একটি ব্রহ্মদেশের ব্রহ্মদত্তি! ধোপানীগুলোকে সাত-তাড়াতাড়ি সেলাম করা হল যে বড়?' 'সত্যি নাকি বড়বাবু,—আপনি বলেন কি, তবে যে পাঁচু বল্লে—চীনে লাটের মেয়ে, জাহাজ

দেখতে এসেছে,—ভাল করে সেলাম কোরো, তানা ত' ভারতবাসীদের অসভ্য, ঠাওরাবে।'—'না বড়বাবু, আপনি ঠাট্টা করচেন, ধোপানী অমন হয়? আর তা হলে আমাদের কাপড়গুলো চাইত না?' বোসজা বলিলেন—'চাইত বই কি ; চায়নি এই ভাগ্যি, চাইলে আর আমাদের এগুতে হত না, এইখানেই জেলে পুরতো। বোল্‌ত,—কাপড়ে রাজ্জির সংক্রামক রোগের বীজ বিজ্‌ বিজ্‌ করচে, এরা সেই সব ছড়াতে এদেশে এসেছে।

চীনে রাজ্যের যে রকম কড়া আইন, জীবাণুর জড় মারবার জন্যে চাইকি আমাদের শুদ্ধু খাড়া পুঁতে ফেল্‌ত!' শুনিয়া চাটুয্যের মুখ ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল ; 'পেঁচোটা কি সর্বনেশে ছেলে, ও-পাপ ছেলে, ও-পাপ কি করে যাবে বড়বাবু, ও ত এখন সঙ্গেই চোল্‌ল। আর দেশও কি বিট্‌কেল মশাই—ধোপানীও যেন রাজপুত্তুর, কি করে চিন্‌বো বলুন। এই নাকে কানে খৎ, ধোপানী ত ধোপানী, আর মেথরাণী এলেও সেলাম করবো না।' কথাটা ভাবের মুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা নিজের প্রাপ্য আদায় না করিয়া ছাড়িল না, সকলে হো হো করিয়া একটু দীর্ঘছন্দে হাসিয়া বাঁচিল ; চাটুয্যে হাসির মূল কারণটায় লক্ষ্যই রাখে নাই। কি ভাবিয়া জানি না, চাটুয্যে হঠাৎ বলিল—'তা হলে সে বেটীদেরও ত উচিত ছিল আমাকে প্রণাম করা।'

মজুমদার বলিল—'তাদের দোষ দিতে পারি না,—তোমার উচিত সর্বক্ষণ কানে পইতে দিয়ে থাকা তানা ত' লোকে ব্রাহ্মণ বলে চিনবে কি ক'রে, (এবং একটু অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল— চেহারা দেখে মানুষ বলেই বোধ হয় ভাবতে পারেনি) যা হক তুমি একবার নেয়ে ফ্যাল, কাজটা অসামাজিক ত হয়েইছে, অশাস্ত্রীয়ও বটে।' চাটুয্যে অসহায়ভাবে আমার দিকে চাহিল ; আমি অভয় দিয়া বলিলাম, 'কেন শোনো ওসব কথা ; এই ত চণ্ডীদাস 'রামী' রজকিনীকে পূজা পর্যন্ত করতেন।' সেলাম-সমস্যা এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

যাহা হউক, কথাটা সত্যও বটে, দুঃখেরও বটে যে ভারতবর্ষীয় আরোহীদের দিকে তাহারা একবার দৃকপাতও করিল না। একবার

ভাবিলও না যে, তাহাদেরও কাপড় থাকিতে পারে, এবং সে কাপড় মলিনতায় সাহেবদের কাপড়কে চিরদিনই পরাস্ত করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিকই চাটুয্যে তাহার (সম্ভবত ফুলশয্যার) ফুলপেড়ে পরিয়া বসিয়াছিল ; ধপধপে ধোপানীরা চক্চকে দুল নাড়া দিয়া চলিয়া গেল ; সেলাম সত্ত্বেও একবার সেদিকে তাকাইল না।

দেখিতে দেখিতে আকণ্ঠ কয়লা বোঝাই তিনখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোট জাহাজের গাত্র-সংলগ্ন ফ্ল্যাটে আসিয়া লাগিল। তাহারা জাহাজে কয়লা যোগাইতে আসিয়াছে। ফ্ল্যাটের উপর চল্লিশজন চীনে মজুর পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। আমাদের দেশের মুটে মজুরদের যেরূপ চিরপ্রথা আছে, এ অবস্থায় গুড়ুকের একটা পাদিয়ান মহোৎসব, আলস্যভঞ্জন হাইতোলা এবং ধূমপানের সহিত গল্পের ধুম অনিবার্য। কিন্তু এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না।

বোট লাগিতেই, মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া চীনে কুলীরা ফ্ল্যাটের উপর দুই সার দিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এক সারের হাতেহাতে কয়লা বোঝাই টুক্‌রিগুলি ক্রমান্বয়ে জাহাজের মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল, এবং অপর সারের হাতেহাতে খালি টুক্‌রিগুলি বোটে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। প্রতি দশ ক্ষেপের পর এসারে ওসারে কাজ বদল হইতে লাগিল। কাজ যেন কলে চলিল!

এইরূপ চক্রগতিতে কাজ হইতে লাগিল, ও ঘণ্টা চারেকের মধ্যে অত বড় বড় তিনখানি বোটের কয়লা সহজেই জাহাজে পৌঁছিয়া গেল। কাজের সময় কাহারও মুখে টু শব্দটি শুনিলাম না। মুটে মজুরের কাজ যে এমন সুবিরামে ও সুশৃঙ্খলে হইতে পারে, পূর্বে সে দৃশ্য কখনও চক্ষে পড়ে নাই ; কলিকাতার কয়লাঘটে বা হাটখোলায় হৈ-চৈ হট্টগোলের হাটই দেখিয়াছি।

তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ আহার সারিয়া নৌকাযোগে তীরে নামিলাম। ঔৎসুক্যের প্রধান কারণ যে চিঠি পোস্ট করা, তাহা বলাই বাহুল্য।

১১

হংকং পরিদর্শনটা পদব্রজে করিবারই পরামর্শ স্থির হইল,—পোস্ট অফিসের পথ ধরা গেল। হংকং-এর রাস্তাগুলি তেমন প্রশস্ত নহে, পাহাড়ের উপর সেটা সম্ভবও নহে ; তবে পরিষ্কার, বড় রাস্তাগুলি দুইধারে ফুটপাথ দিয়া আঁটা। ঘোড়ার বা গরুর গাড়ির গোলমাল নাই,—রিক্সাই মানরক্ষা করিয়া থাকে। রাস্তায় একদিকে ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস্, সওদাগরী অফিস, হোটেল প্রভৃতি সাহেবী সৌষ্ঠবে শোভা পাইতেছে, অপর দিকে চিনাদের দোকান। সে-দিকটায় যেন কলিকাতার রাধাবাজার, চিনাবাজার, চাঁদনী ও মুরগীহাটার একীকরণ ঘটিয়াছে, কিন্তু পারিপাট্যে ও শিল্পসমাবেশে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এটা পাহাড় হইলেও রামগিরি নয়, এখানে মেঘ থাকিলেও তাহারা দৌত্য করে না, সে ভার পোস্টাপিসের। ইহাদের উদরকে বিশ্বাস করিতে পারিলেই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। পথের ধারে পোস্টাপিস পাইয়া নিজেদের পেটের কথা তাহারই পেটে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করিয়া, ঝাড়া হাতপা হইয়া বাজারে প্রবেশ করা গেল।

হংকং-এর বাজারটি একটি প্রকাণ্ড পাকা ইমারৎ, দীর্ঘে প্রস্তে প্রায় দুই বিঘা জমি আত্মসাৎ করিয়াছে। চারিদিকে সুউচ্চ গেট, মধ্যে তিনটি সুপ্রশস্ত বিভাগ। একটিতে কপি, আলু, বেগুন, মটরসুঁটি, শাকসব্জী ; একটিতে বিবিধ ফলমূল, অপরটিতে পিঁয়াজ, রসুন্, আদা, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি মশলা,—সেই প্রকাণ্ড বিভাগগুলি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ বিচিত্র ফলমূলের সমাবেশ ও প্রাচুর্য কুত্রাপি দেখি নাই।

বঙ্গদেশ ও কাবুলের পরিচিত ফলের মধ্যে বেল ও আতা দেখিলাম না। আঙ্গুর, আপেল, নাসপাতি, ডালিম, লিচু, আনারস, শশা, কলা, জলপাই, তরমুজ প্রভৃতির সৌন্দর্যে বাজারের রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখি, এই সুদূর সমুদ্র-বক্ষে ক্ষুদ্র পাহাড়টিতে তরমুজগুলির

মধ্যে আমাদের সাধের চাতুর্বর্ণের বীজ রক্ষিত হইতেছে। টেবিলের উপর কাটা-তরমুজগুলি বিক্রয়ার্থে সাজান রহিয়াছে—তাহাদের কোনটির মধ্যে সাদা রং, কোনটির লাল, কোনটির পীত, কোনটির বর্ণ সবুজ। সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের উপর মধুমক্ষিকার গুঞ্জন মধুর মজলিস্ বসিয়াছে।

আমরা পাঁচ আনায় বড় বড় একশত লিচু খরিদ করিলাম। প্রাপ্ত মাত্রেণ আমাদের প্রিয় পঞ্চানন পরিচয় লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল ও গালভরা কণ্ঠে বলিল—'মশাই, মজঃফরপুরকে মাৎ করেছে।'

ক্রেতাদের হস্তে মৎস্য মাংসাদি দেখিলাম, কিন্তু এত-বড় বাজারটির মধ্যে তাহাদের নাম-গন্ধও পাইলাম না! তখন অনুসন্ধান জানিলাম—এই বাজারটির নিম্নতলে মৎস্য মাংসের বাজার। সোপান-পথে মেচোহাটায় প্রবেশ করা গেল। যে অংশে মেচোহাটা সেটি যেন সমুদ্রগর্ভের সামিল।

মাছের বাজারে মেয়ে-পুরুষের প্রবেশ ও প্রত্যাবর্তনের ভিড় দেখিলে রথেও ভিড়ও পাতলা হইয়া পড়ে। সহস্র কণ্ঠের বেতালা চীৎকারে চৌষট্টি যোগিনীর যোগ ভঙ্গ হয়। তবে মেচুনীদের মাক্‌ড়ি, নথ বা অনন্ত নাড়ার বিভীষিকা ছিল না, কারণ বিক্রেতারা পুরুষ-মানুষ। তাহাদের সম্মুখে আবক্ষ-উচ্চ টেবিল ;টেবিলের উপর তিন-চারখানি ছোট বড় সুতীক্ষ্ণ ছোরা এবং টেবিলের উপরই দাঁড়িপাল্লা আঁটা। নীচে বড় বড় টবে মৎস্য রহিয়াছে, কেবল বাছা বাছা দুই চারিটি মাছ টেবিলের উপর থাকিয়া ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

ছোরার সাহায্যে অতি সত্বর ও সহজে আঁস ছাড়ান, মাছ কোটা, কাঁটা বাছিয়া বাহির করিযা ফেলিয়া দেওয়া,—দেখিলে অবাক হইতে হয়। খুব ছোট কাঁটাই কেবল থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। মির্‌গেল মাছটাই মালে ও মূল্যে বড় দেখিলাম ; বোধ হইল, এ অঞ্চলে ঐ মাছটাই স্বাদু ও প্রিয়।

এই নিম্নতলের অপরার্ধ নানাপ্রকারের, মাংস, পক্ষী ও ডিম্বে পরিপূর্ণ। এখানকার গৃহস্থেরা বটে 'মৃগমাংস পক্ষমাংস যেবা ইচ্ছা হয়' বলিয়া আগন্তুক অতিথিদের অনায়াসেই আপ্যায়িত করিতে পারেন। একপ্রান্তে দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহে টগবগ করিয়া গরম জল

ফুটিতেছে। জীবন্ত কুক্কুট হংস, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীর পা বাঁধিয়া তন্মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দু'এক মিনিট পরেই তাহাদের তুলিয়া লইয়া, অতি সহজে মুহূর্ত মধ্যে উপরের পালকশুদ্ধ ছালখানি তুলিয়া ফেলিয়া, পাখীগুলি ক্রেতাদের হাতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ-এক ফোঁটা রক্ত না বাজে নষ্ট হয়,—সমস্তটুকু যাহাতে ক্রেতাদের পেটে পৌঁছায়, আর যাহাতে সহজে পরিষ্কারভাবে ছালটি ছাড়ান হয়,—এই দুই কারণে এই বীভৎস কাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, এবং লজ্জার কথাও কম নহে যে, এমন সহজ উপায়টি—যাহা চিনাদের মগজে আসিয়াছে, রক্তবীজ বধের সময় তাহা দেবগুরু বৃহস্পতিরও বুদ্ধিতে আসে নাই।

কতকগুলি কারণে পানের প্রয়োজনটা বড়ই তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা ভাবিতেছেন তাহা নহে,—এই অকূল জলময় রাজ্যে প্রাণ হাতে করিয়া, স্ফূর্তির ফিন্‌কিটুকু পর্যন্ত কাহারও ছিল না। জাহাজে বমন-প্রবৃত্তিটা মধ্যে মধ্যে উদয় হইয়া একটা অস্বস্তি আনিয়া দেয়, তদ্ভিন্ন আজকাল গুড়ুক্ ও গল্পেই দিন গুজরান হইতেছিল; এইরূপ ক্ষেত্রে পাটনাই রসনার রজন স্বরূপ। তৃতীয়তঃ আমাদের মধ্যে দু'-একটি পানের পোকাও ছিলেন।

যাহা হউক, একটি ফুটপাথে দেখি, দুইটি চিনা পান বেচিতেছে। অতি লোলুপের ন্যায় তাহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া গেল, এবং দরদস্তুর না করিয়াই এক ডজন পান সাজিয়া দিবার হুকুম দেওয়া হইল। তাহারা দুইটি তুলি বাহির করায়, পঞ্চানন বলিল,—'মশাই এরা তুলি বাগায় কেন, চেহারা তুলবে নাকি?'

মজুমদার ভায়া বলিলেন—'চাটুয্যেকে একটু তফাৎ কর।' পরে দেখি, তুলির সাহায্যে পানে চুণ-খয়েরের প্রলেপ লাগাইয়া প্রত্যেক পানটিতে পরিষ্কারভাবে ছাড়ানো একটি করিয়া আস্ত সুপারী দিয়া সুন্দর খিলি করিয়া দিল। ভাবিলাম, এ খিলি চর্বন করিতে হইলে দন্ত কয়টি আর চিন পর্যন্ত পৌঁছিবে না। কার্যকালে কিন্তু কোন কষ্টই অনুভব করিলাম না; এতই মোলায়েম যে, দন্তের নিকট তাহারা খুবই বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করিল, অথচ সুপারীগুলি কাঁচাও নহে;—

চীনের হুনুর বটে! উত্তর চীনে পান পাওয়া যাইবে না, সুতরাং উদ্‌যাপনের উপযোগী আয়োজন লওয়া হইল। প্রত্যেক পানটি এক পয়সা হিসাবেই পড়িল।

হংকং-র শিখরদেশে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী, সওদাগর প্রভৃতি বড় লোকের বাংলা বানাইয়া বাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানটি স্বাস্থ্যকর, বিরলবসতি এবং সকল সময়েই ঠাণ্ডা। সহর হইতে তাহা অর্ধাধিক মাইল ঊর্দ্ধে, এবং নিম্ন হইতে প্রায় সোজাই উঠিয়াছে; অতি অল্পই ঢালু। সত্বর ও অনায়াসে শীর্ষদেশে পৌঁছিতে হইলে 'পীক্-ট্রামে' (peak-tram) যাওয়াই সুবিধাজনক। প্রতি দশ মিনিট অন্তর, প্রায় ৩০ জন আরোহী লইয়া, নিম্ন হইতে একখানি গাড়ি ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং ঊর্দ্ধ হইতে একখানি গাড়ি নিম্নে নামিতেছে। পাহাড়ের গায়ে লাইন পাতা আছে এবং প্রধানতঃ তারের কাছির (wire rope) সাহায্যে, তাহাদের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি পরিচালিত হইতেছে। দেখিলে বাস্তবিকই ভয় হয়। তাহাতে আবার Single line, অথচ দুইখানি গাড়িই একই সময়ে ছাড়ে। মধ্যপথে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, সেখানে একটু পাশ কাটাইবার পথ বা Siding-এর মত আছে; একখানিকে সেই Siding-এ ঢুকিয়া অপরখানিকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়।

আমার সহযাত্রীরা সম্ভবতঃ বিদায়কালে 'রণে যেতে বাধা দিও না' বলিয়া গ্যালেন্ট্রির গৌরব লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই peak-tram-এর সাহায্যে শিখরদেশ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তত্রাচ বলিলাম—'অভিযান-ব্যপদেশে উত্তর-চীনে চলিয়াছি, যদি মরিতেই হয় ত শুনিতে পাই রণে মরিলে স্বর্গ লাভের সম্ভাবনা আছে। এখানে মরিলে পাহাড় না হয় সমুদ্র লাভ ঘটাই সম্ভব, দেখ—যেটা সুবিধাজনক বোধ হয়!' ফল কথা, আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, মনটাও ততোধিক অবসন্ন ছিল;—কারণটা বলাই ভাল।

একটা কথা আছে—'চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই'। কথাটা বোধ হয় নিজের দেশে, স্বগ্রামে, বিশেষ করিয়া পরিচিত স্থলে কাজে

লাগিতে বা সাহায্য করিতে পারে। সম্ভবতঃ আদ্য-শ্রাদ্ধের সংস্রবেই ইহার জন্ম,—যে ক্ষেত্রে ও যে সময়ে বঙ্গদেশে বিশখানা লুচি, ষোলটা মোণ্ডা ও আধসের চিনি, ছোট-বড়-নির্বিশেষে যজ্ঞোপবীত-ধারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

যাহা হউক, উক্ত বচনটাই আমরা সুবিধামত পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিয়া থাকি। কথাটা কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মানায় না—চলে না ; যথা—কর্মস্থলে, যুদ্ধস্থলে, দেশান্তরে সভায়, শ্বশুরালয়ে ইত্যাদি। ভারতের অপর সকল জাতিই, শরীর ও সম্মান যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, নিজ নিজ স্বদেশী পোশাকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়াই মনে হয়। (অবশ্য উড়িষ্যাবাসী ও মান্দ্রাজের সকল শ্রেণীর কথা জানি না) কিন্তু বাঙ্গালীরা নিজেদের সনাতন ধুতি চাদর ও পিরান পরিয়া যে তাহা পারেন না, সেটা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কেন বলা যায়—তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই উল্লেখ করিলাম।

কলিকাতার বাসাড়ে চাকুরে বাবুদের শনিবারের পোশাকেই আমরা জাহাজে পদার্পণ করি, (মাইনাস্—চাদর ও মোজা) আর মাথার চুল ও চিন্তা ছাড়া আমাদের ত' কোন কালেই অন্য আবরণ নাই। কাহারও হুঁশ্ ছিল না যে এই পোশাকটা জাহাজে বা দূর বিদেশে কতটা শোভন, সুবিধাজনক ও সচল হইবে।

জাহাজে সহযাত্রীদের মধ্যে ছোটখাট কয়েকটি তথাকথিত সাহেবলোগ ভিন্ন, যুবরাজ সদৃশ মাতব্বর ও মেমলোগ না থাকায়, পোশাক সম্বন্ধে আমাদের কাহারও নজর পড়ে নাই। ধুতি ও গেঞ্জী বা ধুতি ও শার্টই আমাদের সাজসজ্জার চূড়ান্ত ছিল। ঠাণ্ডা বোধ হইলে জুট ফ্ল্যানালের সরকারী vest-ই chest রক্ষা করিত।

তিন সপ্তাহ জাহাজী জুলুম সহ্য করিয়া, এক প্রকার আমাদের অলক্ষ্যেই তাহাদেরই অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফল কথা, পরিচ্ছদের মালিন্যে ও দৈন্যে, আমরাও বোধ হয় নিজেদের অজ্ঞাতে, ফলোয়ার (কুলি) শ্রেণীর মধ্যেই পরিগণিত হইয়া পড়িতেছিলাম।

জাহাজের কাপ্তেন, চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ও শিক্ষানবিস খাঁটি কুলীন্ (European) কয়জনও তাহাই ঠাওরাইয়া থাকিবেন। কারণ, তাঁহাদের ত' সে অধিকার বরাবরই আছে,—এ ক্ষেত্রে ত' কথাই ছিল না।

বিষয়টা সিঙ্গাপুরে নিজেদের নজরে পড়ে নাই, কারণ সেখানে ঘোরাফেরাটা গাড়ীর সাহায্যেই সমাধা হইয়াছিল। কিন্তু হংকং সহরে পদব্রজে ভ্রমণকালে, কি ইংরাজ, কি পারসী, কি জাপানী, কি চিনা, কি গুজরাটী, কি পাঞ্জাবী, কি বোম্বাইওলা সকলকেই দেশকালোচিত সর্বাঙ্গ-ঢাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে পাইয়া, আমাদের দৈন্যটা জনসমাকুল রাজপথের মাঝখানেই উলঙ্গ হইয়া দেখা দিল। এই অভব্যতার ফলটাও কয়েক স্থানের আদর অভ্যর্থনা ও কথাবার্তায় বেশ সুস্পষ্টই অনুভূত হইল ;—

—গ্রামার-দুরস্ত বিশুদ্ধ ইংরাজি বলিতে কেহ ভুলিল না,—আমোলও দিল না। সহ-সহচর আমাদের মোটা টাকা বেতনের বড়বাবু (বোসজা মশাই) বেওকুব বনিয়া ফিরিলেন।

বাস্তবিক সে অসবর্ণের দেশে, আধময়লা ধুতি-পরা, শার্ট-গায়, মাথা-খোলা মানুষের কোন কদরই হওয়া সম্ভব নয় ; সেটা ত আর কলিকাতার 'কস্টম্ হাউস্' বা 'জেটি' নয়। গত্যন্তরও ছিল না, সব সময়টা অত্যন্ত হাসিমুখে হজম করিয়া হংকং দেখা খতম করিতে হইল। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাহার সামান্য মাত্রও আত্মসম্মানবোধটা সচেতন ছিল, তাঁহাকেই সারা পথটা অস্বাচ্ছন্দ্যেই সারিতে হইয়াছে। এই 'নড়েভোলার' মত পথে পথে ঘুরিতে পদে পদে লজ্জাবোধ হইয়াছে।

এমন অবস্থায় যখন বুদবুদের peak-tram-এ চড়িয়া হংকং পাহাড়ের শিখরদেশ দেখিবার সখ চাপিল, তখন বোসজাকে বলিলাম—'এর-ওপরেও 'উঁচু' যাবার ইচ্ছা করচেন,—আমি কিন্তু ন্যায্যটাই গ্রাহ্য করলুম,—আপনারা যান!' বোসজা সকল কথা সামান্য ইঙ্গিতেই বুঝিতেন, তিনি বলিলেন—'ঠিকই ঠাউরেচেন, এখন ভাবচি—একটায় ঠকেচি বলে, সকল বিষয়ে ঠকি কেন?—আর ঘটে না ঘটে!' এইখানেই ব্রাহ্মণ আর কায়স্থে তফাৎ, ব্রাহ্মণ চটেই মাটি করেন।

মজুমদার-ভায়া চিরদিনই একটু সৌখিন মানুষ, তবে দলে ও জলে পড়িয়া স্রোতোধীন চলিয়াছিলেন, তাঁহাকেও লজ্জাটা হাড়ে-হাড়ে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি গম্ভীরভাবে চুপ করিয়াই রহিলেন,—একটি কথাও কহিলেন না। বুঝিলাম peak দেখিবার প্রলোভনটা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা ট্রামে উঠিলেন, আমি নিয়ন্তা-নির্দিষ্ট নসীব লইয়া নীচু পথ ধরিলাম। ইহাতে কেহ এমন মনে করিবেন না যে, আমার আত্মসম্মানবোধটা সর্বাপেক্ষা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল ; সম্ভবতঃ শ্রান্তি ও আমার nervousnessই আমাকে বাধা দিয়া থাকিবে।

যাহা হউক, চিন্তা লইয়া এককই ফিরিলাম। মেঘ করিয়াছিল,— মনটাও ঘোলাটে হইয়া গেল। ভাবিলাম,—শুনিতে পাই আমাদের দেশ নাকি সমুদ্রপারে দেশদেশান্তরে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র জোগাইত, এবং সওদাগরেরা নাকি তাহা সাদরে ও সাগ্রহে লইত ; তবে এত বড় বস্ত্রপ্রসূ দেশের বাসিন্দাদের পরিধেয়টা এমন কেন?

এটা যদি অনাবশ্যকের প্রতি অনাস্থাজনিত ত্যাগের নিদর্শন হয়,— কথাটা বেশ পাকা রকম শোনায়, শ্রুতিসুখকরও বটে, তাহাতে ভারতের ধাতও বজায় থাকে। কিন্তু নিজের চৌহদ্দির বাহিরে সেটা যদি শরীর, সম্মান ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইত, তবেই সুখের হইত। বচনই আমাদের বর্ম,—'ময়রায় মেঠাই খায় না' এই রক্ষাবন্ধনই বোধ হয় আমাদের রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। থাক্—গোলামের গবেষণা কোথাও গ্রাহ্য হইবে না, সুতরাং এ প্রগল্ভতা থামাই ভাল। আসল কথা, বস্ত্রের দৈন্য ও মলিনতাটা তখনও পথের মাঝে এবং আমার মনের মাঝে ধাক্কা দিতেছিল।

১২

সঙ্গীদের 'দুর্গা' বলিয়া বিদায় দিয়া, একটু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলাম। সরকারী আপিস, ব্যাঙ্ক্ পুলিস্, সর্বত্রই পাঞ্জাবী শিখপ্রহরী দেখিলাম। প্রত্যেক চৌমাথাতে শিখেরাই পাহারা দিতেছে। এক জনের সহিত কথা কহিয়া জানিলাম, তাহারা হংকং অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসিয়াছে, এবং ক্রমশঃ স্ত্রী-পুত্রও আনিয়াছে।

এতাবৎ বিশেষ সম্মানের সহিত ইংরাজ বাহাদুর ২৫।৩০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ২৫০।৩০০, এমন কি তাহা অপেক্ষা অধিক বেতন দিয়াও তাহাদের রাখিয়াছেন। হংকং-এর শিখ-সৈন্য ইংরাজ সরকারের একটি স্পর্ধার সামগ্রী। এরূপ সুনির্বাচিত সুদীর্ঘ সুন্দরকায় ও বলিষ্ঠ পুরুষদের সমাবেশে সম্পূর্ণ রেজিমেন্ট ও পুলিস গঠন করা সহজসাধ্য নহে। ইহাদের পরিচ্ছদাদিও সুন্দর ও সম্মানসূচক। রাজপথের স্থানে স্থানে ইহারা যেন এক একটি সজীব সূদৃশ্য স্তম্ভস্বরূপ শোভা পাইতেছে।

জনৈক শিখ-সৈনিকের সহিত আলাপ হইল ; সৈনিকটি বলিল— 'আমাদের এতাবৎ যা একটু কদর ও সম্মান ছিল,—চিন অভিযান্ কালস্বরূপ হইয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত দিল।

ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে কোন ভারত-সৈন্য আসে নাই,—আমরাই সর্বাগ্রে আসিয়াছি, এবং এই রাজ্য জয় ও সরকার বাহাদুরের হুকুম পালন করিয়াছি,—সে জন্য সম্মান ও আদর পাইয়াছি। এখন দেখিতেছি, হিন্দুস্থান নিরন্ন হইয়াছে ;আজ কিনা সহস্র সহস্র ভারত-সৈন্য, হংকংকে অর্ধপথে ফেলিয়া, সুদূর উত্তর চীনে ১০।১২ টাকা বেতনে প্রাণ দিতে চলিয়াছে! আর কি সরকার বাহাদুর আমাদের এই উচ্চ বেতন,—প্রতি তিন বৎসরে ৩।৪ শত মুদ্রা ইনাম, এবং দেশে যাইবার জন্য তিন-মাস করিয়া ছুটি ও পাথেয় দিয়া পোষণ করিবেন? এ যাবৎ আমাদের, ইংরাজ-সৈন্যের সহিত প্রায় একই পর্যায়ে ও ব্যবস্থায় রাখা হইয়াছে।

আর কি আমরা তাহা আশা করিতে পারি?' ইত্যাদি। লোকটির প্রত্যেক কথায় হতাশা ও অভিমান প্রকাশ পাইতেছিল। মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া কথা সংক্ষেপ করিবার জন্য বলিলাম—'অনুমানের উপর এতটা ভয় পাইতেছ কেন?' পরে—সেলামের আদান-প্রদান সত্বর শেষ করিয়া বিদায় লইলাম।

দেখিলাম, হংকং-এর সহরে বিস্তর বোম্বাই অঞ্চলের লোক, সিন্ধুদেশবাসী ও পাঞ্জাবী, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীর বিভব-বিভাগটা যেন সম্মুখে সমুদ্র ও পশ্চাতে পর্বতের চাপে জড়সড় হইয়া এক বর্গ মাইলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পাঞ্জাবীরা মুদীখানার দোকানও খুলিয়াছে,— বড়ি, বেসন, পাপর, পকৌড়ি,— নাগাইত চানাচুর— সবই বর্তমান!

মাথার উপর মেঘ শাসাইতেছে, অধিক দেখিবার আর অবসর নাই; কিন্তু একটি পার্শ্বপথকে উপেক্ষা করিয়া কোন ক্রমেই এক পা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। পথটির দুই ধারে ফুলের বাজার বসিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড়ই শ্রান্তি বোধ হইতেছিল, এবং ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই স্থানটির সুমধুর সৌরভে ও শীতল বায়ুস্পর্শে বড়ই আরাম বোধ করিলাম। বিবিধ চাতুর্য্যে ও নানা নৈপুণ্যে সুগন্ধি পুষ্পের কমনীয় মালা, মেখলা, তোড়া, বেড়, কবরীবন্ধ, পাখা, অলঙ্কার, আসন, পর্দা প্রভৃতির রচনা দেখিলে সেই পুষ্পসম্ভার মধ্যে পূর্বশ্রুত গন্ধর্বনগরীর চিত্র ফুটিয়া উঠে, এবং চিনাদের বিলাসিতার বহরটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। শীতল সুগন্ধে স্থানটি পথিকদের আনন্দ-মদির করিয়া মধুর আবেশ আনিয়া গতিভঙ্গ করিতেছে। বস্তুতই পথটি যেন বসন্তোৎসব জাগাইয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এ কি! একটি বিসদৃশ ব্যবস্থায় সমস্ত সৌন্দর্যটাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। বিক্রেতাগুলি অর্ধ-ক্ষৌরিত মস্তক— পাজামা-পরা পুরুষ মানুষ! তাহাদের স্থূল কর্কশ হস্তে এই সুকুমার সৌন্দর্যের ভার পড়িয়া কমনীয়তায় যেন নিষ্ঠুর আঘাত করা হইয়াছে। ও-দিকে ব্রহ্মদেশে ত' এরূপ বেসুরো ব্যবস্থা নাই,— এটা কি তবে চিনাদের 'ব্যাসকাশী!' আমি কোন দিনই রুচিগ্রস্ত নহি, তথাপি এই দৃশ্যে আমার প্রাণও বিদ্রোহ

করিয়া উঠিল। কারণ, বাল্যকাল হইতে যে সব গল্প শোনা গিয়াছে, তাহাতে প্রায় সকল রাজপুত্রই মালিনীর মালঞ্চে গিয়া ঠেকিতেন, এখানে ঠেকিলে মাম্‌দোর হাতে পড়িতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরে' হীরা মালিনী না থাকিলে রায় গুণকারের 'রায়ে' কেইবা কান দিতেন! 'রজনী' অন্ধ ছিল, তবু তাহার হাতের ফুল হুলস্থুল বাধাইয়াছিল। ফল কথা, হীরা, মাণিক, মুক্তা, স্বর্ণকে আশ্রয় করিয়াই শোভন হয়।

হঠাৎ পাহাড়টির শীর্ষ দেশে চাহিয়া দেখি— সবটাই গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন। সেখানে বড় বড় সৌখিন সাহেবরা 'বাংলো' বানাইয়া বাস করেন ও শীতল বায়ু সেবন করেন। আমার অপ্রচুর-পোশাক-পরা সঙ্গীদের জন্য ভাবনা হইল,— ঠাণ্ডাটা খুবই ভোগ করিতে হইবে। যাঁহাদের উচ্চস্থানে অধিকার, তাঁহারা চিরদিনই উচ্চে থাকুন ;আমি নীচু যাওয়ার নসীব লইয়া অবতরণ করিতে করিতে একেবারে সমুদ্র-তীরে হাজির হইলাম।

তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, হাওয়া ক্রমশই প্রবল হইতেছে, তরঙ্গের উন্নতির মুখ ;— ঘাটেও নৌকার ভিড় নাই। শুনিলাম, নৌকার মালিকেরা নৌকাগুলি নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছে। কেবল যাহাদের হাঁড়ি চড়াইবার কড়ি তখনও সংগ্রহ হয় নাই, তাহারাই পাড়ি মারিয়া বেড়াইতেছে। যেমন আদালতের আবছায়ায় এক শ্রেণীর জীব— অপরের বিপদকে উপায়স্বরূপ ধরিয়া নিজেরা বাড়িয়া উঠিতে থাকে ও স্ফূর্তি লাভ করে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে দু'একজন এমনও আছে যাহারা এই দুর্যোগগুলিকে রোজগারের উপায় বলিয়াই গ্রহণ করে।

যাহা হউক, নৌকার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছি, ইতিমধ্যে দু'একটি আমাদের সহযাত্রী মান্দ্রাজী সঙ্গী আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা তৎপর হইয়া একখানি নৌকার মালিকের সহিত দরকসাকসি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাঝি ত প্রথমতঃ নৌকা ছাড়িতেই নারাজ,— পরে চতুর্গুণ ভাড়া চাহিল।

তাহাদের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া এবং ঝড় আসন্ন বুঝিয়া আমি মাঝির কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম, কারণ আর ইতস্ততঃ করিলে জাহাজে পৌঁছিবার উপায় থাকিবে না, এদিকে বেলাও অবসান।

বুঝিলাম, মান্দ্রাজী সঙ্গীরা আমার এই ত্বরা দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন। আমি তাঁহাদের ডাকিয়া লইলাম ;— নৌকা খুলিল এবং অতি কষ্টে তরঙ্গ ও তুফান অতিক্রম করিয়া আমাদের জাহাজে তুলিয়া দিল।

জাহাজের মাল্লারা বলিল,— 'দিন থাকিতে ভালয় ভালয় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে ; হাওয়াটাতে যেন টাইফুনের (Typhoon) আভাস পাওয়া যাইতেছে।' কিছুই বুঝিলাম না, তথাপি 'টাইফুন্' কথাটার যেরূপ দীর্ঘ ছুঁচোলো উচ্চারণ কানে ঠেকিল বা বিঁধিল, তাহাতেই মুখ চূণ হইয়া গেল! সাইক্লোন্, টর্‌নেডো প্রভৃতি শ্রুত ছিল, কিন্তু টাইফুন্ শব্দটা যেন তাহাদের অপেক্ষা ওজনে ঢের ভারী ও ভীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইল।

তবে বন্দরে বাঁধা জাহাজ ; ঘর বলিলেই হয়। ঘরে আমাদের সাহস অসীম ; সুতরাং টাইফুন্ দেখিবার সাধটা স্বতঃই আসিল। কিন্তু নিজে জলে থাকিলেও আজ ডাঙ্গার সঙ্গীদের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম এবং উপরের ডেকে গিয়া তাঁহাদের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যতই উত্তরোত্তর বৃষ্টি, বায়ু, বিদ্যুৎ, তরঙ্গ, একত্রে মিলিয়া প্রবল হইতে লাগিল, ততই আমার এই দুর্গম পথের স্বদেশী সঙ্গীদের জন্য চিন্তা ও উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল।

ক্রমে লঞ্চ্, স্টীম্‌বোট নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইল। বড় বড় জাহাজ ও স্টীমার পাল গুটাইয়া মাস্তুল নামাইল, এবং উপরে (Canvas) ছাত খুলিয়া ফেলিল, চারিদিকে নঙ্গর পড়িল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। স্টুয়ার্ড (Steward) আসিয়া বলিলেন,— 'আপনারা খেতে যাননি কেন— খাবেন না?' আমি তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন ও বলিলেন— 'একে এই দুর্যোগ, তায় নূতন লোক, অপরিচিত স্থান। এখনি এ বিষয় চিফ্ সাহেবকে রিপোর্ট করা উচিত, তিনি অনুসন্ধানে লোক পাঠাতে পারেন ; কিন্তু বড় রাগ করবেন।'

এইবার আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম ; দু'এক মিনিট পরামর্শের পর চিফ্ সাহেবকে রিপোর্ট করাই স্থির করিলাম। ঠিক্ এই সময় সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি আলোক আমাদের

অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া স্টুয়ার্ড বলিলেন—'এটা কি আগে দেখা যাক্।' দেখিতে দেখিতে একখানি ক্ষুদ্র লঞ্চ্ আমাদের জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া লাগিল এবং তন্মধ্য হইতে আমার বহু প্রতীক্ষিত সঙ্গীরা ভিজে বিড়ালগুলির মত অতি কষ্টে সিঁড়ির ও দড়ির সাহায্যে জাহাজের ক্রোড়স্থ্ হইলেন। আমি যেন বাঁচিলাম, স্টুয়ার্ড উঠিলেন—Thank God (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ)।

বোসজা বলিলেন— 'কিছু আর বলবেন না, আপনার কথা না শুনে—প্যাঁজ-পয়জার দুই-ই হয়েছে! ঝাড়া ৩।৪ ঘণ্টা এই ঝড়বৃষ্টিতে একটানা ভিজেছি; সকল রকম চেষ্টা পেয়েও একখানা নৌকা যোগাড় হল না; শেষে একজন সাহেবকে ধরে দু' পেগ হুইস্কী খাইয়ে তারি সুপারিসে একখানা লঞ্চ—(হাঁড়ির বদলে টোপর)—পাওয়া গেল, তাই রক্ষা।

তারপর ঝকঝকে দুটি গিনি অর্থাৎ কনকনে তিরিশটি টাকা, আক্কেল-সেলামী দিয়ে,— এই বত্রিশ হাত বৈতরণীটুকু পার হয়ে আস্ছি। মনে রাখবেন— পথ খরচের আর সিকি পয়সাটিও পকেটে নেই। এখন লজ্জার বদলে— গরম গরম এক কাপ ক'রে চা দিয়ে প্রাণ বাঁচান।' স্টুয়ার্ড কাজের কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তিনি সহাস্যে বলিলেন,— 'আমি এতটা নির্দয় নই যে,— এই অবস্থায় এক কাপ ক'রে ব্যবস্থা ক'রব,— আমি সব সাজ সরঞ্জাম আর ত'য়েরি দু' কেটলি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাঁর যতটা দরকার ঢেলে নেবেন। বলেন ত ঐ সঙ্গে ডিনারও পাঠিয়ে দি।' 'সেই ভাল' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম,— কারণ তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে।

সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই কষ্ট হইতেছিল, যেন ডুবো আসামী! সকলে কাপড় ছাড়িলেন,— সঙ্গে সঙ্গে চা'ও আসিয়া পৌঁছিলে; ক্রমে ডিনার,— একেবারে জামাই-ষষ্ঠী! কখন বিস্কুট, কখন চপের সঙ্গে চা চলিতে লাগিল; পাঁচুর উৎপাতে চাটুয্যে দু'চারখানা চপ পকেটে ফেলিল। আমি বলিলাম— 'বোসজা মশাই, এত কষ্ট আর ভয় পাবার কারণ কি ছিল? এ সব তো হোটেল-প্রধান দেশ,— একটা হোটেলে রাতটা কাটালেই হ'ত।' মজুমদার ভায়া বলিলেন— 'এ পোশাকে

পাঁদাড়েও স্থান পেতাম না।' বুঝিলাম— পোশাকটির জন্য পশ্চাত্তাপ ও লজ্জা সকলেরই দেখা দিয়াছে। বোস্‌জা বলিলেন— 'সেটা ঠিক বটে কিন্তু প্রত্যূষেই জাহাজ যে ছেড়ে যাবে সেটাও ত' ভুলিনি ;— চাকরী বড় চিজ,— ওটি আমাদের 'প্যানামা',— পেট আর পাওনাদার, এ দুয়েরেই ভার বহন করে! তার ওপর— এই দ্বীপান্তরে ছেড়ে গেলে, ঝি হাঁড়ির হালই হত!' আমি বলিলাম—'রাজপুত্তুরও ন'ন্, দুয়োরাণীর গর্ভেও জন্মাননি, আর এমন কোনও পাপও করেননি, যা'তে দ্বীপান্তর হব।' তিনি উত্তর করিলেন,— 'ও কথা বলবেন না, কিসে যে পাপ হয় তা কেউ বলতে পারে না ; এই ধরুন গৃহিণীকে তাঁর মনের মত অলঙ্কার দেওয়া হয়নি।' মজুমদার— 'এই ধরুন— জুলপি দুটো ,ভ্রুর parallel-এ এক ইঞ্চি ওপরে— মুড়িয়ে কামানো হয়নি!'—ইত্যাদি হাস্য-কৌতুকে মজলিস জমিয়া উঠিল। মজুমদার ভায়া তখন আমার একাকী প্রত্যাবর্তনের পালাটা শুনিতে চাহিলেন ;—মতলবটা,— যাহাতে আরো কিছুক্ষণ এই আনন্দ-মজলিসটা চলে। সকলে উৎসাহের সহিত অনুমোদন করায় অগত্যা আমি সম্মত হইয়া সুরু করিলাম।

ক্রমে পুষ্প-বিপণীর বর্ণনা শেষ করিয়া, যখন তাহার বিসদৃশ রূঢ় অংশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ বিক্রেতাদের সম্বন্ধে, আমার অভিমত ব্যক্ত করিলাম, এক মজুমদার ভায়া ভিন্ন তাহাতে আর কাহারো সহানুভূতি পাইলাম না। সকলেই এক বাক্যে বলিলেন— 'তাতে দোষ কি, এ আপনার অন্যায় কথা,— এ সম্বন্ধে আমার মেয়ে-পুরুষ কি?— ফুল নিয়েই কথা। ধরুন— একটা মোহর,— তা সেটা স্ত্রীলোকের হাত থেকেই পান, আর পুরুষের হাত হতেই পান,— মূল্য এক-ই! বাজারে তার ইতর-বিশেষ আছে কি?' বলিলাম— 'তাই ত,— তোমরাও যে সেই এক ইউনিভারসিটিরই এম্-এ, তা জানতুম না! কিন্তু সব-জজেও যে তোমাদের এই প্রত্যক্ষ সত্যটা বুঝতে পারে না— এই আশ্চর্য!' শুনিয়া সকলে সাগ্রহে— 'সে আবার কি!' বলিয়া কথাটা শুনিবার জন্য জিদ্ করিয়া বসিলেন।— হায়, একদিন যাহা শুনিবার জন্য সঙ্গীরা কত না আগ্রহ ও জিদ্ প্রকাশ করিয়াছিলেন— আজ তাহাই 'অবান্তর' বোধে

অনাদৃত হইতে পারে ভাবিয়া লিখিতে শঙ্কা বোধ করিতেছি!*

সঙ্গীদের বলিলাম ব্যাপরাটা এই— কোন এক পুত্র-পুত্রবধূ-পরিবৃত সব-জজ বাবুর ৫২ বৎসর বয়সে পত্নীবিয়োগ হয়। সেই দিন হ'তে তিনি বহির্বাটীতেই ভরন্তর করেন। তিনি সে কালের শিক্ষিত ও সৌখীন লোক ছিলেন। পিতার কষ্ট না হয় বা সেবার কোনরূপ অভাব না হয়— উপযুক্ত-পুত্রেরা সাধ্যমত তার ব্যবস্থায় মন দিলে, আর বাপের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে,— তিনজন চাকর ও একটি রাঁধুনী-বামন নিযুক্ত ক'রে নিশ্চিত হ'ল। কারণ— উপযুক্ত ছেলেরা থাকতে বাপের যে বিবাহের আর আবশ্যকই হ'তে পারে না, অযাচিত হ'লেও— সকলেই ইসারা-ইঙ্গিতে সব-জজ বাবুকে এই সব কথাটা জানিয়ে দিলে। তিনিও সকলের সকল কথায় ছোট একটি 'হু' ভিন্ন অন্য দ্বিরুক্তি করলেন না।

সমস্ত দিন পরে, সেই বিশেষ পরিচিত পশুটির খাটুনি খেটে সব-জজ বাবু যখন ব্রুহাম্ গাড়ী ক'রে বাড়ীর ফটকে ঢুকলেন,— তাঁর নজরে প'ড়ল— তিনটি অপরিচিত গুণ্ডাগোছের খোট্টা মূর্তি! দেখেই তাঁর মুখে বিরক্তি আর অস্বস্তি ফুটে উঠল।

তিনি মাটিতে পা দিতেই সেই তিন মূর্তি,— পিঠের শিরদাঁড়া দেখিয়ে সেলাম করলে। তিনি সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে দ্রুত গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। আরাম চৌকিখানায় ঘুরে বসতে গিয়ে দেখেন তিন মূর্তিই ঘরের মধ্যে হাজির! কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই একজন জুতো খুলতে বসে গেল,— একজন বাতাস আরম্ভ ক'রে দিলে; তৃতীয়টি তাওয়াদার সুগন্ধি তামাকের কলকেটি গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে ভাঙ্গাগলায় বল্লে— 'পিজিয়ে হুজুর!'

সহসা এই তিন মূর্তির আক্রমণে, তিনি যেন নিজের বাড়ীতেই অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলেন; রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠল। জিজ্ঞাসা

* 'চিনযাত্রী'— ভ্রমণ-কাহিনীর পর্যায়ে পড়িলেও, ইহাকে বৈঠকী ভ্রমণ বলাই সঙ্গত; কারণ, এ 'যাত্রায়' নিজের গতিশক্তির খরচ অল্পই— জাহাজের মোশনেই (motion) এই ভ্রমণ; অর্থাৎ কিভাবে ও কিরূপে যে আমাদের দীর্ঘ জাহাজী দিনগুলা কাটিয়াছিল,— ইহাতে সেই কথারই আধিক্য বেশী,— তাহাই ইহার প্রধান উপকরণ।

করলেন— 'তোমরা কে?'

যে বাতাস করছিল— সে প্রায় ছ'ফিট লম্বা, বাবরি চুল, গালপাট্টা দাড়ি— ইয়া মোচ্, বর্ণ ধূসর, হাতের গুলের উপর রূপার কবজ, কোমরে গোট, আঙ্গুলে আসমানি পাথর বসান রূপোর আংটি ; গলায় একছড়া প্রবালের মালা। সে বাজখাঁই আওয়াজে বললে— 'জজ বাহাদুর' হাম্‌রা নামটি আছে 'মুচ্‌কুন্দা', হাম সব কাম করিয়েছে— পাঁও দাবানা, তেল লাগানা, কাপ্‌ড়া কুচানা— '

সব-জজ বাবু,—আচ্ছা বাস্, (তামাকুদারের প্রতি)—তোমার কিছু শুনি।

সে ব্যক্তি বেঁটে জোয়ান, খাটো খোঁচা খোঁচা চুল, ছাঁটা গোঁফ, গোল চক্ষু, কিট্‌কিটে কালো, এক কানে মাকড়ি, পদাঙ্গুষ্ঠে তামার তার জড়ান, ঘুনশি সুতায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটি রৌপ্য-ফলক গলায় ঝুলচে। সে বল্লে— 'মহারাজ, হামি দুর্গাচরণ ডাঁকদারকে তাম্বাকু পিলিয়েছে, বিছোনা করিয়েছে, পান লাগিয়েছে হাড়-কাট্টাকে—'

সব-জজ বাবু— বাস্ করো। তোমার নাম? উত্তর,—হুজুর— 'কাট্টরিলাল' আছে।

সব-জজ— (তৃতীয়ের প্রতি) তুমিও কিছু শোনাও—

এটির ছুঁচলো ছাঁচের গড়ন ফর্সা রং, কটা চক্ষু, দাড়ি-গোঁফ বর্জিত, মুখে বসন্তের দাগ, পরিধানে হলুদে ছোবান কাপড়, একহাতে রূপোর বালা, অপর হাতে সারগাঁথা রূপোর মাদুলী। নখে মেঁদির রং।

ইনি হেসে বল্লেন— 'হামারা নামটি চমৌকীলাল আছে। হামি পারিয়া সাহেবের মৌসীকা—'

সব-জজ বাবু সত্বর বল্লেন— 'আচ্ছা বাস্ ; তোদের কে এখানে কাম করতে বলেছে?'

সকলেই বল্লে— 'বড় বাবু বাহাল করিয়েছে ;হুজুর কাম দেখ্‌কে খুসী হোবেন,— কুছ্‌ভী কোষ্টো থাকবে না।'

সব-জজ বাবু প্রথমে ভাল কথায়, পরে সরোষে তাদের বিদেয় হতে বল্লেন ; কিন্তু তারা বাড়ী ছাড়লে না ; বলে— 'খুসী না কর্‌কে যাবে না।'

কিছুক্ষণ পরে এক উড়ে বামন জলখাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল। সব-জজ বাবু এজলাসের ধড়া-চূড়া-বাঁধা intact অবস্থাতেই সেই আরাম-চৌকিতে অসাড় হয়ে পড়েছিলেন। ঘরে লোক ঢুকতেই তাঁর হুঁস হ'লে, বল্লেন— 'কে'?

বামন ঠাকুর— প্রভু মিষ্টান্ন লউচি,— অধিন পকাইছে।

সব-জজ বাবু— তোমার নাম কি?

বামন ঠাকুর— উডুম্বর।

সব-জজ বাবু— বেশ, নে'যাও, আজ আমি খাব না।

দুই ছেলেই ক্লাব্ থেকে এসে সব শুন্‌লে; ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে— চেয়ারের উপরই বাপের নাক ডাক্‌ছে। ছোট ছেলে তাঁর কপালে হাত দেওয়ায়, তিনি বল্লেন— 'কে ও'?

ছেলে বল্‌লে— 'আপনি এখনও কাপড় ছাড়েননি, হাত মুখ ধোন্‌নি, কিছু খাবেন না বলেছেন; কেন— শরীর কি ভাল নেই?

সব-জজ বাবু বল্লেন,— 'হাঁ, তোমরা খাওগে, আজ আর আমাকে বিরক্ত ক'র না।

ছেলেরা চিন্তিত মনে চলে গেল। বড় পুত্রবধূর হিস্টিরিয়া; ছোটটির সন্তান সম্ভাবনা। সব-জজের কন্যাসন্তান নাই।

প্রত্যূষে সকলের আগে উঠে, কাপড় ছেড়েই সব-জজ বাবু তাঁর প্রিয় বন্ধু উকীল নবগোপালবাবুর বাড়ী উপস্থিত হলেন। নবগোপালবাবু সেই মাত্র উঠে এসে বারাণ্ডায় বসেছেন। তিনি সব-জজ বাবুকে দেখে, হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে বসতে চেয়ার দিলেন। বল্লেন— 'আজ আমার কি সুপ্রভাত।' সব-জজ বাবু বল্লেন— 'আর অত সমাদরে কাজ নেই, ঘাটের ব্যবস্থা কর, দূত এসে গেছে।'

নবগোপাল— কি রকম?

সব-জজ বাবু— ছেলে দু'বেটায় পরামর্শ ক'রে, চারবেটা যমদূত হাজির করেছে— আমার 'পাট' ক'রবে বলে! কাছারী থেকে ফিরে দেখি তিন খুনে-মূর্তি আমার জন্যে অপেক্ষা করচে! পরে বুঝলুম— খুন করেনি, আমাকেই করতে বাহাল হয়েছে! বেটাদের আক্কেল্‌টা দেখ!—

তারা নাকি আমার 'কোষ্ঠ মোচন' করবে!

নবগোপাল— সেই উদ্দেশ্যেই বাহাল হয়ে থাকবে।

সব-জজ বাবু— ঐ সব মুরোদ? কেন,— আমায় তারা কুস্তি শেখাবে, না পাঞ্জা লড়াবে?

নবগোপাল— এখন করবে কি বলো,— উপায় কি?

সব-জজ বাবু— তা বলে, আমি সংসারে থাকব আর সকল রসে বঞ্চিত হয়ে ঐ বেটাদের হাতে submit ক'রে সুখ খুঁজবো এ-তো পারব না? এ কি লোহারামের না টটন্টারের ভিটে যে এক ফোঁটা রসের ঠাঁই থাকবে না। ছেলে বেটারা কি যত বেডউল পাথুরে মুরোদ দেখিয়ে, বাবাকে অজন্টা গুহায় গোর্ দেবে! যদি ভাই নামগুলো শোনো ত এই সরস বাংলা দেশ থেকে ছুটে পালাবে।

এক বেটা মুচ্‌কুন্দা, দ্বিতীয়— কাট্টুরী, তৃতীয়— চামৌকী, আবার সব্‌সে সেরা— to crown the lot, উড়ে বামুন ঠাকুর হচ্ছেন—উডুম্বর! এই ছুচুন্দর কাঠঠোকরা, চাম্‌চিকে, আর হুড়ুমভাজা নিয়ে আমাকে অবশিষ্ট দিন কাটাতে হবে? আমি 'মেঘদূতে' মেডেল পেয়েছিলুম কি পরিণামে এই যমদূতের হাতে পড়তে হবে বলে! (এই কথায়, তাঁর চক্ষে জল পড়তে লাগলো,—তিনি আবার বল্লেন) কোনখানে একটু পোইট্রি—অন্ততঃ একটু সুন্দর হাসি না পেলে, মানুষ বাঁচতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। মেয়েদের কাজ মরদ দিয়ে— শোভনও নয়— সম্ভব নয়। তা যদি হ'ত ত রেজিমেন্ট-গুলোও সংসার নামের দাবী করতে পারত।

স্ত্রীলোকদের কি কেউ তাল গাছে উঠে তাড়ি পাড়তে বলে? যার যা। আমায় পান দেখে চামৌকী, ব্যজন করবেন কাট্টোরী, আহার করাবেন— উডুম্বর! আরে ছ্যাঃ! ছেলেদের এম-এ পড়িয়েছিলুম কিনা, দু-বেটাই দেখ্‌চি Master of Arts দাঁড়িয়ে গেছে,— বেটাদের বাচায়ের্ তারিফ্ আছে! ইউনিভার্সিটিরও যেমন দৈন্যদশা— এক ফোঁটা ময়েন্ জোটেনি— একেবারে কাটখোলায় ভেজে ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে খুসী করবার জন্যে ঐ মালকোচা-মারা সালঙ্কারা মুরোদ ক'বেটাকে কোন দিন 'মা' বলে না ডাকে!'— হাসির একটা হারিকেন্ বহিতে লাগিল।

১৩

কি আশ্চর্য, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ আরম্ভ হইল, সকলে সভয়ে উঠিয়া পড়িলাম। সম্মুখে পাইয়া সারেংজিকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সারেংজি, ভয় নাই ত?' তিনি মনোমত সেলাম ও সম্ভাষণ পাইয়া, নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ গম্ভীরভাবে বলিলেন— 'টাইফুন অতি ভয়ঙ্কর জিনিস, সমুদ্রের মাঝে থাকলে কোন ভয় ছিল না,— বন্দরে বড়ই বিপদের কথা! এই লহমায় চেন্ ছিঁড়ে, জাহাজে জাহাজে, কি পাহাড়ে লেগে গুঁড়ো হয়ে ডুবে যাওয়াই সম্ভব,— কিম্বা বন্দর থেকে বেরিয়ে অজানা দরিয়ায় গিয়ে খতম্ হতে পারে,— এ সময় খোদাই মালিক।' পরে একটু উদাসভাবে— 'আল্লা তুঁহি সব্‌কুছ্' বলিয়া সরিয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ আমরা যে অংশটুকু উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম,— সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সারেংজি তাহাতে সজোরে কোপ্ মারিয়া সেটুকু সাফ্— নির্মূল করিয়া দিলেন,— তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা একদম্ বসিয়া পড়িলাম। আমার টাইফুন্ দেখিবার সাধ ও আমার সঙ্গীদের সাহস,— সমূলে শুকাইয়া গেল।

সারেংজির কথা শুনিয়া পঞ্চানন কিন্তু চটিয়া বলিল— 'মশাই, লোকটা কি বেয়াড়া খোদার গড়ন্! আপনিও যেমন— ওকে মুরুব্বি ধরতে গেছেন,— যেটা ড্রেক্ না নেল্‌সন্?' যাহা হউক,— পঞ্চাননের এই সময়োচিত রিমার্কটা খুব কাজ করিল। আমাদের 'পারা' normal point-এর নীচে যে-রকম নামিয়া পড়িয়াছিল, তাহার এই কথায় সেটা চন্‌চন্ করিয়া উর্ধ্বমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল,— সত্যই তাহা সকলকে একটু চাঙ্গা করিয়া দিল। চাটুয্যে কিন্তু ভীতকণ্ঠে বলিল— 'হ্যাঁ বাঁড়ুয্যে মশাই, বুড়ো লোকটা তবে অমন কথা বল্লে কেন?' আমাকে তাহার উত্তর দিতে হইল না, পঞ্চাননই বলিয়া উঠিল,— 'অমন ঢের বেওকুব্

বুড়ো আমি দেখেছি,— বুড়ো হলেই বুঝি তাঁকে 'বিক্রমাদিত্যের বরাহ' ঠাওরাতে হবে?'

ঝড় উত্তরোত্তর ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তাহাতে আবার রাত্রিকালে বিপদগুলোর বহর বাস্তব অপেক্ষা বহুগুণ বেশী বলিয়াই বোধ হয়,— সহায় সম্পত্তি সত্ত্বেও লোকে আপনাকে অসহায় বোধ করে। বন্দরে বদ্ধ থাকিলেও আমাদের সেদিনকার রাতটি যেন জীবনব্যাপী পাট্টা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল। সে রাত্রে ঘড়ির কাঁটা যেন এক ঘণ্টায় পাঁচ মিনিটের ঘরটি পার হইতেছিল। রজনীর নিস্তব্ধতায় ঝড়ের সোঁ-সোঁ, গোঁ-গোঁ শব্দ বিকটতর হইয়া সারেংজির কথা স্মরণ করাইয়া মুহুর্মুহু ভয়ের সৃষ্টি করিতেছিল!

সেই ঝড়ে আমরা জড়ের মত একস্থানে জড়-সড় হইয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে লাগিলাম। চাটুয্যে আমাকে ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল। এক একটা দুর্জয় দমকায় কাহারো মুখে দুর্গা নাম, কাহরো মুখে 'নারায়ণ', কাহারো মুখে 'মধুসূদন'— ঠেলিয়া বাহির করিতেছিল, কেবল চাটুয্যে তাহার পূর্বসংস্কার মত— জয় হনুমান, জয় হনুমান— করিয়া উঠিতেছিল।

প্রত্যেক দমকায়, বোধ হয় সে আমাকে আসন্ন বিপদটা স্মরণ করাইয়া দিবার বা আমাকে সজাগ রাখিবার এমন এক মারাত্মক উদ্ভট উপায় অবলম্বন করিয়াছিল যে, ক্রমে তাহা আমার পক্ষে উপস্থিত বিপদ অপেক্ষা বিকট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার উরুদেশ এমন সজোরে টিপ দিয়া ধরিতেছিল যে, তার সাংঘাতিক সাড়া আমার আত্মা পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল। আমি তাহার তাড়নে প্রত্যেক বারই একটু করিয়া সরিয়া বসিতে ছিলাম,— কিন্তু সে-ফাঁকটুকু ফি-বারেই পানাপুকুরের পানা সরার মতই তখনি অলক্ষ্যে পুরিয়া যাইতেছিল ;— আবার সেই বিদকুটে টিপুনি। উরুতে আউরে উঠলো। একবার চকিতে মনে হইল— যদি বা ঝড়ে রক্ষা পাই, কিন্তু বিদেশে উরুস্তম্ভ হইলে আর বাঁচোয়া নাই। উঠিয়া পড়িলাম। চাটুয্যে অমনি তাড়াতাড়ি আমার কাপড় ধরিয়া কাতর দৃষ্টিতে বলিল— 'কোথা যান

বাঁড়ুয্যে মশাই!' আমি বলিলাম— 'একটু দাঁড়াই, পা ধরে গেছে।' মজুমদার ভায়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল— 'তবে আমি একটু বসি।' আমি তাহাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম।

মিনিট্ তিনেকের মধ্যেই, একটা দমকার সঙ্গে সঙ্গে, আচমকা— 'ওরে বাবারে— উহুহু' করিয়া মজুমদার ভায়া লাফাইয়া ওঠায়, বিপদ বুঝি আসন্ন ভাবিয়া, চাটুয্যেও সচীৎকারে 'হনুমান রক্ষা কর' বলিয়া শশব্যস্তে, আলুথালু উঠিয়া পড়িল। ভায়া ভয়ানক চটিয়াছিল, সে এক অপূর্ব মুখভঙ্গী করিয়া বলিল— 'কচুপোড়া খাও, তুমি কোথাকার লোক হ্যা!' সকলে অবাক, বোস্‌জা জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কি হে, ব্যাপারটা কি!' মজুমদার— 'ব্যাপার এই দেখুন না,— একেবারে হাফ-খুন্' বলিয়া কটি পর্যন্ত কাপড় তুলিয়া উরুত দেখাইল। ভায়ার বর্ণটা কাল নয়, বাস্তবিকই তাহার উপর চাটুয্যের বক্র তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সুস্পষ্ট হইয়া রক্তাভায় দেখা দিয়াছে।

আজিকার দুর্যোগে আমাদের পঞ্চাননের মুখও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; সে এতক্ষণ বড়ই বিমর্ষভাবে অস্বস্তিতে কাটাইতেছিল। এই আকস্মিক ঘটনাটা বামালশুদ্ধ পাওয়ায়, উৎসাহে তাহার দীর্ঘদন্তগুলি ঘরবার করিতে লাগিল। মজুমদার ভায়ার উরুতটায় উঁকি মারিয়াই বলিয়া উঠিল— 'উঃ— কি ভীষণ। দয়াময় দ্বাপরে উপস্থিত থাকলে ভীমকে আর হিমসিম খেতে হ'ত না, দুর্যোধনের উরুতটা উনিই মড়াৎ করে ভেঙ্গে দিতে পারতেন!'

মজুমদার বলিল— 'তাই বটে, রত্নাকরের improved edition— বড়িয়া সংস্করণ, লাঠি ছুঁতে হয় না!'

আমি আর হাসি চাপিতে পারিতেছিলাম না। দু'পা অন্তরালে গেলাম। বোসজা বলিলেন— 'একটু দাঁড়ান বাঁড়ুয্যে মশাই— একসঙ্গে যাই, আমারও বড় পীড়া উপস্থিত।' একটু সামলাইয়া আসিয়া— তখনো চাটুয্যেকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিলাম— 'কি এতবড় ব্যাপারটা ঘটেছে যে, তোমরা এখনো সেই নিয়ে রয়েছ?'

শুনিয়া মজুমদার বলিল,— 'ভায়া ত এর স্বাদ পাওনি, একেবারে

কচ্ছপের কামড়— মাথা পর্যন্ত ঝনঝনিয়ে গেছে।' পঞ্চানন অমনি পোঁ ধরিল— 'ভগবানের কৃপায় আজ ঘন ঘন মেঘ ডাকছে তাই, তা না হলে জ্যান্তো শাঁড়াসীর চাপ সেঁটে ধোরতো!' চাটুয্যে মজুমদারের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল— 'আমি বুঝতে পারিনি, আমি ভেবেছিলুম— বাঁড়ুয্যে মশাই— ।'

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল ; মজুমদার কিন্তু আমার দিকে ফিরিয়া বসিল— 'তোমরা দেখচি তিলকে তাল করতে ভালবাস, আমিও ত ওখানে বসেছিলুম, বোধ হয় ছাপ্পান্নবার ওরকম হয়ে গিয়ে থাকবে, কি এমন মারাত্মক তা ত বুঝতে পারিনি। বিপদের সময় ভীরুলোক মাত্রই সামনে একটা অবলম্বন পেলে সেটা জোরেই ধরে থাকে!' মজুমদার— 'তুমি বল কি বাঁড়ুয্যে! তুমি যদি এ যুগের জরাসন্ধ না হও, আর সত্যি যদি তোমার উরুতের ওপর ঐ অন্তর্টিপুনির এন্‌কোর চ'লে থাকে, ত' পা খানি amp utate করতে (বাদ দিতে) হবে জেনো।'

এমন সময় পঞ্চানন Eureka (পেয়েছি) বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। বোসজা বলিলেন— 'কিহে— তুমি আবার কি পেলে? তোমরা যে দেখচি আবার একখানা 'পঞ্চাঙ্ক' ফাঁদলে!'

পঞ্চানন বিকশিত দন্তে আরম্ভ করিল— 'ঠাকুরদের নাম কিনা, তাই বিপদকালে মনে আসছিল না মশাই। গাঙ্গুলী মশাই তাঁর Blue-lotusটি (নীল-পদ্মটি) মর্ত্যে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে সরে গেছেন। তা তাঁকে দোষ দেওয়াও যায় না,— বিধুভূষণকে দিয়ে খোঁজ করাতে কসুর করেননি ;— সে দুর্লভ শর্মাটি যে বেয়লা ফেলে সাগর লঙেঘ একদম বর্মায় গা-ঢাকা হয়েছে, এ কারুর আক্কেলে আসতে পারে না।'

বোসজা— কি মাথামুণ্ডু বোকচ পঞ্চানন, তোমার গাঙ্গুলী মশাইটি কে?

পঞ্চানন— ঐ দেখুন, আবার ভুল করেছি ; আমার আর গতি হবে না, ভূতই হতে হবে দেখচি।

আমি বলিলাম— 'হতে হবে কিহে?' পঞ্চানন একগাল হাসিয়া বলিল— 'একটু আস্তে বলুন, সবাই আজও সেটা ধরতে পারেননি!

দেখুননা ফের ঠাকুরদের নামটা ভুলেছি,— তারকনাথ গাঙ্গুলী, যিনি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানির রচয়িতা।'

বোসজা হো হো করিয়া হসিয়া বলিলেন— 'সেই পদ্ম-আঁখি! ওরে বা-বা, তোমার imagination-এর (কল্পনার দৌড়ের) তারিফ আছে! মজুমদার— 'টিপুনিটিরও মিল আছে! তার টিপুনিও মোক্ষম্ ছিল।'

এই কথায়, কালীঘাটের সেই গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার আসরটা যুগপৎ সকলের মনে হওয়া, হাসির একটা হল্লা পড়িয়া গেল!— হাসিল না কেবল চাটুয্যে, আর আমাদের সুপরিচিত ও সুশিক্ষিত স্কলার-দত্তজা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন, বিপদের সময় প্রাণিমাত্রেই বিরুদ্ধভাব ভুলিয়া যায়, বাঘে ঘোগে এক স্থানেই আশ্রয় লয়। তাঁহার না হাসিবার অনেকগুলি কারণের মধ্যে— বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকের সহিত অপরিচয় প্রকাশের গৌরবটাও অন্যতম। আর চাটুয্যের অবস্থাও ক্রমশ pitiable (কৃপার যোগ্য) হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল।

তত্রাপি রেহাই নাই; বোসজা বলিলেন— 'ও বড় বড় লেখকদের ধারাই ঐ, তাঁরা লেলিয়ে দিয়ে সরে পড়েন। দেখ না,—বঙ্কিমবাবুই কি তাঁর বিদ্যাদিগ্‌জকে সঙ্গে নে'গেছেন, না, তোমার ঐ গাঙ্গুলী মশায়ই তাঁর গদাধরচন্দ্রকে সাথী করেছেন, আর রায় মশাই তাঁর নন্দলালকে নড়িয়েছেন কি? ঐ ক'রেই ত দুনিয়াটা দ' পড়ে যাচ্ছে—।' হায়— বেচারা চাটুয্যের হইয়া বড়বাবুকে কেহই বলিল না— You too Brutus (আপনিও লাগলেন)। মানুষের মজা দেখা স্বভাব।

পঞ্চানন উন্মুখ হইয়াছিল, সে বোসজাকে সমাপ্ত করিতে না দিয়াই বলিল— 'দ' প'ড়ে কি মশাই! ভরাট হয়ে গেল— তারা এন্ডাবাচ্ছা ছাড়ছে না?'

এই সময় হরিপদ বলিয়া উঠিল— 'সকাল হ'ল যে মশাই।' চাহিয়া দেখি— তাই বটে।

আমি চাটুয্যেকে একটু চাঙ্গা করিবার পথ খুঁজিতেছিলাম, ফাঁক পাইয়া বলিলাম— 'তোমাদের মতলব হাসিল হয়েছে ত'; ফর্সা হ'লে ফার্স ফিকে মেরে যায়, আর নয়, এখন দুর্গা দুর্গা বল।' চাটুয্যেকে বলিলাম—

'চ্যাটুয্যে, এঁদের মতলবটা এখন বুঝতে পেরেছ ত? ঝড়ের আতঙ্কটা ভুলে থাকবার জন্যে আর তোমাকেও ভুলিয়ে রাখবার তরে একটা উপলক্ষ্য করে এই অভিনয় চলছিল। ছেলেপুলেদের হেঁচকি ওঠা থামাতে হলে তাদের মিথ্যে একটা দোষ কি অপবাদ দিয়ে চটিয়ে অন্যমনস্ক বা আশ্চর্য করে দিতে হয়, তা হলেই তাদের মন হেঁচকির দিকে না থেকে রাগের দিকে পড়ে, অমনি হেঁচকিও বন্ধ হয়ে যায়,— এটা জান ত? আজকের এ ব্যাপারটাও তাই,— তোমাকে হতভম্ভ বানিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক ক'রে রাখা।' শুনিয়া চাটুয্যে আর সে চাটুয্যে রহিল না, মুহূর্তেই প্রকৃতিস্থ হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— 'তাই বলুন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারিনি ; আপনারা সব করতে পারেন! এখন বুঝেছি— তানা ত' বড়বাবু পর্যন্ত যোগ দেন!'

বাস্তবিক সেই ভৈরব টিপুনির পাল্লায় পড়িয়া ঘণ্টা দেড়েক অতবড় টাইফুন ঝড় যে কোথায় রড় দিয়া একদম গা ঢাকা হইয়াছিল, সে সংবাদ আমাদের কেহই রাখে নাই। মনই সুখ-দুঃখের সৃষ্টি করে, তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই ফাঁকি দেওয়া যায়,— এই কথাটা পুঁথিতেই পড়া ছিল, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ আজ পাওয়া গেল।

চট্‌কা ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের হুঙ্কার, জাহাজের ঝাঁকুনি, মুহূর্তেই আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আবার ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল ; আবার সেই দুর্গা দুর্গা। ঝড় বৃষ্টি তখনও পূর্ববৎই চলিতেছে। বিপদের দিনে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহায় ভাব আসিয়া মনটাকে যেমন ভীত ও অবসন্ন করে, আবার অরুণোদয়ে তেমনি তাহাকে একটা নূতন আশা, নব বল দিয়া থাকে। আমরাও সেটা পাইলাম।

সারেংজির গত রাত্রের সুতীক্ষ্ণ বাণীটা সকলের স্মরণ থাকিলেও প্রাতের আলোকে তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিল। লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে 'কুল' পেলে বাঁচি।'— আমরা সেই বহুবাঞ্ছিত 'কূল' তখন বুকে পিঠে দেখিতে পাইলাম।

ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ডভাব সামনেই চলিতে লাগিল ; বন্দরে থাকায় কেবল জাহাজের রোলিংটা তেমন মনের মত হিন্দোলরাগ আলাপ করিবার

অবকাশ পায় নাই। তাই আমাদের কাজ-কর্মে,— কি না— স্নানাহার ও গল্প গুজবে বিশেষ ব্যাঘাত হইল না। ইতিমধ্যে একবার আমার পরিচিত ইউরেসিয়ান মিস্টারটি আসিয়া হাসিতে হাসিতে গ্রীবাটা ফণা-ধরার ফ্যাশনে আন্দোলিত করিয়া বলিলেন— 'হ্যালো— আমি ভেবেছিলাম দেখব— তোমরা কাঁদচো!'

বলিলাম— 'সে কি কথা,— তোমাদের মত সহৃদয় সহযাত্রী বেঁচে থাকতে আমাদের কান্নার কোন কারণই ত আমি ভেবে পাই না ; তোমার এরূপ আশা করাই ভুল হয়েছে।' শুনিয়া তিনি হাসির সাহায্যে ও-পথটা ছাড়িয়া, গত বিভীষিকাময়ী রজনীর ঘাড়ে horrible, terrible, awful প্রভৃতি বিশেষণ চাপাইয়া চলিয়া গেলেন।

১৪

আমাদের আড্ডাটা অধিকাংশ সময়েই উপরে ডেকে জমিত। সারারাত্রি জাগরণের পর, আহারান্তে সকলেরই ঢুলুনি দেখা দিল। পঞ্চানন বেঞ্চে ঠেস দিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বদ্ধ থাকিতে কেহই চায় না, স্বাধীনভাবে থাকিবার ইচ্ছা সকলেরই স্বাভাবিক। জাগ্রতাবস্থায় যে-দাঁতকে অনেক কষ্টে ও অনেক কস্তে বদনমধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে হইত,— বেহুঁস অবস্থায় তাহারা প্রস্ফুটিত কুমুদের (হেলা ফুলের) মত বাহিরে আসিয়া তখন সহাস্যে দেখা দিয়াছে। পাছে তাহা পদচারণা-প্রিয় ইউরোপীয়ান ও ইউরেসিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও হাস্য পরিহাসের কারণ হয়, তাই পঞ্চাননকে শয্যায় পাঠাইয়া দিলাম। এইবার একটু ফাঁক পাইয়া জাহাজের ডাক্তারকে ধরিয়া উরুতটার উপায় করিয়া লইলাম ; তিনি টিংচার-আয়োডিন লাগাইয়া দিলেন।

একটু পরেই খাঁ-সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশেষ করিয়া বড়বাবুকে (বোসজাকে) একটি প্রমাণ সেলাম ঠুকিলেন ও আমাদের উপর সেটা সাপটাভাব এক-ঝোঁকেই বুলাইয়া শেষ করিয়া দিলেন এবং ঐ সঙ্গে মেজাজ ও তবিয়ৎ সম্বন্ধেও তত্ত্বটা লইলেন। এটি তাঁহার নিত্য কর্ম ছিল,— কারণ তিনি পলটনে রসদ (ration) প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয়ের Purchasing Agent (খরিদ-কর্তা) হইয়া চলিয়াছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে বড়বাবুরাই যে বঙ্গ-বিজয়ের বখতিয়ারের মত চিন-বিজয়ের চেঙ্গিজ খাঁ, সেটা তাঁহার সাতাশ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বিশেষ করিয়াই শিখাইয়া রাখিয়াছিল।

লোকটি বয়সেও বড়, বিজ্ঞতাতেও বিশিষ্ট,—পঞ্চাশের উপর বোধহয় পাঁচ কদম ফেলিয়াছিলেন। স্বধর্মানুরাগী ও নেমাজী। তাঁহার হাতে পড়িয়া চাল বা চলম, কোনটিই বেগড়াইবার বাগ পায় নাই। ফল কথা, তাঁহাতে বাহুল্যদোষ মাত্র ছিল না। সেটা নাকি পারচেজিং এজেন্টের পক্ষে, অর্থাৎ

তাঁহার পদাভিষিক্তের পক্ষে শোভন নয়, বা গুণবাচক নয়। কারণ একটা বড় রকম অভিযানের (যাহার খরচের খাতাটা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের হিসাবের সামিল বলিয়াই অনেকের ধারণা) ক্রয়-কর্তা হইয়া যাওয়া মানে— নাকি লক্ষপতি হইয়া ফেরা, আর সেই সঙ্গে মিষ্টান্নম্ ইতরেজনাদের বিতরণ করা।

তবে বড়লোক হবার যেটা রাজপথ, সে পথে চলিবার সাহস সকলের থাকে না, এবং তাহারাই নাকি নির্বোধ ও লক্ষ্মীছাড়া। আমাদের খাঁ-সাহেবের সেটা না থাকাই সম্ভব ;— এই কথা লইয়া ইতিমধ্যেই আলোচনা চলিয়াছে। তাঁহার বয়স ও তাঁহার কপালে নেমাজের কালশিরাই কালস্বরূপ হইয়া এই সন্দেহটা তুলিয়াছে, এবং 'খোরাকিদের' একটু নিরুৎসাহও করিয়াছে।

কিন্তু প্রত্যহ আহারের সময় যখন ডেকের উপর জাজিম পাতা হইত ও তাহার উপর বড় বড় পরাতে মোটারুটীর মহানৈবেদ্য ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাণ্ডায় দাল ও সুরুয়া আসিয়া পড়িত, এবং খাঁ-সাহেব, গুণ অবস্থা ও পদনির্বিশেষে তাঁহার সহচর ও সহধর্মীদের লইয়া একত্রে আহারে বসিতেন, তাহা অপর সকল যাত্রী ও জাতিরই দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় ছিল।

সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে অধিকাংশই Menials and Followers (ছোটলোক মজুর) ; কেহ ভিস্তি, কেহ সইস, কেহ কসাই, কেহ বাহক, কেহ baker (রুটিকর), কেহ খচ্চর চালক, কেহ বয়েল চালক ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহারা ৯ টাকা বেতনে চীনে চলিয়াছে। সকলেই বিভিন্ন প্রদেশাগত। সে শ্রীক্ষেত্রে পরিচিত-অপরিচিতের বাধা ছিল না— মুসলমান মাত্রেই welcome (স্বাগত) সকলকেই ডাক দেওয়া হইত। রোগী, বিকলাঙ্গ, নোংরা— সকলেই একাসনে বসিয়া একই পাত্র হইতে স্বহস্তে ভোজ্য বস্তু লইয়া বেশ সহজে ও সানন্দে গল্পাদির মধ্যে সকলের একত্রাহার সমাধা হইত। পরে একই বদনা সকলেরই বদনে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পিপাসা মিটাইত ; পরিশেষে একই গড়গড়ার নল, পর্যায়ক্রমে সকলকে এক এক টানের আরাম দিয়া, অর্ধঘণ্টাকাল ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া, এই নিত্য উৎসবের উপসংহার করিত। মহাপুরুষ মহম্মদোক্ত

এই যে ধর্ম্মমূলক mandate (আদেশ), ইহাই আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোককে এক মহাজাতিতে, এক মহাপ্রাণে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। এই একাসনে একই পাত্র হইতে— আহুত অনাহুত রবাহুত, ধনী দরিদ্র রোগী ভোগী, মলিন ও সৌখীনের একত্র ভোজন,— অপর কোন সুসভ্য শক্তিশালী জাতির মধ্যে আছে কি না জানি না।

অনেকে জাতিভেদকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অবস্থাভেদ ও ঐশ্বর্যভেদকে বিলক্ষণ আঁকুড়িয়া থাকেন। আমাদের খাঁ-সাহেবের মজলিসে তাহা পাইলাম না ; এই ভীষণ টাইফুনের দিনেও সেই নিত্য-নিয়মিত প্রথা অক্ষুণ্ণই রহিল। তথাকথিত হিন্দুরা কে কাহার খোঁজ রাখে! কেহ জাহাজের খানা, কেহ কাঁচা চানা খাইয়া এই দুর্যোগের দিনে জাতি রক্ষা করিল। সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভিসম্পাত করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

'মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে'— ইত্যাদি।

আর আজ মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন ঃ—

'The existence of untouchability must remain an impassable barrier in the path of our progress, which we must break down with supreme effort.'

উভয়েই মহাপুরুষ,— বিপ্র সাবধান!

১৫

ঝড়ের বেগটা পূর্ব্ববৎ থাকিলেও আমাদের ভয়ের বেগটা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গল্পাদির মধ্যে এক একবার সেদিকে নজর পড়িতেছিল মাত্র। কিন্তু অকালে সন্ধ্যার আয়োজন দেখিয়া প্রাণটা কিছু দমিয়া গেল। ঠিক এই সময় মজুমদার ভায়ার ভৃত্য 'মহাদেব' একখানি গামলি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল,— 'বাবু খাচ্চি, গরম গরম বি আছে, কুড়্কুড়া বি আছে।' আমি বলিলাম— 'কি খাচ্চিস্‌রে মহাদেব?' সে উত্তর করিল— 'আপনি খাচ্চে,'— এই বলিয়া পাত্রটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিল।

এই মহাদেবটিকে দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইত। বেচারা মজুমদার-সংসারে একাদশ বর্ষ চাকুরী করিয়া, দু'কূল খোয়াইয়া বসিয়াছিল। তাহার বাড়ী গয়া জেলায়, কিন্তু দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর বাড়ী থাকিয়া বাংলা বুলির প্রতি বিশেষ প্রীতি পরায়ণ হইয়া পড়ে। তাহাতে গয়ার বুলিও কতকটা বেহাত হইয়া গিয়াছে, এবং বাংলাটাও বাগে আসে নাই; কাজেই সে গয়ার ভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যাহা হউক, গামলিতে হাত দিয়া দেখি,— বেসমের গরম গরম বড়া বা পশ্চিমাঞ্চলের পকুড়ি। সকলকে বণ্টন করিয়া দিলাম, দত্তকেও কতকগুলি দিয়া আসিলাম; কারণ আহার সম্বন্ধে কস্মিন্‌কালে তাঁহার আপত্তি বা অরুচি দেখি নাই। লঙ্কা জিরে পলাণ্ডু প্রভৃতি সহযোগে বস্তুটা এমন প্রস্তুত হইয়াছিল ও এমন সময়মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে সকলেই তাহা ইমন-কল্যাণের মত উপভোগ করিতে আরম্ভ করিল, পঞ্চানন পঞ্চমুখে তাহা পাচার করিতে লাগিল— তাহার অস্ত্রও সর্বাংশে ও সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষিপ্রকারিতার পুরস্কার দিতে সকলকেই কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হইল। কেবল চাটুয্যে এই শেষ ফলটা অনুমান করিয়া লইয়া নীচে সরিয়া গিয়াছিল। পকুড়ির মহিমাও মন্দ নয়, দেখিলাম। কিছুক্ষণ বেশ নিরুদ্বেগে কাটাইয়া

দিল, টাইফুনের টুঁ শব্দটি পর্যন্ত কেহ কানে করিবার অবসর পান নাই।

সকলেই নিদ্রাতুর ছিলেন, রাত্রি আটটার পর চা খাইয়া শয্যা লইলেন— আহারের দিকে ঘেঁসিলেন না ; কেবল দত্তজা ও চাটুয্যে নিয়ম ভঙ্গ করিলেন না। মজুমদার ভায়া বলিল— 'বাঁড়ুয্যে তুমি ত ঘুমুচ্চনা, তেমন তেমন দেখ ত সময় থাকতে ডেকে দিও।' ঘণ্টা দেড়েক পরে চাটুয্যে আসিয়া বলিল, 'ভয় নেই ত বাঁড়ুয্যে মশাই, শুতে পারি?— ঘুমুচ্চিনা।' আমি বলিলাম— 'তবে আর কি, জগদম্বা মালিক, শুয়ে পড়!' দেখিতে দেখিতে টাইফুনের তর্জন ভেদ করিয়া, বোসজা, দত্তজা ও চাটুয্যের নাসিকা গর্জন শ্রুত হইতে লাগিল।

রাত্রি একটার পর ঝড় প্রবলতর মূর্তিতে দেখা দিল, এক একবার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ; কিন্তু যাঁহারা নিদ্রিত, তাঁহারা এই দ্বারস্থ মৃত্যুদূতের কোন সংবাদই রাখেন নাই। দুর্গা দুর্গা করিয়া তিনটা বাজিল ; কাপ্তেন সাহেব ও মাল্লারা সবাই সজাগ, সকলেই ব্যস্ত। রাত্রি সাড়ে তিনটা আন্দাজ,— সে ভাবটা যেন সহসা সরিয়া গেল, তাহার পর ঝড় ক্রমশই দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। নিদ্রায় সর্বশরীর কাতর ও অভিভূত ত' ছিলই একটু উদ্বেগমুক্ত হইতেই, সে যে কখন আমাকে আপন অধিকারের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই।

নিদ্রাভঙ্গে দেখি সূর্যদেব প্রতিরন্ধ্রে উঁকি মারিতেছেন,— উপরে মহা কোলাহল অপার-ডেকে গিয়া দেখি, সব মূর্তিই সেখানে উপস্থিত ; আকাশ মেঘমুক্ত, সেই প্রবল বাত্যা সমীরণে দাঁড়াইয়াছে। জলের সে উন্মত্ত মাতুনি নাই,— অল্প আপ্‌সানি আছে মাত্র।

ঝড়ের ভৈরব মূর্তি দেখিয়া জাহাজের যে-সব যন্ত্র, আসবাব ও তোড়জোড় খুলিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন তাহাদের যথাস্থানে ফিট (সংযুক্ত) করা হইতেছে ; পালগুলি শুকাইয়া লইবার জন্য তাহাদের স্ব স্ব স্থানেই প্রলম্বভাবে মেলিয়া দেওয়া হইতেছে। কলকব্জায় চর্‌বি লাগান চলিয়াছে ; হড়্ হড়্ ঝন্ ঝন্ শব্দের নঙ্গর উঠিতেছে ;— হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কাপ্তেন, চিফ্ ও সহকারীরা খুবই ব্যস্ত ;— আটটা বাজিলেই

জাহাজ ছাড়িবে।

জাহাজের বাহিরে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেই দুর্যোগে কখন যে কয়েকখানি ঝড়-নড়া জাহাজ, আমাদের আশে-পাশে গা ঘেঁসিয়া আশ্রয় লইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। একই অবস্থাপীড়িত Strange bed companions দেখিয়া ভয় বিস্ময় ও দুঃখ হইল। কি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে তাহারা যে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তাহা তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

কাহারো উপরে ছাদ উড়িয়া গিয়াছে ; কাহারো মাস্তুল,— কে যেন মাঝখানে মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ; কাহারো চিম্‌নি সটান শুইয়া পড়িয়াছে। কাহারো পার্শ্বসংলগ্ন জলিবোট কক্ষচ্যুত হইয়া গিয়াছে। একখানি ফরাসী জাহাজের হালের দিকটা—হাল ও পতাকা সমেত নিশানদণ্ড, এবং মূল জাহাজের খানিকটা,— উপযুক্ত পুত্রের গন্ধমাদন উৎপাটনের পাল্‌টা জবাব হিসাবে স্বয়ং প্রভঞ্জন টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছেন। এত বড় প্রলয় শক্তি যে প্রকৃতির কোন্ প্রকোষ্ঠে প্রচ্ছন্নাবস্থায় থাকে, তাহা মানুষের ধারণার অতীত। সকল জাহাজেরই যেন ঝোড়োকাকের চেহারা,— সব সরঞ্জামই ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। এই দেখিয়া— দূর মহাসাগরস্থিত জাহাজগুলির পরিণাম ভাবিয়া সকলেই ভীত হইলাম। সকলেরি মনে হইল— 'ভাগ্যে জাহাজ বন্দরে ছিল।' এবং সেই সঙ্গে সারেংজির পাণ্ডিত্যের প্রশংসাটা শত মুখেই চলিল! পঞ্চানন বলিল— 'আমি তখুনি বলেছিলুম— বেটা বকেয়া বয়ার।'

জাহাজগুলির ত' এই দশা ; নাবিক ও আরোহীদের হৃৎপিণ্ডের উপর দিয়া যে ধাক্কাগুলো গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের হাত-পা ছড়াইয়া সপ্তাহখানেক শয্যায় শুইয়া সমালান ও বিশ্রাম লওয়াই উচিত ছিল। আশ্চর্য এই যে আমাদের শয্যাত্যাগের পূর্বেই, নিকষানন্দনেরা দড়ির ভারা ঝুলাইয়া, কেহ জাহাজে রং লাগাইতে, কেহ চর্‌বি ঘষিতে, কেহ করাত হাতুড়ি লইয়া মেরামতের কাজে লাগিয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই,

আমাদেরও একদিন ছিল, আমরাও ঐরূপ ছিলাম ;— বহুত আচ্ছা। কবি বলিতেছেন . . .

'আসিবে সেদিন আসিবে,'...

বোধহয়...রক্তভেদান্তে। অধুনা কিন্তু শুনিতে পাই,— শিক্ষানবিসীরও স্থানাভাব,— বর্ণে বাধে!

১৬

বেলা সাতটা হইতেই চেষ্টা চলিতেছিল, পরে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানা প্রকার সুর ভাঁজিয়া বেলা আটটার সময় জাহাজ ছাড়িল। আমরা দুর্গা দুর্গা বলিলাম ;আমার ইউরেসিয়ান বন্ধুটির সদলে ও সবলে তিনবার হিপ হিপ হুররে হাঁকিলেন। জাহাজ মন্থর গতিতে পূর্বমুখে চলিল। পনের মিনিটের মধ্যেই হংকং সহর পশ্চাতে পড়িয়া গেল ; কেবল তৎ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি-বিরল পর্বতমালা. দুই দিনের অতিথিদের সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর পথ দেখাইয়া চলিল।

বন্দরে অপর পারটা ইংরাজ-সেনা-নিবাস, সে দিকটায় মাঝে মাঝে ও দূরে দূরে ইতর সাধারণের বসতি দেখিলাম। এই পারটাই চীনের দক্ষিণ সীমা, এখান হইতে সোজা উত্তরেই চীনের ক্যান্টন্‌সহর। পঞ্চানন বলিল— 'মশাই, এখানে একটা 'ভায়া ব্রিন্ডিসি' থাকলে কি মজাই হ'ত,— চায়না সি'তে (চিন সমুদ্র) প্রাণ হাতে ক'রে পাড়ি মারতে হ'ত না।' মজুমদার বলিল,— 'এখানে 'ভায়া'-টায়ার সম্পর্ক নেই পঞ্চানন, এই খুড়ো 'ক্লাইভ' (জাহাজই) যা করেন।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মহাসমুদ্রের সম্মুখীন হওয়া গেল। তাহাতে সোজাসুজি ঝাঁপ দিবার উপায় কাহারও নাই। মোহনার মুখেই একটি ছোটখাটো পাষাণ-স্তূপ বা পাহাড়, মাথা তুলিয়া পথটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। দেখিলেই বোধহয় যেন— কোন এক অজ্ঞাত যুগে, মহাদেশ হইতে মহাদেশান্তরে শত্রু প্রবেশে এই পথে, কোন এক দৈত্যকে প্রহরায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পরে কোন এক অপরাধে অভিশপ্ত দৈত্য পাষাণে পরিণত হইয়া মুক্তির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। অহোরাত্র অনবরত তরঙ্গাঘাতে সেই পাষাণ-পঞ্জরে কয়েকটি রন্ধ্রপথ ও একটি গহ্বর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উত্তাল তরঙ্গের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। তাহারা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া গহ্বর-মুখ দিয়া খলখল মুখর

হাস্যে মহাসাগরেই অনন্তকাল—

'তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত'

বলিতে বলিতে মহোল্লাসে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! আনন্দময়ের এই আনন্দ-খেলার স্রষ্টাও যিনি, দ্রষ্টাও তিনি!

খানিক অগ্রসর হইয়াই মাটির জগৎ হারাইয়া ফেলিলাম! আবার সেই তরল বিশ্ব, সীমাহীন বিপুল জলরাশি। ভূগোল-পরিচয়েই পৃথিবীর পরিচয়টা পাই— তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। কিন্তু চক্ষে দেখিয়া মনে হয়— আমাদের পৃথিবীটি ইহার সমক্ষে বালকদের খেলিবার একটি বর্ত্তুলের মত এবং তাহা সহজেই সমুদ্র-গর্ভে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে। এইটিই নাকি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রারম্ভ। শান্ত বটে, কিন্তু তাহা দেখিয়া উদরস্থ প্লীহা শুষ্ক হইয়া যায় ও চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। তাহাতে বঙ্গোপসাগরের দুর্দান্ত দাপট, লম্ফঝম্ফ— তাড়কাবৃত্তি নাই; কিন্তু তাহার গুরুগাম্ভীর্যই শোণিত শুষিয়া লয়।

আমরা হলাম— বকুল-গন্ধামোদিত কোকিল-ডাকা ছায়াশীতল দেশের লোক,— আমাদের ফুরফুরে হাওয়া, ভুরভুরে গন্ধ, ফিনফিনে কাপড়, মিনমিনে সুর, ফিকফিকে হাসি, ধুকধুকে বুক লইয়া কারবার; এ গাম্ভীর্য আমাদের মুহূর্তকে যেন চাপিয়া আড়ষ্ট করিয়া দেয়। এখানে প্রত্যেক তরঙ্গটি দীর্ঘে-প্রস্থে 'উপেনের সেই দুই বিঘা!' কিন্তু কোনটিই মাথা উঁচু করিয়া চলে না, মহা বিনীত পরম ভক্তের মত মেরুদণ্ড দেখাইয়া বেড়ায়। বোসজা দেখিয়া বলিলেন— 'যেন সব অতিকায় কচ্ছপ ভাসছে।' পঞ্চানন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল— 'যে-সে কচ্ছপ নয় বড় বাবু, বোধ হয় স্বয়ং কুর্মাবতার এই পানিতেই ডিম ছেড়ে গিছলেন।' বাস্তবিক সেইরূপই বটে।

যাহা হউক, প্রশান্ত মহাসগারের এই ভীম-গম্ভীর ভাব সত্যই প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া আমাদের অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। মনে হইতেছিল, এই বিরাট ময়াল ক্ষুধা-ক্ষিপ্ত হইলে ব্রহ্মাণ্ড কবলিত করিতে পারেন। ভাবিলাম, এ-সব ভাবের মূলে আমার নার্ভাসনেসই (দুর্বলতাই) কাজ করিতেছে! এমন সময় চাটুয্যে বলিয়া উঠিল—'বাঁড়ুয্যে মশাই,

আপনার ভয় করচে না? এ সমুদ্দুরটার দিকে চাইতে ভয় করে।' আমি বলিলাম— 'চেয়ে কাজ কি।' বোসজা বলিলেন,— 'গাম্ভীর্যটাও যে এত বড় awful (ভয়ানক) জিনিস তা জানতুম না।' আমি বলিলাম— 'জানতেন বই কি, মনে পড়ছে।' বোসজা বলিলেন— 'আপনাদের কথা বুঝতে দুনিয়া খুঁজতে হয়।'

এই সময় আহারের ঘণ্টা পড়িল, ক্রমে পেটেও কিছু পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে পূর্বভাবের পরিবর্তনও দেখা দিল। যত বিভীষিকার বীজ এই পেটে ; পেট খালি থাকিলে সে খেলাইবার স্থান পায়।

স্বদেশী আমলের বড়লাট কার্জন সাহেব তর্জন করিয়া সার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়কে বলিয়াছিলেন— তোমাদের জন্য আমি এত করি, তবু দেশের লোক সন্তুষ্ট নয়! তাহাতে সার ঘোষ মহোদয় বলেন— My Lord, hunger is the worst counsellor— হুজুর পেটে যে অন্ন নেই! ক্ষুধাই কুমন্ত্রণা দেবার ভাঙ্গামঙ্গলচণ্ডী! দেখিলাম— পেটে কিছু পড়ায় প্রশান্ত মহাসগারের বিভীষিকাময় প্রকোপ অনেকটা পাতলা হইয়া পড়িল। তখন অন্যান্য প্রসঙ্গ সহজেই পথ পাইল। দিনটা মামুলি ভাবেই কাটিয়া চলিল।

১৭

এই অবকাশে একটা অন্য বিষয় সারিয়া রাখি। এই যে Follower (ফলোয়ার) বা সহচর-শ্রমিক নামক জীবগুলি চিন-অভিযানের সঙ্গী হইয়াছে, ইহাদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সকলেই জানেন— ভৃত্যেরাই বড়লোকদের হাত-পা। একদিন যদি পাচক, চাকর, দাসী, কোচম্যান, খানসামা, কি মেথর না আসে, ত সংসার অচল, আর বাবুয়ানা কানা হইয়া পড়ে। যুদ্ধাদি অভিযানক্ষেত্রে ফলোয়ারেরাই সেই হাত-পা। যুদ্ধ করাটি ছাড়া অফিসার ও গোরাদের আহারের আয়োজন হইতে আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থাই ইহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা না থাকিলে গোরাদের হাতের হাতিয়ার অচল হইত।

আমাদের গ্রামের জনৈক বিশিষ্ট বড় লোকের বাড়ীতে রোসকে হাড়ী বলিয়া একজন মাইনে-করা মেথর নিযুক্ত ছিল। পান-দোষটা রসিকের বরাবরই অভ্যাস। একবার ঝোঁকের মাথায় সে তিন দিন পানেই মত্ত থাকে। বড় লোকের বড়-সংসার— অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু রসিক রসোন্মত্ত ; দরোয়ানের ধমক ভাঙ্গাইতে পারিল না। চতুর্থ দিন যথাসময়ে রসিক আসিয়া হাজির। বাবু চটিয়া এই মারেন ত এই মারেন। রসিক তখনো সরস ; সে হাত জোড় করিয়া বলিল—'রসিককে ছোঁয়া যার তার কাজ নয় প্রভু, এমন ভদ্রলোক ত' দেখতে পাই না ; কেন মিছে মাখন-খেগো মাথাটা গরম করচেন ? আমি ত' বারমাস তিরিশ দিন ময়লা সাফ করে আসছি, হুজুর দয়া করে তিনটে দিন আর চালিয়ে নিতে পারেননি! যান তামাক খানগে।— যার জোড়া মেলে না, তার কি অপরাধ নিতে আছে প্রভু,— বড়লাট একজনই থাকে!' গ্রামের মিউনিসিপালিটি তখনো এ জিনিসটি মাথায় করেন নাই।

ফলোয়ারগুলিও, স্বভাবে ও সামর্থ্যে সেই রসিক। ইহাদের মধ্যে মেথর, মুচি, ধোপা, ছুতার, কামার, কসাই, বাবুর্চি, রুটিকার

(বেকার), Muleteer (খচ্চর-সওয়ার), টেন্ট লশকর, ভিস্তি, মায় ব্রাহ্মণ বর্তমান। ইহাদের কাজকর্ম বা জাতির কথাটাই বড় কথা নয় ;বিশেষত্বটাই বলি। ইহাদের মধ্যে Permanent servant (পাকা চাকর) কেহই নয় ; যুদ্ধের গন্ধ পাইলেই ইহারা হাজারে হাজারে আসিয়া জমায়েৎ হয়। কাজ পড়িলেই ইহাদের ডাক পড়ে ;কারণ বারমাস এত কুপোষ্য পোষা সরকারের পক্ষে সহজ নয়। এ ছাড়া, Normal বা Peace condition-এর (শান্তির অবস্থার) বারমেসে লোকও আছে। এই যে জীবগুলি, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই Second Kabul War (দ্বিতীয় কাবুল অভিযান) হইতে, বংশাবলীক্রমে লড়ায়ের লোভে লালায়িত হইয়া আছে। তাহার কারণ, ইহাদের বাপ খুড়ারা সম্ভবতঃ নিজেদের পক্ষের হতাহতদের পকেট মারিয়া মানুষ হইয়া ফিরিয়াছিল।

ডুলিবাহক. স্ট্রেচারবাহক ও ভিস্তিদের লড়াই-লাইনের খুব নিকটেই থাকিতে হয়। হতাহতদের তৎক্ষণাৎ সরানো বা হাসপাতালে লইয়া যাওয়া এবং পিপাসিতদের জলখাওয়ানই ইহাদের কাজ। কোন কোন 'কাহার'কে বা ডুলিবাহককে গল্প করিতে শুনিয়াছি— তাহার বাপ 'চিত্রাল' অভিযান হইতে আংটি, ঘড়ি, চেন. গিনি, টাকা ও নোটে দশ-বার সের লইয়া ফিরিয়াছিল। খুড়ো বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে সে আজ তালুকদার হইয়া বসিত।

কেহ বলিতেছে— তাহার বাপ 'টিরা' অভিযানে গুলি লাগিয়া মারা যায়! মৃত্যুকালে সম্বন্ধী উপস্থিত ছিল ; গলা হইতে গিনি-ভরা বটুয়া, আর কোমর হইতে আংটি আর চেন ভরা গেঁজে খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া, আমাকে দিবার জন্য শপথ করাইয়া লয়। বেইমান আমাকে তিনখানি গিনি আর দুইটি আংটি মাত্র দিয়াছিল। তাহাদের সে ঝগড়া এখনো চলিতেছে ; পঞ্চায়ৎ মিরাট হইতে বুদ্ধু-কাহারকে তলব করিয়াছে,— সে সে-সময় উপস্থিত ছিল ; ইত্যাদি।

ফল কথা,— হতাহতদের পকেট পরিষ্কার আর লুটে লক্ষপতি হইবার পরোক্ষ প্রত্যাশা ছাড়া প্রত্যক্ষ লাভটাও ইহাদের পক্ষে কম লোভনীয় নহে। বিনা ব্যয়ে পর্যাপ্ত আহার, সরকারী উর্দী (অর্থাৎ—

কোট, কামিজ, পাজামা, পাগড়ি, টুপি, ওভারকোট, কম্ফটার, জুতো, মোজা, দুখানা কম্বল ইত্যাদি) ; তদ্ব্যতীত দেড়া মাইনে,— সেটা সম্পূর্ণই জমার খাতে থাকিবার কথা,— কারণ বাজার না থাকায় বাজে ব্যয়ের বালাই নাই। কাজের সময় খাটুনি আছে বটে, সেটা নিত্য নয় ; অধিকাংশ সময়টা গান, গল্প, গুড়ুক আর সুবিধামত নেশা-ভাং!

কেহ বলিতে পারেন,— প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কি আছে, সেই প্রাণইত সর্বক্ষণ শমনকে উৎসর্গ করিয়া রাখিতে হয়। সে চিন্তাটা তাহাদের নাই বলিলেই হয় ; তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথম, ফলোয়ারমাত্রকেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয় না ; তাহাদের অধিকাংশকেই পাঁচ সাত মাইল পশ্চাতে base-এ (প্রধান আড্ডায়) থাকিতে হয়। দ্বিতীয়, সৈন্য নির্মূলান্তে সহচর-সাফাই, এমন সময় তাহাদের জ্ঞানে ইংরেজের আমলে ঘটে নাই ; Doctor Brydon (ডাক্তার ব্রাইডন্) মুখ-নিঃসৃত doleful (খেদাত্মক) কাহিনীও তাহারা ইতিহাসে পড়ে নাই। আর তৃতীয়, অভাবে স্বভাব নষ্ট, কি ঘটিবে না ঘটিবে, বা কি ঘটিতে পারে, সে-সব চিন্তা সম্বন্ধে তাহারা বেজায় বে-পরোয়া।

তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি অবতার বিশেষ, এমন মন্দ কাজ নাই, যাহা করিতে তাহারা পশ্চাৎপদ,— কেহ জেলখালাসী, কেহ গাঁয়ের terror (আতঙ্ক) স্বরূপ। সকলেই মোড়ল। সবাই সবজান্তা, প্রত্যেকেই ওস্তাদ ;— লড়ায়ে যাওয়াটা তাহাদের সখ বা নেশা এবং বড়ায়ের বস্তু।

অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে ইহারা দিনকতক ভাল খায়-দায়, কাঁসি বাজায়, আর মাতব্বরি করিয়া বেড়ায় ; তখন বেশ দিল্‌দরিয়া মেজাজ। ক্রমে প্রাপ্ত পোশাক পরিচ্ছেদ বিক্রয়ান্তে ঋণগ্রস্ত হইয়া পুনর্মূষিক হয়। কিন্তু প্রাণটা ষোল আনাই লড়ায়ের প্রত্যাশায় পড়িয়া থাকে। শকুনীরা সুদূর আকাশ হইতে একবার ভাগাড়গুলো দেখিয়া লয়— কোথাও কিছু আছে কিনা ; ইহারাও সেইরূপ সুদূর হইতে, প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কোন cantonment-এর (সেনা-নিবাসের) আপিসে, লাইনে বা রেজিমেন্টে সংবাদ লইতে আসে— কোথাও লড়ায়ের সম্ভাবনা আছে কিনা, অন্ততঃ কতদিনে সম্ভব। সামান্য একটু আশ্বাস পাইলে আনন্দের

পরিসীমা থাকে না। নিজেরাই তখন বলে— 'কোই না আওয়ে তো— রুশ তো জরুর আওয়েগা ; জার্মানী ভি তৈয়ার হো রহা হ্যায়। আরে ভাই,— আফ্রিদি জিতা রহে তো— জলসা লাগাই রহেগা,...ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে এই আলোচনাই সর্বক্ষণ চলিয়া থাকে এবং ইহাতেই পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

হুজুগ, রগড় আর মজায় মস্‌গুল থাকাই ইহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। পেটে অন্ন নাই, কিন্তু পাগড়ির মধ্যে ও কানে সর্বদাই রেড-ল্যাম্প সিগারেট গোঁজা আছে। তাহা নেশার ফাউ হিসাবে চলে! ইহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচ-সাত জন মাত্র— সত্যই পেটের দায়ে, আর সংসার প্রতিপালনার্থ, যুদ্ধযাত্রার সঙ্গী হয়। তাহারা প্রায়ই নিরীহ ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য এবং তাহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। সরকারী কাজ ছাড়া ঐ-সব জাল-ছেঁড়া পোলো-ভাঙ্গাদের খিদমত খাটিতে ও তাঁবেদারী করিতে, আর মন জোগাইয়া চলিতে তাহাদের প্রাণান্ত হয়। ফলোয়ার-রূপী জীবগুলির পরিচয়— সংক্ষেপতঃ এই।

কিন্তু চিনযাত্রা সংস্রবে এবার তাহাদের বহু নূতনত্ব আছে ; কারণ এবার লীলাক্ষেত্রটা ভারতের বাহিরে,— কাজেই তাহাদের প্রচুর সরঞ্জামে পা বাড়াইতে হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত সরকার বাহাদুর কেবল মামুলি তামাকের ব্যবস্থাই করিয়াছেন,— চরস্, গাঁজা ও ভাংয়ের কথাটা সরকারী সুবুদ্ধিতে জোগায় নাই! ইহারা সে-ভুলটা সম্যক্‌রূপেই সুধরাইয়া চলিয়াছে। এবার— গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, ভাঁড় (রহস্যকার) জমায়েতভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। মন্দিরা, খঞ্জনি, ঢোলক, তবলা, বাঁয়া, হুড়ুক, ঘুঙুর, সারেঙ্গী,— কিছুরই অসদ্ভাব দেখিলাম না,— রামরাজ্য বলিলে হয়!

জাহাজের নাবিক ও ভৃত্যদের মধ্যে চাটগাঁয়ের মুসলমান ও গোয়ানিজ এই দুই জাতিই ছিল। দেখি— এই শ্রীমান ফলোয়ারেরা ডেক্-প্যাসেঞ্জার হইলেও এক আদ পাপ্‌ড়ি গাঁজা ছাড়িয়া সকল সুবিধাই করিয়া লইয়াছে,— বরফ্ লিমনেড, এমন কি বিয়ারও চলিয়াছে। গাঁজার মহিমা অতলস্পর্শের বক্ষেও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সরকার-নিযুক্ত এই রণযাত্রার রংমহলের এক প্রকার প্রধান পাত্র ছিলেন 'আবদুল্লা'; ইনি খাস্ লক্ষ্ণৌয়ের আমদানী— চতুর-চূড়ামণি, রহস্যরসিক ও অনুকরণ-বিদ্যা-বিশারদ। আকার-প্রকার ভাবভঙ্গীতে, ছিপ্‌ছিপে ও ছুঁচোলো— খাঁটি-রজার্-মেকার্! এক দিনেই সে একটা সহর-শুদ্ধ লোকের পরিচিত হইবার ক্ষমতা রাখে।

১৮

সন্ধ্যার পর আমাদের চায়ের বৈঠক্ বসিয়াছে, দত্তজাও উপস্থিত আছেন। তিনি যে কেবল বক্তৃতায় চা'পানের বিরোধী ছিলেন তাহাই নহে, বাড়ীতে চায়ের চিহ্নমাত্রও রাখিতেন না। পরের ধন বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক,— অধুনা জাহাজে ওটা আহার হিসাবেই গ্রহণ করেন— পরিমাণও ভোজনানুরূপ। (তখন দেশে— 'চা পান করিলে হয় তৃষ্ণা নিবারণ' ইত্যাদি লিপ্‌টন্ সাহেবের চতুর্দশপদীর পদার্পণ ঘটে নাই, নচেৎ দত্তজা কখনই বাড়ীতে সাহেবের কথার অবমাননা করিতে পারিতেন না।)— আমাদের চায়ের মজলিস চলিয়াছে, এমন সময় আবদুল্লা আসিয়া খুব আদব-কায়দা-দুরস্ত অভিনব অভিবাদন নিবেদন করিয়া বড়বাবুকে বলিল— 'হুজুর কদরদান হাঁয়, গুস্তাকি মাফ কিজিয়ে— হুকুম হোয়ে তো আজ কুছ দেখায়েঁ— শুনায়েঁ। 'আবদুল্লার উপর দত্তজার বিষদৃষ্টি ছিল। আবদুল্লার কথায় হাড়ে চটিয়া চাপা গলায় 'রাস্‌কেল্' বলিয়াই তিনি মুখ ফিরিয়া বসিলেন।

আবদুল্লার এই অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বোসজা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া তাড়াতাড়ি খুব মোলায়েম সুরে বলিলেন—আবদুল্লা, আজ আমার শরীর ভালো নেই, এখুনি শোব ভাবছি, আজকে থাক বাবা। তুমি দুঃখিত হয়োনা, চীনে পৌঁছে যত পারো শুনিয়ো ;—আমার এসব শোনবার খুব সখ আছে।' ইত্যাদি বলিয়া আবদুল্লার নিকট রেহাই পাইলেন ও তাহাকে বিদায় করিয়া বাঁচিলেন। বুঝিলাম—বোসজার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

আমিও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, বাঁচিলাম। বোসজা তখন হাসিয়া বলিলেন—'আমাকে আজ সকাল সকাল শুতেই হবে!' শুনিয়া দত্তজা উত্তেজিতভাবে বলিলেন—'আপনি ঐ beastকে (পশুটাকে) ভয় করেন নাকি? বেটাকে হাঁকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।' বোসজা বলিলেন—'শুধু

আমরা নয় দত্ত, স্বয়ং যম ভয় করেন, ওদের ঘাঁটাতে নেই।'

যাহা হউক এই শ্রেণীর জীব বাংলা দেশে বিরল। গৌরব কি অগৌরবের কথা— ঠিক বলিতে পারি না,— কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে আজিও কেহ ফলোয়ার বা কুলি হইয়া, কোন অভিযানের সহিত গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। হইতে পারে— তাহাদের তেমন অন্ন-কষ্ট নাই ; হইতে পারে—তাহারা তেমন adventurous (ডান্‌পিটে) নহে, বা অপেক্ষাকৃত ভীরু ; হইতে পারে— বঙ্গদেশের ইতর সাধারণের আত্ম-সম্মান জ্ঞানটা একটু সজাগ, কারণ বাংলাদেশের মুটে-মজুরকেও ইহাদের 'মেড়ো' বলিয়া উপেক্ষা ও উপহাস করিতে শুনিতে পাই।

যে কারণেই হউক, বাংলার ইতর সাধারণ ও শ্রমিকেরা আজিও অতটা চরিত্রহীন হইবার সুযোগ পায় নাই।— বাঙ্গালী-রেজিমেন্ট থাকিলে সম্ভবতঃ ইহাদেরও ফলোয়াররূপে দেখিতে পাইতাম। ঊনপঞ্চাশের উমেদারি-উপসর্গটা উবিয়া গিয়া সে বালাই ঘুচিয়া গিয়াছে।*

গত জর্মান-যুদ্ধে উক্ত মূর্তিমানেরা নিশ্চয়ই ফলোয়াররূপে গিয়া থাকিবে। এই ফক্কড়েরা ফ্রান্সে যে কি ফার্স অভিনয় করিয়াছে, ও ভারতের কি পরিচয় রাখিয়া আসিয়াছে, তাহা অবশ্যই কেহ না কেহ লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ফরাসী ফলোয়ারদের মধ্যে ইহারা অন্ততঃ দশ-বিশজনকেও গেঁজেল না বানাইয়া ফেরে নাই।

*Dr. S K. Mullick's No 49 Bengali Regiment.

১৯

কখন যে সেই প্রলয়-পয়োধি— বিশ্বের বিরাট ঐশ্বর্য— প্রশান্ত মহাসাগর সরিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই! প্রাতে দেখি— ইনি ত তিনি নন, এ-যে দেখি শ্যামা সুনীলবরণা! সে বিশ্বগ্রাসী বারিধির চিত্ত-বিহ্বলকারী গাম্ভীর্য কোথায়! এ-যে গায় পড়িয়া ঝগড়া করিতে আসে! তরঙ্গগুলি বঙ্গোপসাগরের অনুকরণেচ্ছু, কতকটা তাঁহারই cheap edition (সস্তা সংস্করণ) ;— ইনিই Chinese Sea বা চিন সমুদ্র।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। অনুকূল বায়ু পাইয়া পাল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বায়ু ও বাষ্প সাহায্যে জাহাজও দ্রুতবেগে চলিয়াছে, দুরন্ত তরঙ্গ তাহার গতিভঙ্গ করিতে পারিতেছে না। কলের জাহাজে (Steamship)-এ পাল তোলা নিত্য কর্মের মধ্যে নহে, তাহা অনুকূল বায়ুর অপেক্ষা করে ; এই ২২।২৩ দিনের মধ্যে ৫।৭ দিন মাত্র পালের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে, আকাশটা স্বচ্ছ পাইয়া সকলের মনগুলাও আজ যেন স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিতেছে। ইউরেসিয়ান group (দল) শিস্ দিয়া বেড়াইতেছে ; মাঝে মাঝে পেন্টেলুনের পকেটে হাত পুরিয়া ডিঙ্গি মারিয়া মোড় ফিরিতেছে—কেহ সুর তুলিয়া দু'পা নাচিয়াও ফেলিতেছে, সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়াছে ; অনেকেই গুণ্ গুণ্ রব তুলিয়াছে ; জাহাজ যেন আজ মধুচক্র!

আমাদের লক্ষ্ণৌয়ের আবদুল্লা ভৈরবী ধরিয়াছে— 'মো-রি নেইয়া পা-রে লাগা'। সময় সুর ও ভাবের সম্মিলনে অনেকেরি কানে ও প্রাণে টান পড়িয়াছে। এই— মেঘ বৃষ্টি, বজ্র বায়ু ও কুয়াসার রাজ্যে, বাস্তবিকই এমন দিন অল্পই আসে।

স্নানান্তে জলযোগ ও চা-পান সারিয়া উপরের ডেকে বসিয়া কথাবার্তা চলিয়াছে। এমন সময় চাটুয্যে আসিয়া তাহার হাত দেখিবার জন্য

মজুমদারকে ধরিয়া বসিল। মজুমদার বুঝিল, এ পঞ্চাননের কাণ্ড। সে কোনরূপ প্রশ্ন বা ইতস্ততঃ বা ওজর না করিয়া অতি সহজ-গম্ভীর ভাবেই বলিল,— 'দেখ চাটুয্যে, যদি হাসি-তামাসার কথা না হয়— যথার্থই কিছু জানতে চাও ত' বাঁড়ুয্যেকে হাত দেখাও। আমি ওঁরই কাছে দু'চারটে রেখা সম্বন্ধে কিছু শুনেছি মাত্র,— সে বিদ্যেতে কারুকে কিছু বলা চলে না ভাই, উচিতও নয়।'

কথাগুলি মজুমদার এমনভাবে বলিল যে তাহার উপর চাটুয্যেরও কথা চলে না, আমারও অব্যাহতি মেলে না, কাজেই অবস্থাটা অনুমান করিয়া লইয়া, চাটুয্যে কিছু বলিবার পূর্বেই তাহার হাতটা টানিয়া লইয়া বলিলাম— 'দেখি'। চাটুয্যে মহা খুসী হইয়া বলিল— 'বাঁড়ুয্যে মশাই জানেন— তবে আর কি!' পঞ্চানন বলিল— 'কেন? উনি কি বলবেন— তুমি রাজা হবে!' চাটুয্যে বলিল— 'না, তা কেন, তাহলে যখন তখন'—কথা শেষ করিতে না দিয়াই, পঞ্চানন বলিল—'হ্যাঁ, তা বটে, আয়েসার হাত কিনা, উনি যখন-তখন না-দেখে থাকতেই পারবেন না। 'হাত ত নয়'— কর-কৃষ্টকমল, যেন এক ছড়া কাঁচ্‌কলা পোড়া!'

পঞ্চাননের জন্য মধ্যে মধ্যে সকলকেই মহা অশোভন অবস্থায় পড়িতে হইত, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল,— বড়বাবু পর্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়িলেন। চালা ঘরে আগুন লাগিলে বাঁশের গাঁটগুলো যেমন মাঝে মাঝে সশব্দে ফাটে, হাসিটাকে চাপিতে গিয়া সেটাও মধ্যে মধ্যে নানা সুরে ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

আমার অবস্থাটা বলিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা বুঝিয়া লইতে বলাই ভাল। একটু ক্রুদ্ধভাবে পঞ্চাননকে বলিলাম— 'তুমি উঠে যাও ত', সামুদ্রিকটা ঠাট্টা-তামাসার সামগ্রী নয়।' সে বলিল— 'মাপ করুন, আর আমি একটি কথা কইব না।' পঞ্চাননের বিদ্রূপটা চাটুয্যেকে বড়ই বাজিয়াছিল, সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল— 'উঃ. নিজে কি কাশ্মীরী কানাই!' চাটুয্যের মুখে এই অপ্রত্যাশিত পদটি পাইয়া আমরা সকলে আশ্চর্য ত' হইলামই, পরন্তু, অবস্থাটা সামলাইয়া লইবার জন্য ততোধিক হাসিলাম ও বাহবা দিলাম এবং বলিলাম— 'খুব বলেচ চাটুয্যে,— 'বিলিতী বলরাম' বলতেও

পার।' তাহাতে চাটুয্যের নির্বাণোন্মুখ উৎসাহটাকে ফিরিয়া পাওয়া গেল ; নচেৎ আমার সামুদ্রিক বিদ্যাটা আজিকার মত সমুদ্রেই ডুবিয়াছিল।

আর অধিক বাড়াবাড়ির অবসর না দিয়া বলিলাম— 'আহারের পর বারবেলা পড়ে যাবে, এখন অমৃত যোগ যাচ্ছে— তার গা ঘেঁশে রয়েছেন সুতহিবুক, শুক্রও গোচরে আছেন, এই সময় দেখাই ভাল।' চাটুয্যে তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতটা বাড়াইয়া দিল! তার বহুভাগ্য যে পঞ্চানন সেটা লক্ষ্য করে নাই।

একটা কথা পূর্বে বলা হয় নাই ; মূর্তিটা সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও চাটুয্যের কথাবার্তা ও স্বভাবে কতকটা মেয়েলিভাব ছিল। 'ওমা!'...'কি হবে মা!' 'মুখপোড়া' প্রভৃতি মহিলাসুলভ শব্দ সে সর্বদাই ব্যবহার করিত। আমি সত্বর তার ডান হাত টানিয়া লইয়া নির্বিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

দেখার ত' কোন প্রয়োজনই ছিলনা, প্রয়োজন ছিল নিজের ফাঁড়া কাটানোটা। চাটুয্যের 'চেটোর' প্রতি চাহিয়া, চক্ষু দেখিল—কোম্পানির আমলের সেই সিংহাদির আস্ফালিত লাঙ্গুল আর পদাদি পল্লবিত একটি ডবল পয়সার মক্স! জমিটা তাম্রবর্ণ, আর রেখাগুলি কৃষ্ণাভ। কখন একাগ্র কখন তীব্র দৃষ্টির পর, ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া বলিলাম— 'একি, মস্ত বড় জলে ডোবার ফাঁড়া যে! কেটে গেছে ত!' চাটুয্যে আশ্চর্য হইয়া বলিল— 'সে— পুনর্জন্ম বল্লে হয়, ঘোষালদের পুকুরের ওপারে একটা শজনেগাছ ঝুঁকে পড়েছিল ; শজনে খাড়া পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙ্গে গভীর জল একদম তলিয়ে গিছলুম। সাঁতার জানি না, একেবারে পাঁকে গিয়ে ঠেকি!' পঞ্চানন ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল— 'কেউ আবাব তুল্লে নাকি?' শুনিয়া ভাবিলাম— আবার কি ঘটায়। চাটুয্যে কিন্তু সহজ ভাবেই উত্তর করিল,— 'নিমে কাওড়ার বউ ভাগ্যিস দেখতে পেয়েছিল, সে ছুটে এসে অনেক কষ্টে তোলে।' এই পর্যন্ত শুনিয়াই নিতান্ত নারাজ ভাবে 'হা— রাম্‌জাদি!' বলিয়াই পঞ্চানন উঠিয়া গেল।

কথাটার ভাবগ্রহণে বাধা দিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম— 'দেখে আমি বড় ভয় পেয়েছিলুম চাটুয্যে ; ও মারাত্মক ফাঁড়াটা যদি পুকুরেই কাটিয়ে না আসতে, তা হলে সকলকেই আজ ফাঁশিয়েছিলে আর কি ;

এই অকূল সমুদ্রে ওটা সকলকেই মাথা পেতে নিতে হ'ত। সূর্যসিদ্ধান্ত-মতে— সঙ্গের প্রভাব বড়ই প্রচণ্ড, ওতে 'সঞ্চারীগ্রহ সঙ্গম' অনিবার্য ; তখন বিপদটার সঞ্চার সকলের মধ্যেই সমান ভাবে হয়। যেমন নিজে চুরি না করলেও, চোরের সঙ্গে থাকলেই সমান সাজা ভোগ করতে হয়,— যাক্ ভগবান রক্ষে করেচেন।'

এই সময় মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা পড়িল, আমি বাঁচিলাম। কেবল চাটুয্যের প্রীত্যর্থে বলিলাম— 'এসব বিষয়ের আলোচনা প্রাতে শুদ্ধচিত্তে করাই প্রশস্ত, পঞ্চাননের মত অবিশ্বাসীর সামনে একেবারেই নিষিদ্ধ। চীনে না পৌঁছুলে একান্ত হতে পারব না, সেই সময় দেখিও।' চাটুয্যে আমার বিদ্যাবত্তায় আশ্চর্য ত' হইয়াছিল, এখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিল— 'সেই ভাল বাঁড়ুয্যে মশাই, ও অনামুকোর সামনে আর নয়।' বড়বাবু গম্ভীরভাবে কথাটা অনুমোদন করিয়া বলিলেন— 'শাস্ত্রীয় বিষয়ে তা' করাও উচিত নয়।' তখনকার মত আসর ভাঙ্গিল। দত্ত কিন্তু আমাকে একান্তে পাইয়া বলিল— তোমার যে Chiromancy জানা আছে তা জানতুম না— আমার হাতটাও একদিন দেখতে হবে, কারুর সামনে কিন্তু নয়। ও সায়েন্সটায় আমার বিশ্বাস আছে।' আমি একটু হাসিলাম মাত্র। দত্তর মত লোকের কাছে আমি এটা আদৌ আশা করি নাই।

২০

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত রাজনীতি চর্চাটাও চলিয়াছিল। মধ্যাহ্নভোজনান্তে ঘণ্টা দুই শয্যা লওয়া যাইত, আজও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বেলা তিনটার পর পঞ্চানন ব্যস্তভাবে আসিয়া সংবাদ দিল— 'সুবিধে নয়, উঠে পড়ুন ; আকাশ আর বাতাসের আয়োজন দেখে বোধ হচ্ছে একটা বড় রকম কিছু আসছে ; ওপরে হৈ চৈ পড়ে গেছে।'

পঞ্চাননের কথায় হঠাৎ কেহ প্রত্যয় করিয়া ঠকিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু চাহিয়া দেখি যেন সন্ধ্যা উপস্থিত ; জাহাজও গা-নাড়ার রিহার্সেল আরম্ভ করিয়াছে। এই ভাবটা নিদ্রোত্থিতের প্রাণে সহসা ও সহজেই একটা ভয়ের ছায়াপাত করিল। সেই অসংযত অবস্থাতেই সকলে সত্বর উপরের ডেকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে ত্রাসে তটস্থবৎ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মাথার উপর স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে।

'দানবী এলায় তার মেঘময় বেণী।'

চপলা ছুটাছুটি করিয়া আকাশকে ফালা-ফালা করিয়া চিরিতেছে, আর মুহুর্মুহু গুরু গর্জন। বায়ুর গতির মতিস্থির নাই, প্রবল ঘূর্ণীর মত এক একবার সাড়া ও নাড়া দিয়া যাইতেছে ; বৃষ্টি আসন্ন। নীচে সমুদ্র রুদ্রমূর্তিতে সাজিতেছেন। জাহাজের উপর মানুষের শিক্ষা ও সামর্থ্য মত সময়োচিত সাবধানতা অবলম্বিত হইতেছে। উপরের ক্যাম্বিসের ছাত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, কল-কব্জা ভাল করিয়া কসা হইতেছে, কোথাও শক্ত বাঁধন দেওয়া হইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্বয়ং পরীক্ষায় ও পরিদর্শনে ব্যস্ত।

সকালে স্বচ্ছ আকাশ ও অনুকূল বায়ু পাইয়া যে পাল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বৈকালে সহসা বিপৎসঙ্কুল প্রতিকূল বায়ুর আবির্ভাবে সত্বর সেই পাল গুটাইবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত। এ-ত আর পান্‌সির পাল নয়

যে, যে-কেহ তাহা একাই মাস্তুল সমেত তুলিয়া সামলাইয়া নিশ্চিন্ত হইবে। যিনি যত বড়, তাঁর বিপদ আর ঝঞ্ঝাটও তত বড়। এঁরা একখানি যেন জটায়ুর ডানা। দেখি, সেই ঝড় ও আসন্ন বিপদের মুখে বোধ হয় বিশ জন লোক— কেহ দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া, কেহ রশি ধরিয়া, কেহ অভ্রভেদী মহাদ্রুমে যাত্রা করিয়াছে,— মহাযাত্রা বলিলেই ভাল হয়। এই সঙ্কটসঙ্কুল কাজটির জন্য boyএরাই (ছেলে ছোকরারাই) অধিক উপযোগী। 'ডান্‌পিটে' আখ্যাটা এস্থলে পুরো প্রশংসাবাচক ও গৌরবাত্মক!

জাহাজ ঘন ঘন পাশমোড়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে ; মাস্তুলগুলি এক মুহূর্তও আর যথারীতি সমকোণের উপর থাকিতেছে না,— স্থূল ও সূক্ষ্ম কোণই টানিতেছে। ভাব দেখিয়া মনে হয়, ক্রমে সমুদ্র-চুম্বনের চেষ্টা পাইতে পারে। এই অবস্থায় নাবিকেরা কিন্তু মাস্তুলের বাহুর উপর উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে ও দড়ি টানিয়া ভাঁজে ভাঁজে সেই অতিকায় পালগুলিকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে! সন্নিকটে পাইবামাত্র সেই বাহুদণ্ডে বুক এবং শূন্যে হস্তপদ, এই অবস্থায় প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে, জল হইতে ন্যূনাধিক ৬০ ফিট ঊর্দ্ধে, সেই ভীষণ পালগুলিকে,— যথাসম্ভব নয়, যথারীতি সুসংযত ও শোভন করিয়া গুটাইয়া বাঁধা আরম্ভ হইল! এই ব্যাপার অতিবড় সাহসীর পক্ষেও স্থিরচিত্তে দেখা সম্ভব নয়।

এমন সময় 'বেয়নেট চার্জ' বা শরনিক্ষেপের মত সবেগে বৃষ্টিধারা আসিয়া পড়িল। একে ত মাস্তুলের উপর মানুষগুলিকে মর্কট পবিমাণ দেখাইতেছিল, এখন বৃষ্টির মধ্যে তাহাদের লক্ষ্য করাই দুষ্কর হইল। ভাবিলাম, এ-ঝড়ে তাহারা স্খলিত ও স্থানচ্যুত হইবেই ; যদি জলে পড়ে ত তুলিবার চেষ্টা চলিতেও পারে ; জাহাজের উপর পড়িলে মাত্র পাজামাটির পাত্তা পাওয়া যাইবে। এই কথা মনে হইতেই মাথাটি বোঁ করিয়া উঠিল, ঊর্দ্ধে চাহিবার আর সামর্থ্য রহিল না! পঞ্চানন বলিল,— 'বেটারা কি মুখ্যু, হুস্ ক'রে টেনে নিয়ে পুঁটলি পাকিয়ে রেখে নেবে আয়না বাপু!'

আমরাও সামরিক বিভাগে কাজ করি, সে-বিভাগের আদেশ আর নিয়মানুবর্তিতা যে কিরূপ কড়া তাহাও জানি ; কিন্তু নৌ-বিভাগ নাকি

এ-সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ— 'তেকার্ বাপ্।'

শমনের সন্নিকটবর্তী এই মাস্তুল-মর্কটগুলির এমন ক্ষমতা বা সাহস নাই যে, পালগুলিকে রীতিমত সৌষ্ঠব-দুরস্ত চোস্ত ও শোভন করিয়া না-বাঁধিয়া নামিয়া আসে। এই আসন্ন মৃত্যুমুখেও পালের কোনখানে একটু কোঁচ্ বা ঝুল রাখিয়া অর্থাৎ অশোভন, অবস্থায় রাখিয়া নামিবার যো নাই। যে জাতের মৃতদেহ গোরস্থ করিবার পূর্বে প্রসাধন অপরিহার্য, চুল ফেরানো চাই, কামিজের কফ্ কলার না মোচড় খায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা চাই, তাহাদেরই এই ভীষণ ভব্যতা সাজে ;— ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

ক্লিওপেট্রা মৃত্যুমুহূর্তেও তাঁহার মুকুট না তিলমাত্র স্থানচ্যুত হয় বা বে-মানান ভাবে একচুল বাঁকে, সে-সম্বন্ধে সম্যক সজাগ ছিলেন। আর আমাদের? পরম আত্মীয় ও সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমই আমাদের শ্রীমুখে খড়ে নুড়ো জ্বালিয়া দিয়া এবং শ্মশান-পক্ক পিণ্ড, (যাহা বোধ হয় কুক্কুরেরও অভক্ষ্য) তাহাই বদনে দিয়া বিদায় করে। নিশ্চয়ই ইহার শাস্ত্রীয় তাৎপর্যের এবং তারিফের অভাব নাই— তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও থাকিতে পারে। মিথ্যা স্বপ্নের আবার এত রোশনাই, এত সৌষ্ঠবসাধন কেন? কিন্তু "পোড়ারমুখো দেবতার ঘুঁটের ছাই নৈবিদ্যিই শোভন,"— এই প্রবচনটাই বোধ হয় সুপ্রয়োগ। ক্ষমা করবেন,— না হয় একটা সত্য ঘটনা শুনুন ঃ

২১

জমিদার বাড়ির সম্মুখ প্রাঙ্গণে মতি রায়ের যাত্রা। ক্ষুদ্র গ্রামখানি আনন্দান্দোলিত। আসর দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। সুন্দর সামিয়ানামোড়া ম্যারাপ, ম্যারাপের থামগুলিতে সালুর উপর দেবদারু পাতার বেড়্, তাহাতে জোড়া-সেজের দেলগিরি,— তন্নিম্নে পুষ্পমাল্য বেষ্টনে সুন্দর চিত্র সকল। আসরের মধ্যে ষোলটি ঝাড়্ ও তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ বর্ণের বেল্লাণ্ঠান। মাথার উপর বেল-ফুলের মালারজাল (net-work)। নীচে মেঝেয় ৪।৫ মণ ওজনের প্রকাণ্ড একখানি মূল্যবান গালিচা পাতা। গ্রামস্থ ইতর ভদ্রেরা খুবই হাম্রাই ;— পান গুড়ুক্ আতর গোলাপের ছড়াছড়ি। চারিদিকেই প্রফুল্লতা, কেবল গ্রামের দেবদারুগাছগুলি যেন প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া ফিরিয়াছে।

অভিনয়— 'রাবণবধ'। অনিন্দ্যসুন্দর আসর আর সমঝদার শ্রোতা পাইয়া, মতি রায় মহাখুসী হইয়া অষ্টাদশ পুরানের কোন কথাই বাদ দিলেন না! লম্বা লম্বা উপদেশ ও 'সার্মনে' যুবকদের সুধরাইয়া বৃদ্ধদের কাঁদাইয়া, বালকদের বিরক্ত করিয়া, বাহবা আর বায়নার টাকা লইয়া বিদায় হইলেন।

কোন বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, বা কোন কাজের কথা কওয়া বা শোনা, জমিদারদের রীতি নহে ;তাহা লজ্জার কথা, তাহাতে সম্মান সম্ভ্রম খাটো হয়। তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যখন জরিজড়ানো বৃহল্লাঙ্গুল সদৃশ ফুর্শির্ নল লোকের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল, আসরে তখন বেলফুলের মালা ছেঁড়াছেঁড়ি ও কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। তাহাতে দু'তিনটা ঝাড়ের অঙ্গহানি ঘটিল, কয়েকটা লাণ্ঠান ভাঙ্গিল, দু'চারখানা ছবি অন্তর্হিত হইল। পরে পাইক, ভৃত্য, ইতর ভদ্র অন্যূন পঞ্চাশ জন মিলিয়া যে-যেখানে পাইল, সেই মহা-গালিচাখানি ধরিয়া, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে-পিণ্ড পাকাইয়া ফেলিল, এবং হৈ হৈ

শব্দে তাহাকে টানিয়া আসর-সংলগ্ন নহবৎখানার নীচে তাহার মহাযাত্রা সমাধা করিল।

সদ্‌গতির উপায়গুলি তাহার মধ্যেই রহিয়া গেল, যথা ছেঁড়া মালা, টাক্‌পড়া ফুলের তোড়া, সশাখা দেবদারু পত্র, গুড়ুকের গুল্, টিকের ছাই, আর সহস্রাধিক লোকের জাতি-সমন্বয়ানুকূল পদ-রজ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফরাশেরা ঝাড়-লাণ্ঠান প্রভৃতি খুলিয়া গুদামে পুরিল, —বিকলাঙ্গগুলির কোন ব্যবস্থাই হইল না,— কখন হইবার আশাও নাই, কারণ তাহা বাতিল হওয়াই গৌরবাত্মক। সপ্তাহখানেক রোদবৃষ্টি হিমে পাকিবার পর দশভূতে টানাটানি করিয়া, সামিয়ানাখানায় লম্বা লম্বা ফালা দিয়া নামাইয়া সেই নহবৎখানার নিম্নতলেই সমাধি দিয়া আসিল।

গ্রামের লোকের ক্রিয়াকর্মে জমিদার বাড়ীর জিনিসপত্রই আসিত ; এ-সম্বন্ধে তাঁহাদের ঢালা হুকুম ছিল। মাস পাঁচছয় পরে একটা বিবাহ উপলক্ষে আবশ্যক হওয়ায়, গালিচা ও সামিয়ানার খোঁজ পড়িল। কবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার পর, (resurrection-এ) দেখা গেল, উভয়েরই প্রায় তৃতীয়াংশ উই-এর উদরস্থ হইয়াছে। তদুপরি ফালার লম্বা লম্বা দৌড় দেখিয়া, সামিয়ানাখানিকে ফাজিল গুদামে ফেলিবার হুকুম হইল। গালিচাখানির গর্ভে ঊনিশ অক্ষৌহিণী উই ; পদ-রজ ও উইমাটিতে মণদেড়েক্ ; আদমণটাক্ জঞ্জাল ; সর্বোপরি রাজজোটক— একটি আস্ত সচর্মক কুকুর-কঙ্কাল পাওয়া গেল।

মতি রায়ের যাত্রায় মুগ্ধ হইয়া কুকুরটি বোধ হয় গালিচার উপরই গা-ঢালিয়া দিয়াছিল। সেখানি গুটাইবার সময় কোন হাম্‌রাই রসিক একটা মস্ত মজা হিসাবে সেই ভীম-গালিচার কতকটা বোধ করি তাহার উপর চাপা দেয়, অন্যান্য রথীরাও সত্বর এই পুণ্যকার্যে যোগদান করিয়া নিজ নিজ অঞ্জলি দিয়া থাকিবেন। অসহায় নিরপরাধ জীবটি তাহার মধ্যেই জীবলীলা সমাপ্ত করিতে বাধ্য হয় ;—তাহার কাতর নিবেদন সেই ইরাণী-ব্যূহ ভেদ করিয়া বিজয়ী বীরগণের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অপর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।

এই বীভৎস দৃশ্য প্রকাশ হওয়ায় অশিক্ষিতে 'আহা'ও বলিল, 'ছি-

ছি'ও করিল। শুনিয়া একজন ভদ্রপণ্ডিত বলিলেন—'ভগবানের কার্যকলাপ মনুষ্যবুদ্ধির অনধিগম্য; হইতে পারে—পরস্ত্রী-হরণরূপ মহাপাতকের জন্য রাবণ কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। মহাভক্ত মতি রায় তাহা জানিতে পারিয়া রাবণ-বধের ছলে এই কুক্কুরটি বধের পথ করিয়া দিয়া রাবণের উদ্ধারোপায় করিয়া গিয়াছিলেন'—ইত্যাদি। যাহা হউক, পরিশেষে গালিচাখানি গো-শকটারোহণে যাত্রা করিয়া গঙ্গাগর্ভে সদ্‌গতিলাভ করে। মহতের সঙ্গে থাকায় কুক্কুরটিও যে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে হিন্দু মাত্রেরই সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারেনা।

শূন্যে প্রবল ঝঞ্ঝামুখে, মৃত্যুদোলায়, নাবিকদের পাল গুটাইবার পারিপাট্য, আর ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া আমাদের গালিচা গুটাইবার দুর্দশাটা আমাদের কর্তব্যনিষ্ঠার অনুমান সৌকর্যার্থে পাশাপাশিই দিলাম। এটা আমাদের অসীম ঔদাস্য, কি অযোগ্যতা ও অক্ষমতা, বা প্রকৃতির পরিচয় তাহা পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন।

যাহা হউক, এসব কথা সে-সময় মনে আসে নাই। বিপদটাও সারা বুকটা অধিকার করিয়া বসিবার সুযোগ পায় নাই; আমি কেবলই ভাবিতেছিলাম—'এরা নেবে এলে বাঁচি'। ইতিমধ্যে ঝড়বৃষ্টি এতই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ও সমুদ্র এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, চাটুয্যেকে সামলাইয়া লইয়া বোসজা ও মজুমদার নীচে চলিয়া গিয়াছেন। বিশেষ কোন উৎসব-রজনীর মত, বৈদ্যুতিক আলোগুলিকে উজ্জ্বলতর ও সংখ্যায় অধিক করা হইয়াছে।

চিফ্ সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের সহকারী যুবকদ্বয় হাঁটুর উপর পেন্টালুন গুটাইয়া খালি-পায়ে ছুটাছুটি করিতেছেন। ঝড় ও বৃষ্টির সমগ্র বেগটা তাঁহাদের শরীরের উপর দিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া এইরূপ জানাইল—কাপ্তেন সাহেব এতক্ষণ নিজেকে লোহার খুঁটির সহিত, চামড়ার বেল্ট্ দিয়া বাঁধিয়া এই ঝঞ্ঝার মধ্যে 'টাওয়ারে' দাঁড়াইয়া দূরবীণ কসিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে ড্রম-পাইপে মুখ দিয়া সহকারীদের কি বলিতেছিলেন। দূরবীক্ষণ আর কাজ করিল

না, সার্চ্ লাইটের অর্ডার দিয়া যে কোথায় গেলেন, দেখিতে পাইতেছি না। চিফ্‌সাহেবও দেখিতেছি মাস্তুলের উপর হইতে মাল্লাদের সত্বর কাজ সারিয়া নামিয়া আসিবার জন্য ঘন ঘন বলিতেছেন।

ঠিক এই সময় মাল্লারা আদ্‌মরার মত অবস্থায় নামিয়া আসিল ; চিফ্ সাহেব তাহাদের সঙ্গে লইয়া নীচে গেলেন। আমার বুকের উপর হইতে যেন একখানা পাথর সরিয়া গেল ; চমক্ ভাঙ্গিয়া পরমুহূর্তেই সমস্ত দৃশ্যটা আপাদমস্তক কাঁপাইয়া দিল, আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। সঙ্গীদের সান্নিধ্য পাইবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। লোকে বিপদের সময় আপনজন খোঁজে ; এই স্বজনহীন সুদূর সমুদ্রবক্ষে সঙ্গীরাই পরমাত্মীয়। লোকে যখন তখন বলিয়া থাকে, 'আমরা কি জলে প'ড়ে আছি?' হায় রে মানুষের দর্প! সেদিন আমরা যে কতখানি জলে পড়িয়াছিলাম, তাহা অন্যের অনুমানের বহু ঊর্ধ্বে। আমার নিজের স্মৃতিই আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

২২

তখন আর কাহারো ওঠা-নামার সাধ্য ছিল না ; বহুকষ্টে সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া নীচে নামিলাম, পঞ্চানন আমার আগেই নামিয়া গেল। সিঁড়ির নীচেই একজন নাবিককে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি রকম বুঝচো,—এটা গোলমেলে ঝড় নয় ত?' উত্তর পাইলাম,—'এই ত আসল টাইফুন্, চিন সমুদ্র ত এই দুষমনের জন্যেই মসুর ;এখানে টাইফুন্ হামেশাই লেগে আছে। জানের মায়া রেখে এ-সব দরিয়ায় আসা চলে না।' আমাকে পশ্চাতে না পাইয়া এই সময় পঞ্চানন ফিরিয়া আসিল।

সে ফিরিবার সময় দেখিয়াছিল,—আমাদের কথা হইতেছে ; তাই আসিয়াই বলিল—'কি আপদ, করেছেন কি? পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন ; এ যে সেই আপনার হংকং-এর কলম্বস!' লোকটা পঞ্চাননের কথা বুঝিতে পারে নাই ; আলো-আঁধারে লাগায় আমিও লোকটাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই। যাহা হউক, এবার মিঞা নিজেই বলিয়া চলিল,—'আমাদের কাপ্তেন সাহেব খুব পাকা লোক, এই 'ক্লাইভ'কে তিন-তিনবার সাংঘাতিক ঝড় থেকে বাঁচিয়েছেন, সে-সব ঝড়ের একটা আওয়াজেই লোক অজ্ঞান হয়ে যায়। 'ক্লাইভ' নিজেও খুব লক্ষ্মীমন্ত—ডুবতে জানে না ; তা না ত আজ ৪।৫ বছর আগে আরব-দরিয়ায় সে ঝড় থেকে বেঁচে এসেছে, সে এক আজব কথা। সে-দিনের কথা মনে হ'লে আজো বুকের পাঁজর কেঁপে উঠে।'

এই সময় একটা ঝাপ্‌টায়, রেলিং ধরিয়া কোন প্রকারে সামলাইয়া গেলাম, পঞ্চানন পড়িয়া গেল। সারেংজি থামিল না, বলিল—'ঝড়টা মামুলী রকমের হ'লে এ-সময় কাপ্তেন সাহেব গির্জাঘরে ঢুকতেন না, এটা আমরা বরাবরই লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি।' পুনরায় একটা গোঁ গোঁ শব্দে জাহাজকে মিনিট দুই একপেশে করিয়া রাখিল, আমরা কাঠ হইয়া রহিলাম ; জাহাজ সোজা হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস পড়িল! সারেংজি

গম্ভীরভাবে বলিল—'হুঁ, সেই জাতেরই বটে।' পঞ্চানন আমাকে আর দাঁড়াইতে দিল না, যাইতে যাইতে বলিল,—'যত দাঁড়াবেন, ও বুড়ো ততই অন্তরটিপুনী দেবে, ওর স্বভাবই ঐ। আমি ওর কথায় বিশ্বাস করি না ; সে-দিন ও-ই না বলেছিল—ঝড়ের সময় বন্দরে থাকাটাই বেশী বিপজ্জনক! বেটা জাহাজী দুর্বাসা!' ভয় পাইলেও পঞ্চানন তখন তার ভাষা বদলায় নাই।

আত্মীয়ের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে যেমন তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দালানে বা রোয়াকে আনা এবং সকলে বিমর্ষমুখে ঘিরিয়া বসাটাই নির্বাণ-পর্বের প্রথম চ্যাপ্‌টার, নীচে আসিয়া দেখি, আমার সঙ্গীরা চাটুয্যেকে ঘিরিয়া কেবিনের বাইরে সেইভাবে জমায়েত্! আমরা উপস্থিত হইতেই, সকলে যেন একটু সাহস পাইলেন ;আমিও দল পাইয়া বল পাইলাম। বোসজা বলিলেন,—'খুব যাহোক্ চাটুয্যেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে কোথায় ছিলেন বলুন দিকি? এখন নিন আপনার Charge,—কেঁদেই অস্থির, বলে—আমার যে পাঁচটি মেয়ে! হরিপদ সবার ছোট, সেও স্থির রয়েছে। বিপদ ত অস্বীকার করবার যো নেই, কিন্তু কেঁদে কি করব।'

আমার অপেক্ষা ভীতুলোক এক চাটুয্যে ছাড়া জাহাজে আর কেহ ছিল কি না জানি না। লোকের অন্তরের কথা অনুমান করিবার স্পর্ধা আমার নাই ;হইতে পারে চাটুয্যেও আমার চেয়ে সাহসী Strong nerve-এর লোক। যাহা হউক, অবস্থাটা অনুমান করিয়া লইয়া বোসজাকে বলিলাম,—'বিপদ. কে বল্লে? ঝড়জল ত সমুদ্রে লেগে থাকবারই কথা, চিরকাল লেগেও আছে,—সেটাকে বিপদ বলে বোঝা নিজের নিজের দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মন তাকে যতবড় ইচ্ছে ভাব্‌তে পারে, আবার কিছুই নয় বলে অগ্রাহ্যও করতে পারে। সমুদ্রের চরম বিপদ ত কেবল একটা, ডাঙ্গায় যে আমরা সহস্র বিপদের মধ্যে বাস কোরে থাকি! সেগুলো ভাবি না বলে কি বিপদ নয়? ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, বাড়ীচাপা, প্লেগ, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, দস্যু, সাপ, বাঘ, ভালুক, চোর, ডাকাত, বরের বাপ—

ইত্যাদি ইত্যাদি কোন্‌টা বিপদ নয়! যাক্—আমিও খুব ভয় পেয়েছিলুম, কাপ্তেন সাহেবকে না জিজ্ঞাসা করে স্থির হ'তে পারছিলুম না, তাই তাঁর অপেক্ষা কোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।' আমার প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে বল্লেন—'ভয়ের কথা তোমাকে কে বল্লে? এসব ঝড় কেবল খানিকক্ষণ জ্বালাতন কোরে চ'লে যায় ;—যাও, এক পেগ্ হুইস্কী, না হয় এক কাপ চা খেয়ে শুয়ে থাক্‌গে।' এই বলে চলে গেলেন ; আমি তাঁর সহাস্য ভাব দেখে আর সহজ কথা শুনে নিজেকে যেন ফিরে পেলুম। আমার বক্তৃতাটা সকলকেই একটু সজীব করিয়া দিল।

ভাবিলাম হায়রে 'মিথ্যা কথা' তুমি না থাকিলে সংসার, সমাজ, এমন কি শাসনযন্ত্র অচল হইত ;—কিন্তু শেষরক্ষার তুমি কেহ নও। চাটুয্যে কাতরকণ্ঠে বলিল—'তা হলে কোন ভয় নেই বাঁড়ুয্যে মশাই?' আমি বলিলাম—'কাপ্তেনের চেয়ে আর এ-সব বিষয় কে বেশী বোঝে।' যখন এই সব কথা হইতেছিল, তখন বাহিরের গোঁ গোঁ শব্দে আমার নিজেরই প্রাণটা বুকের মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দে ছুটাছুটি করিয়া নিরাপদ স্থান খুঁজিতেছিল।

কাপড় জামা সবই ভিজিয়া গিয়াছিল, পরিবর্তন করিতে গেলাম, পঞ্চাননও সঙ্গে আসিল। সে এত ভিজিয়াছিল যেন অবগাহন করিয়া আসিয়াছে, ভয়ে বা ঠাণ্ডায় কাঁপিতেছিল। সে বলিল—'ওঁদের ত যা হয় বুঝিয়ে এলেন, কিন্তু ও-কথায় আমার প্রাণ ত বুঝবে না।' আমি বলিলাম—'আমারি কি বুঝেছে পঞ্চানন? তা ছাড়াও, ও বোঝায় ফল কি? প্রাণ যে সত্যটা প্রতিপলেই অনুভব করচে। সেবার সারেংজিই সার কথাটা শুনিয়েছিল—'খোদা মালিক।' এই প্রলয়ের মুখে, এই কূলহীন, বিপুল সমুদ্রে, একমাত্র সেই অসহায়ের সহায়, সদাজাগ্রত ভগবানেই ভরসা। এ-সময়ে কোন নেল্‌সনই হালে পানি পান না।'

পঞ্চানন একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'এমন জানলে কল্‌কেতায় কুলপীর বরফ বেচতুম, না হয় চায়ের দোকান খুলতুম ; কি ভুলই করেচি!' বুঝিলাম, এতক্ষণে পঞ্চানন পেছিয়েছে, কিন্তু ভাষা বদলায়নি। বলিলাম—'ভয় কিহে, সত্যই কি এতগুলো লোকের ভাগ্য এক কলমে লেখা! সেখানে আজ ফাউন্টেন্‌পেন্ পৌঁছয়নি ;—ও-সব ভাবতে নেই,

চল।' চলিব কি, জাহাজ তখন মত্ত মাতঙ্গের চাল ধরিয়াছে, শব্দে প্রাণ স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে ; প্রভঞ্জনও মধ্যে মধ্যে ভীষণ হুঙ্কারে জাহাজকে উৎক্ষিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সেই দু'এক মিনিট সকলকে তটস্থ করিয়া রাখিতেছে ; সকলেই 'অটোমেটিকেলি' কলের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। সে সময়টা কাহারো নিশ্বাস পড়িতেছে না!

এই অবস্থায় ২।৩ জন লোক 'Cooper' যন্ত্রাদি লইয়া আসিয়া জাহাজের গবাক্ষগুলি আরোহীরা কেহ না খুলিতে পারে এমন ভাবে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। আবার তাহাদের উপরে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ির পথ বা ফাঁক, উপরের ডেকের মেঝের সঙ্গে এক হইয়া বন্ধ হইয়া গেল! অর্থাৎ আমাদের বেশ মোড়স্বা করিয়া (Hermetically sealed) মোড়া হইল। কোন ছিদ্রান্বেষীয় জন্য আর অবকাশ মাত্র রহিল না, কেবল উপর হইতে নিম্নতল পর্যন্ত প্রলম্ব বায়ুনালি (Ventilator) গুলির কণ্ঠরোধ করা হইল না ; আলোটাকেও কালো করা হইল না। আমরা বাঁধা-রোশনায়ের মধ্যে বন্ধ হইলেও যেন ফাঁসীর আসামীর মত বোধ করিতে লাগিলাম।

আলিবাবার গল্পের গুহায় একটা 'Open Sesame' বলিয়া উপায় ছিল, এখানে শত 'সিসেমেও' সাড়া পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। এইবার প্রকৃতই একটা ভীতির সুস্পষ্ট ছায়া সকলের মুখেই দেখা দিল ; সকল সম্প্রদায় মধ্যেই হৈ চৈ পড়িয়া গেল, পড়িবারই কথা। স্বাধীন ভাবটা আমাদের বহুদিন হইতেই অসাড় ও অর্থহীন, তথাপি এই বন্ধন দশায় প্রাণটা একটু ফাঁক পাইবার জন্য আঁকু-পাঁকু করিতে লাগিল। কিন্তু ইউফ্রেটিসের এপারের জন্ম-পাট্টাধারী ইউরেসিয়ানরা অনেকেই পুরো স্বাধীনতার স্বাদ না জানিয়াও, ফ্রিডমের্ ফয়তা দিতে Forward (তৎপর ; তাঁহাদের এই বন্দী অবস্থার অপমান অসহ্য হইয়া উঠিল এবং অভিমানটা অনবরত আঘাত করিয়া তাঁহাদের উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আমার পরিচিত মিস্টারটি রাগে মেটে-সিঁদুর হইয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন—I must walk up with impunity (কার সাধ্য রোধে মোর গতি) ; কিন্তু অগ্রসর হইয়া সিঁড়ি আর খুঁজিয়া পান না ; তাহা উপরের ছাদের সহিত

শয়ান অবস্থায় সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং দুই চারিবার হাঁক্-ডাক্ করিয়া গালিবর্ষণ করিতে করিতে ও শাসাইতে শাসাইতে ফিরিলেন।

উঃ, প্রাণটা কি প্রিয় বস্তু, এবং আসন্ন অপঘাত মৃত্যুর অপেক্ষা করাটা কি ভীষণ! চাটুয্যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিল,—'বাঁড়ুয্যে মশাই, সব বন্ধ ক'রে দিলে কেন?' উঃ, সে কি কাতর দৃষ্টি! তাহা যেন আমার বক্ষ ভেদ করিয়া মর্মে গিয়া আশ্রয় খুঁজিল।

আমি তখন নিজে যে কোথায় তাহা জানি না,—কিন্তু সে-দৃষ্টি আমাকে মুহূর্তের জন্য টানিয়া আনিল ; বোধ হয় বলিলাম—'বন্ধ করাই ত উচিত, তানা ত এতক্ষণ জলে যে জাহাজ ভরে যেত। এ-সময় অপার ডেকের উপরেও এক একটা ঢেউ উঠে পড়ে, উপরে গেলে হঠাৎ ভাসিয়ে নে' যেতে পারে;' ইত্যাদি কি যে বলিয়াছিলাম নিজের কান তাহা শোনে নাই। সকলেরি তখন এক অবস্থা ; বড় বাবু বলিলেন—'সুবিধে পেলে একটা (Sleeping draught) নিদ্রাকর্ষক ঔষধ খেয়ে ফেলি, না হয় Morphia injection নি।'

এখন রাত্রি বোধ হয় দশটা, ঝড়েরও রুদ্রাবস্থা। এই সময় হঠাৎ 'Sir-John-Lawrence' জাহাজের কথা আমার মাথায় ঢুকিয়া বসিল। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে উক্ত 'সার-জন্-লরেন্সের' আট শত আরোহী এইরূপ বদ্ধাবস্থায় বঙ্গোপসাগরতলে অন্তিম-শয্যা লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই বিপদের সময়, আমার মাথার মধ্যে কবি-সুলভ কল্পনাস্রোত বিদ্যুদ্বেগে সেই আটশত নরনারীর অসহায় অবস্থা—চাঞ্চল্য, কম্পন, ক্রন্দনরোল, ছুটাছুটি, জননী-অঙ্কে শিশু, কণ্ঠ-সংলগ্ন স্বামী-স্ত্রী, প্রভৃতি নিদারুণ চিত্র সকল (Panorama-র মত) প্রকট করিতে লাগিল। সর্বশরীর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিছু পূর্বে পঞ্চাননকে বলিয়াছিলাম—'সকলের ভাগ্যই কি ভগবান এক কলমে লিখেছেন!' এরি মধ্যেই 'Sir-John-Lawrence' বিকট পরিহাস করিয়া গেল!

ফলোয়ারদের দৃশ্য অন্যরূপ। দেখি তাহাদের কেহ বমন করিতেছে, একজন ব্রাহ্মণ 'আরে রামজি বাঁচাও' বলিয়া বালকের মত কাঁদিতেছে। আবদুল্লা এক ছিলিম তয়েরি গাঁজা লইয়া তাহাকে বলিতেছে—'লেঃ—

পি-লে, ক্যা তুহি একেলা মরেগা? আল্লা মালিক ;—লেঃ, খিঁচ্‌কে পি-লে।' সকলেই জড়সড় ; তবু তাহাদের মণ্ডলী মধ্যে তিন-চার ছিলিম গাঁজা, মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! তাহাদের লোটা বালতি লইয়া জাহাজ যেন ভাঁটা খেলিতেছে ; rolling-এর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি জাহাজের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে সশব্দে যাতায়াত করিতেছে। প্রথম প্রথম সকলেই তাহাদের ধরিবার ও সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল ; বাড়াবাড়ি আরম্ভ হওয়ায়—'যাঃ শরৌ,—জান্ বচে তো দেখা জায়গা' বলিয়া তাহাদের ছাড়িয়া নিজেরা গাঁজা লইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে বোধ হইতে লাগিল,—এই অসম সমরে, জাহাজ আর যেন যুঝিতে পারিতেছে না,—জখম হইয়া পড়িয়াছে। মহিষাসুর বধের সময় মহামায়া যেমন—'তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ় যাবন্মধু পিবাম্যহম্' বলিয়া ক্ষণকাল বিরত ছিলেন, প্রভঞ্জনও সেইরূপ শাসাইয়া, যেন এক একবার সরিয়া যায়, পরে দ্বিগুণ বেশে আসিয়া আক্রমণ করে।

এ সময়টুকু জাহাজ থর্‌থর্ করিয়া সুস্পষ্টই কাঁপিতে থাকে। আমাদেরও ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ হইতে ক্রমশঃ বক্ষ কম্পন আরম্ভ হইয়াছিল, এখন সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। হস্ত-পদ অধর-ওষ্ঠ শীতল, কপাল স্বেদ-সিক্ত, বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারো মুখে কথা ত ছিলই না ; কেহ কহিলেও তাহা জড়তাপূর্ণ, কানেও পৌঁছায় না। মৃত্যুর ছায়া ভিন্ন চক্ষের সম্মুখে তখন কিছুই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছিল না। সে ছায়া নীলাভ, হইতে পীতাভ, পরেই ধূম্র, এইভাবে আসে-যায় এইটাই আমাদের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ ছিল।

নানা নামে ভগবানকে সকলেই ডাকিতেছিলাম, শরণ লইবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ মন ভয়ের কাছেই বন্দী ছিল। বোধ হয় ডাকিতে ডাকিতে না কাঁদিলে একাগ্রতা আসেনা সমর্পণও সম্পূর্ণ হয় না। সকলেই কাঁদিলাম, বুঝিয়া নয়,—ভয়ে, প্রাণের জন্য ; তবে তাঁহার নাম করিয়া ও তাঁহার নিকট বটে। তাহাই যথেষ্ট হইল! যাহার কিছুরই অভাব নাই, যিনি স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্যপতি ত্রিভুবনেশ, তাঁহাকে মানুষ আবার কি দিবে? কিন্তু যিনি পূর্ণ, তাঁহাতে 'চাওয়াটা'ও থাকা চাই, নচেৎ তাঁহাতে অভাব

থাকিয়া যায়। সেইটুকু পূরণের জন্যই বোধ হয় এই অশ্রুটুকুই তিনি চান। কিন্তু এ অশ্রু মেলা বড় কঠিন, তাই তাঁহাকে এত অল্পেই তুষ্ট হইতে হয়, (Beggars have no choice) ভিক্ষুকের ভালমন্দ বা কম বেশী বলিবার অধিকার নাই।

হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত হাসির শব্দ সকলকে সেইদিকে আকৃষ্ট করিল। চাহিয়া দেখি,—ইউরেসিয়ান দলের একজন উদ্ভট নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত হাস্য ;—বাহিরে যেমন উন্মত্ত ঊর্মি, তাহারও তেমনি উন্মাদ নৃত্য! পড়িতেছে, উঠিতেছে, কিন্তু কামাই নাই,— সুর বজায় আছে। আবার গাহিতে গাহিতে নানা ভঙ্গীতে সঙ্গীদের মুখের কাছে হাত নাড়িতে নাড়িতে যেন আরতি করিতেছে।

সঙ্গীরা যতই রুষ্ট হইতেছে ও বিরক্ত হইয়া পিছাইতেছে, সে ততই তাহাদের ঘিরিতেছে—ততই উৎসাহে সুর চড়াইতেছে। ঘন ঘন আছাড় খাইতেছে, কিন্তু তাহার আনন্দের বিরাম নাই। কখন পোল্কা, কখন ওয়াল্ট্‌জ্—অর্থাৎ সবটাই ওলট পালট! ভাবিয়াছিলাম 'হিস্টিরিয়া' (Hysteria) ; কিন্তু বেহুঁশ্ নয়, গানের অর্থেই সেটা ধরা পড়ে। ভাবটা এইরূপ ঃ—

কেঁদনা আমার শিষ্টু ছেলে,—
খাও টানো মজা করে নাও,
কি লাভ আর ট্রঙ্কে রেখে,
বোতলটা বার করে দাও।
হাঙ্গরে তার স্বাদ বোঝে না,
বা বোঝে তা মাছে,
সদ্ব্যবহার করে' ফ্যালো—
যরি যা পুঁজি আছে।
যেতেই যখন হবে দেখচি,
করতে নেই তার অপমান,
খাঁটি মাল্‌টা পেটে পুরে
লোনা জলের কমাও স্থান!

এই বাদামী রংয়ের যুবা ইউরেসিয়ানটিকে নিত্যই দেখিতাম, এটি একটি সিলোনী ক্রিস্টান ; সঙ্গীরা ইহাকে মিস্টার সিঙ্গালী (সিংহলী) বলিয়া ডাকিত। দুর্বল্ ফ্যাকাশে রুগ্ন বলিয়াই মনে হইত। তাহাকে লইয়া দলের সকলেই রহস্য করিত, সে নিজেও রঙ্গ-রহস্য লইয়া থাকিতে ভালবাসিত।

ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে এমন কথাও হইয়াছে, 'ওটি ওদের দলের পঞ্চানন'। আজ তাহার বেপরোয়া ভাব দেখিয়া, ও Strong nerve-এর পরিচয় পাইয়া, অবাক হইয়া গেলাম। যে-ঝড়ের এক ঝাপ্‌টায় বেহুঁশ মাতালের নেশা ছুটিয়া যায়, সেই ঝড়ের প্রচণ্ডতাই যেন ইহাকে উৎসাহ জোগাইতেছিল! এই অবরুদ্ধ মরণ-মন্দিরে আসন্ন অপঘাতের মুখে, তাহার এই আনন্দাভিনয়, অন্যূন অর্ধঘণ্টাকাল, আমাদের আকৃষ্ট ও অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল।

ইতিমধ্যে প্রভঞ্জনের সেই প্রচণ্ড তাড়না ও ভৈরব হুঙ্কার যে কোন্ ঐন্দ্রজালিকের ইঙ্গিতে কখন কমিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারি নাই, কেবল সমুদ্রের আস্ফালন ও ভীম জলকল্লোল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে! জাহাজ এখন যেন হাঁপাইতেছে আর সামলাইতেছে।

রাত্রি দুইটা আন্দাজ অনেকটা সাম্যভাব আসিল। অত বড় প্রলয়-তাণ্ডবের পর সকলে সহজেই সেটা লক্ষ্য করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইল ; দু'একটা কথা ফুটিল,—ভগবান রক্ষা করিলেন। ঐ যে মিস্টার সিঙ্গালীর অভিনয়, আমার আজিও দৃঢ় বিশ্বাস—সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের ত্রাসিত মুমূর্ষু চিত্তকে তদ্দ্বারা সত্বর ভাবান্তরে আকৃষ্ট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ; নচেৎ একটা বিষম অনর্থপাত হইত, এবং আমরা ঠিক তাহার পূর্বমুহূর্তে উপস্থিতও হইয়াছিলাম। মান্দ্রাজীদের মধ্যে একজন অজ্ঞান হইয়া যায় ; আমাদের চাটুয্যের ফিটের মত হয়।

২৩

আমাদের গোয়ানিজ্ স্টুয়ার্ডটি বড় ভদ্রলোক ছিলেন ; ঝড় থামিতেই আসিয়া বলিলেন—'আজ সব কি খাবেন, রান্নার ত সুবিধা হয় নাই।' আমরা বলিলাম—'যা ধাক্কা খেয়েছি আজ আর কিছুরই আবশ্যক নেই।' তিনি হাসিয়া বলিলেন—'এ ধাক্কা অনুমান কাল রাত্রে থামতো ; মনে করবেন না ঝড় থেমেছে। কাপ্তেন সাহেব প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা জাহাজকে পিছু হাঁটিয়ে Safe water-এ (নিরাপদ জলে) এনে ফেলেছেন। তিনি বলছিলেন—তাঁর ধারণা ছিল, স্থির সমুদ্র পেতে রাত তিনটে বেজে যাবে, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই এত সত্বর পাওয়া গেছে। ঝড়টা বাঁকা গোছেরই ছিল।

যাক্ তাকে ত এড়ানো গেছে, এখন দু'চার স্লাইস্ (টুকরা) রুটী কি খান-কতক বিস্কুট আর এক কাপ্ করে চা খেয়ে শুয়ে পড়ুন। নিশ্চয়ই শরীর-মন দুইই অবসন্ন হ'য়ে থাকবে, এক বোতল ক'রে বীয়ারেও (Beer) খুব উপকার পাবেন,—নিদ্রাও ভাল হবে, কি বলেন?' আমরা এক কাপের স্থলে দু'কাপ করে চা'টাই চাইলুম। রাত্রে এক বোতল করিয়া বীয়ার আমাদের প্রত্যেকের প্রাপ্যের মধ্যেই ছিল,—পরিবর্তে সোডা। বীয়ারটাই লইতাম, তাহাতে বহু উপকার ছিল ;—ম্যাথর ও ফলোয়াররা তাহার জন্য ও তাহার প্রত্যাশায় বিশেষ বাধ্য ছিল, অনেক কাজ পাইতাম।

সকলেই আধ-মরা হইয়া পড়িয়াছিলাম, চা-পানান্তে সত্যই যেন শরীরটা ফিরিয়া পাইলাম। রাত্রি সাড়ে তিনটা আন্দাজ সকলে শয্যা লইলাম। ঘটনাগুলো তখনো মাথায় ঘুরিতেছিল, কিছুতেই নিদ্রা আর আসে না। সারেংজির সেই 'খোদা মালিক' কথাটাই বারবার স্মরণ হইতে লাগিল, ঐ সঙ্গে তাহার সেই সার্থক উক্তি 'ক্লাইভ' খুব লক্ষ্মীমন্ত 'ডুবতে জানে না' মনে পড়িল। 'ক্লাইভ যে লক্ষ্মীমন্ত—ডুবতে জানে না'—সেটা

আমাদের কাছে নূতন কথা নয় ; কিন্তু দুই শতাব্দী পরে, লৌহ-পরিচ্ছেদে কাষ্ঠের ক্লাইভ যে আজ এতটা মেহেরবানী করিবেন তাহা ভাবিতে পারি নাই ; কারণ অনেকেই নিজে ডুবিতে জানে না,—কিন্তু ডোবাতে মজবুৎ। তাহার পর মনে হইল স্টুয়ার্ড্ বলিতেছিলেন. জাহাজ ৭। ৮ ঘণ্টা পাছু হাঁটিয়া জান্ বাঁচাইয়াছে ;—এটা আমরা বদ্ধাবস্থায় বুঝিতেই পারি নাই। সে বিশাল বারিবেষ্টনের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ বুঝিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা ; সেখানে এগুলেও যা, পেছুলেও তাই। জমি নাই,—আছে কেবল জল আর জাহাজ!

নস্য লইবার জন্য উঠিলাম। পঞ্চানন বলিল—'আমারো ঘুম হচ্চেনা মশাই ; পুনর্জন্মের পর যেন কেমন ভোম্‌লা মেরে গিছি! চাকরীতে নমস্কার মশাই ; ডাঙ্গা দিয়ে পথ থাকে ত পায়ে পায়ে ফিরি!' আমি বলিলাম—'এ রকম ঝড় ত নিত্য লেগে নেই, আমাদের পৌঁছুতে আর ৪। ৫টা দিন,—কোন রকমে কেটেই যাবে!'

পঞ্চানন পুনরায় বলিল—'এদিকে যে চারমিনিটে চৌঘুড়ি মাৎ হয়ে যায় মশাই! কি ভুলই করেছি, এ-পথে যে আবার ফিরতে পারি এমন ত বোধ হয় না।' আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—'যত সাবধানই হই আর যে পথেই যাই, মানুষ ভগবানকে ঠকাতে পারে না ; ভয় কি! তাঁর জিনিস তিনিই আগ্‌লাবেন, যাঁর মাল তিনিই সাম্‌লাবেন ; এখন ঘুমিয়ে পড়—কাল আর্ এ ভাব থাক্‌বেনা।' সে আর কথা না কহিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, আর সাড়া-শব্দ পাইলাম না। আমার একই অবস্থা পাঁচটা পর্যন্ত চলিয়াছিল ; যখন উঠিলাম তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে, মজুমদার ভায়া তখনো নিদ্রিত।

উপরে গিয়া দেখি, সবই পূর্ব্ববৎ মামুলিভাবেই চলিয়াছে ; বেশীর মধ্যে মাঝে মাঝে এক একবার horrible, terrible, awful ; কোথাও ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভৈরব প্রভৃতি শব্দ কানে আসিতেছে মাত্র। অভিধান তাহার অধিক আয়োজন রাখেন না। স্নানাহারের পর সেটাও থামিয়া গেল, অনেকেই শয্যা লইল।

চাটুয্যে ও পঞ্চানন কিন্তু তখনো অন্যমনস্ক। আমরা পাকা খাতায়

নাম-লেখানো নকোর, আমাদের আড়াই পা অন্তর, বিভীষিকাগুলা ভুলিয়া যাওয়াই আদত (অভ্যাস), কারণ উপায়ান্তর নাই। বাল্যকালে ভূতের ভয়টাই জানিতাম ; বয়সে সাপের ভয়ে বাঘের ভয়ে সাবধান হইতে শিখাইয়াছে ; কিন্তু সংসারে অনটন ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেখানে আশ্রয় লইয়াছি সে-ই যথার্থ ভয় (dread) কাহাকে বলে তাহা শিখাইয়াছে,—ভয়ের প্রকট মূর্তি সেইখানেই দেখিয়াছি। তাহাতে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়াছে কোন ভয়ই এত ভয়ঙ্কর নয়,—বোধ করি মৃত্যু-ভয়ও নয়। লোকবিশেষে ও প্রবৃত্তি বিশেষে—চাকুরী অপেক্ষা বড়ও কিছু নাই, ওর চেয়ে ভয়েরও কিছু নাই, ছোট কাজও কিছু নাই,—ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের এই জাহাজী জীবন-সঙ্কটটার দশ বৎসর পরে সুবিখ্যাত 'White Star Line' কোম্পানীর অভিনব সৃষ্টি, একাধারে দুর্গ ও প্রাসাদ,—সুদৃঢ়, দুর্ভেদ্য বিপুলকায়, অদ্বিতীয় ও অমর আখ্যাপ্রাপ্ত, স্বনামখ্যাত Titanic (টাইটানিক) জাহাজ, প্রায় তিনকোটি টাকায় তৈয়ার হইয়া, বিপুল সোর্-সমারোহে সমুদ্রবক্ষ আলোকিত করিয়া ভাসে, এবং সাউদাম্‌টন্ বন্দর হইতে নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করে।

জগতের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ ও মাতব্বরেরা সার্টিফিকেট্ দিলেন,—ইহা জলে ডুবিবে না, আগুনে পুড়িবে না, অর্থাৎ বৃত্রাসুর বা হিরণ্যকশিপুর একজন! সপ্তম দিবসের রাত্রে, এই তার প্রথম সফরেই,—পাষাণ নয়, তুষার-শৈলের সংঘর্ষে পড়িয়া অতগুলি বিশেষণের বোঝা আর ২১৯৬টি নরনারী লইয়া, তিন ঘণ্টার ভিতরেই আট্‌লান্টিক মহাসাগর মধ্যে আত্মসমর্পণ করে। মানুষের গর্বের মূল্য এই! শুনিতে পাই যখন আর প্রাণরক্ষার কোন পথই ছিল না তখন কেহ কেহ নিজেকে নিজেই গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। এটার অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু, বাকি সব নাকি নিরুদ্বেগে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন,—এটা বোঝা কঠিন। আবার কাপ্তেন স্মিথ্ শেষ মুহূর্তে সকলের সহিত অপার ডেকে দাঁড়াইয়া ব্যান্ডের সুরে সুর মিলাইয়া 'Nearer to Thee O God' গাহিতে গাহিতে একত্রেই নাকি ইহ জগতের শেষ অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহা

যেমনি করুণ, তেমনি বীরোচিত ও দু'শো বাহবার জিনিস।

দশ বৎসর পরে ভাবিয়া দেখিলাম, ওরূপ স্থলে processটা (পদ্ধতিটা) এক না হইলেও আমাদেরও শেষ ফলটা সমানই দাঁড়াইত,—অর্থাৎ—মরা। অবশ্য process-এর জন্য কিছু নম্বর কাটা যাইত বটে। কারণ ব্যান্ডও ভাল লাগিত না, বিদ্রূপের মত বোধ হইত। ভূপালী ভাঁজিতেও পারিতাম না, স্বর বন্ধ হইয়া যাইত। যাহা হউক, সে-সময় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের প্রধানতম চিত্রশিল্পী যিনি কল্পনাকে যথাসম্ভব রূপ দেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর C. I. F. মহাশয় 'প্রবাসী'তে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই ঢেরাসই রহিল।

বৈকালিক চায়ের মজ্‌লিসে বোঝা গেল, সকলের ঝড়ের ঝোঁক্ কাটিয়া গিয়াছে—স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে—সকলেই পূর্ব্ববৎ কথাবার্তায় ও হাস্যপরিহাসে যোগ দিয়াছে।

মজুমদার-ভায়া কি কারণে নীচে গিয়াছিল, উপরে আসিয়াই বলিল—হরিপদর এমন গলা, তা'ত জানতাম না! নীচে এমন গান লাগিয়েছে—লোক জমা হয়ে গেছে ; —দেখছি—এদের দু'টিকে (পঞ্চানন ও হরিপদকে) পেয়ে রত্নলাভ করা গেছে।'

আমাদের বড়বাবু (বোসজা) বড়-জোর তিন চার বৎসর হইবে—চল্লিশ পার হইয়া থাকিবেন,—সুতরাং সকল সখই বর্তমান,—আবার নিজে গাইয়ে। 'তবে চল হে একটু শুনে আসা যাক্,'—বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন ;—আমরা ত প্রস্তুতই ছিলাম। কেবল আমাদের প্রোজেইক্-প্রবর দত্তজা উঠিল না।

মজুমদার বলিল,—'সিঁড়ির নীচে থেকেই শুনতে হবে,—হরিপদ আমাদের দেখতে পেলেই থেমে যাবে।' তাহাই করা হইল,—উঁকি মারিয়া দেখি—মজ্‌লিস্ বটে! প্রায় পঞ্চাশজন উপস্থিত,—মধ্যস্থলে হরিপদ, পঞ্চানন ও চাটুয্যে ; আর সকলে তাহাদের ঘিরিয়া বসিয়াছে। আবদুল্লা সহাস্যবদনে ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া সারেঙ্গী বাজাইতেছে ; খুব মৃদু ঠেকাও চলিয়াছে। গত রজনীর ঝড়ের উপযুক্ত retort (পাল্‌টা জবাব) বটে। গান এমন জমিয়াছে যে, কাহারও মুখে টুঁ-শব্দটি নাই।

ধাতুময়-বস্তু-বহুল জাহাজের মধ্যে,—হরিপদর সুকণ্ঠে,—ভানুসিংহের—'কো তুঁহু বোলবি মোয়্' ;—এমন সুমধুর লাগিল যে, আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ফলোয়ার্‌দের সঙ্গে বসিয়া এরূপভাবে ভদ্র সন্তানের গান গাওয়াটা যে কতটা অভব্য ও অশোভন, তাহা ভাবিবার অবকাশই রহিল না।

কিছুক্ষণ পরে 'বাঃ বাঃ, বাহবা বাহবা. আর—ওহো ওহো'-র মধ্যে সঙ্গীত শেষ হইল। গীতটির সুন্দর ভাব ও ভাষা, সকল শ্রেণীর শ্রোতারই সম্যক উপলব্ধি হওয়ায় উপভোগে কাহারও বাধে নাই। 'আহারের সময় সন্নিকট,—বড় বাবু এখনি নীচে আসিবেন,'—এই বলিয়া হরিপদ নীরব হইল। সকলেই অনিচ্ছায় উঠিল ও তারিফ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিল। আবদুল্লা জোর্-সেলাম ঠুকিয়া—'আচ্ছা বাবু চিন পহুঁছকে ছোড়েঙ্গে নেহি,' বলিয়া গেল।

আমরা সিঁড়িতে উঠিতেছি, পশ্চাৎ হইতে পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'এই-যে আপনারাও এসেছিলেন দেখচি! ফার্স না দেখে ফিরবেন না,—চাটুয্যেকে অনেক ক'রে গাইতে রাজি করেছি। হরিপদ না গাইলে সে গাইবে না, তাই হরিপদকে গাইতে হ'ল। গানটা হিন্দি-ঘেঁশা ব'লে ভিড় হয়ে পড়েছিল। যা হ'ক তাদের তাড়ানো গেছে, এইবার চাটুয্যের পালা। আপনাদের কিন্তু শুনতেই হবে, আমি চল্লুম, একটু গা-ঢাকা থাকবেন।' এই বলিয়া পঞ্চানন দ্রুত চলিয়া গেল। এ ব্যাপারটা শুধু শুনিবার নয়—-দেখিবারও জিনিস ; তাই আমরা যতটা সম্ভব অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলাম।

পঞ্চাননের অনেক সাধ্য-সাধনায় এবং হরিপদ যখন স্মরণ করাইয়া দিল—-'এই বড় গঙ্গার উপর কথাটা স্বীকার করেছেন,—একটা যা হয় গেয়ে সেরে দিন,—চাটুয্যে মহাসঙ্কটে পড়িল। পঞ্চানন পুনরায় বলিল—'উনি একটা ঠাকরুণ-বিষয় গাইবেন বলেচেন।' রেহাই কোন প্রকারেই নাই দেখিয়া চাটুয্যে তখন কয়েকবার কাসিয়া—'কার সাধ্য' হুঁ 'কার্ সাধ্য', দু' চার বার বলিতেই, পঞ্চানন বলিল—'ও কি কথা। কার্ সাধ্য আবার কি! যখন বলেচেন,—একটা গাইতেই হবে। আপনার কথায়

হরিপদ আধঘণ্টা কষ্ট ক'রেচে ;—এখন 'কার্ সাধ্য'—কি রকম কথা?' চাটুয্যে বলিল—'কলকেতার ম্যাড়া কিনা,—গান বোঝ না কথা কও ;—আমি ত গান আরম্ভই করে দিচি' এই বলিয়া পুনরায়—'কার্ সাধ্য' হুঁ—'কার্ সাধ্য ও মা' হুঁ 'কার্ সাধ্য ও মা সীতে' হুঁ—'তব রন্ধন দূষিতে' হুঁ—হুঁ' ইত্যাদি।

পূর্বেই বলিয়াছি চাটুয্যে একটু লাজুক—মেয়েলি ভাবাপন্ন মানুষ ; তাহার সহিত কাসি ঘড়্ঘড়ানি ও হরদম্ হুঁ মিশিয়া, একদম্ চমৎকার চচ্চড়ি দাঁড়াইয়া গেল। পঞ্চানন উৎসাহ দিবার জন্য প্রথম দু'চার বার 'বাঃ বেশ্' বলিয়াছিল,—শেষ থামাইতে পারিলে বাঁচে,—বিশেষ করিয়া নিজের হাসিটা। সেটা যেরূপ রুকিয়া আসিতেছিল, তাহাকে না রুধিলে, একটা রপ্চারের সম্ভাবনা। তাই নিজেকে সামলাইবার জন্য পঞ্চানন উত্তেজিতভাবে বলিল—'এই বুঝি আপনার ঠাকরুণ-বিষয়?' চাটুয্যেও খুব উত্তেজিত হইয়া বলিল—'আইরিটোলার আহাম্মুক কিনা, বোঝ না আবার গান শুন্তে চাও! এর চেয়ে একটা খাঁটি ঠাকরুণ-বিষয় শোনাতে পার ত নাক্ কেটে ফেলে দেব। দাশুরায় রন্ধনের কথাটি পর্যন্ত খুলেই ব'লে দিয়েছেন,—যাতে মুখ্খুতেও বুঝতে পারে।' পঞ্চানন বলিল—'রন্ধনের কথা বলেচেন ত কি হয়েছে! তা' হলেই বুঝি ঠাকরুণ-বিষয় হ'ল?' চাটুয্যে এইবার রাগ করিয়াই বলিল—'ঠাকরুণদের কাজটা তবে কি শুনি? লোকে তাদের কি করতে রাখে? কলকেতার মুখ্খু কিনা—সকল কথাতেই ঠোকর্ মারতে আসেন!'

ঠাকরুণ-বিষয়ের এই গভীর গূঢ়তত্ত্বের মধ্যে আমরা কেহই ঢুকিতে পারি নাই,—শুনিয়াই যাইতেছিলাম। এতক্ষণে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল,—এখন অর্থটা সকলের কাছেই হাত-পা বার ক'রে দেখা দিলে! ভিতরে পঞ্চানন ও বাহিরে মজুমদার—এক সঙ্গেই,—'ওরে বাবা রে!' বলিয়া হাসির ফোয়ারা ছাড়িয়া দিল। পরে মজুমদার ভায়া হাঁকিয়া বলিল—'পঞ্চানন পালিয়ে এস,—পালিয়ে এস। ইনিই সেই ভারবী,—মরেননি,—আমাদেরই মারতে এসেছেন!' পঞ্চানন বলিল—'না মশাই,—ইনিই সেই আমাদের হাতীবাগানের পণ্ডিত মশাই ;—তিনি

সহজ আর সোজাসুজি অর্থই করতেন। 'সিংহনাদ' মানে বলে দিয়েছিলেন—'সিংহের মল্',—যেমন হাতীর নাদ, ষাঁড়ের নাদ, অর্থাৎ বড় বড়দের মল্কে 'নাদ' বলে।'

মজলিস্ ভাঙ্গিয়া চার টুকরা হইয়া গেল ; হরিপদ হাসিতে হাসিতে গিয়া শয্যা লইল। পঞ্চানন—চাটুয্যের পদধূলি লইয়া পলাইল! চাটুয্যে বসিয়া বসিয়া 'যত সব চ্যাংড়ার দল্',—এই পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিল। আমি জাহাজের এক প্রান্তে গিয়া 'ঠাকরুণ-বিষয়ের' অর্থগৌরবটা উপভোগ করিতে লাগিলাম। কেবল বড়বাবু ধীরে ধীরে উপরে গিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

২৪

রাত্রে গরম বোধ হওয়ায় অপার ডেকে গিয়া একখানা ছোট সতরঞ্চি পাতিয়া শুইলাম—তখন রাত দুইটা। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি—ঊষার উন্মেষ ;—জাহাজ তখন একটি সুন্দর দ্বীপের নিকট দিয়া চলিয়াছে। আমরা দ্বীপটি হইতে আন্দাজ পনের গজ দূরে। সমুদ্রবক্ষে অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপ বা পাহাড়,—পাথর আর গুল্মাদি লইয়া মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছে। এটি যেন বড়লোকের একটি সখের (tastefully) সাজানো বাগান ;—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নানা বর্ণের পুষ্পে ও ফলে, এবং মনোমুগ্ধকর পারিপাট্যে পরিশোভিত। ঊষার রঙ্গিন আভা তাহার উপর এক অপূর্ব আলোকপাত করিয়াছে।

উঠিয়া বসিলাম ;—সে কি অনির্বচনীয় দৃশ্য! মনে হইতে লাগিল—এ সেই রূপ-কথার রাজ্য! কিন্তু সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত, অরুণালোকের আভাস মাত্রেই—তাহা নভে বিলীন হইয়া গেল! আমি অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম ; সমস্তটা স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। জাগ্রত অবস্থায় দেখা, এতটা শৃঙ্খলাময় সুস্পষ্ট দৃশ্য যে অলীক, তাহা আজিও মনকে বুঝাইতে পারি নাই।

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপর একটি ঘটনায় সন্দেহটা বাড়াইয়া দিয়া গেল। তখন একটি জনপদের নিকট দিয়া চলিয়াছি। এটিও একটি দ্বীপ। তটভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত সুন্দর সুহরিৎ ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ; কিনারায় ছোট ছোট ডিঙ্গি। কৃষক ও ধীবর জাতীয় লোকই এ ক্ষুদ্র দ্বীপটির অধিবাসী বলিয়া বোধ হইল।

সান্ধ্য-গাম্ভীর্যে স্থানটি আমার নিকট ক্রমেই ভাবময় হইয়া উঠিতেছিল,—আমি কেবিনে বসিয়া তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম। এমন সময় দেখি—সহযাত্রীরা দ্রুতপদে উপরের ডেকে ছুটিয়াছে। ব্যাপারটা কি তাহা জানিবার জন্য আমিও উপরে গেলাম। দেখি—জাহাজের স্থানে

স্থানে কে-যেন হিঙ্গুল ছড়াইয়া দিয়াছে। সকলেই দেখি, পশ্চিমের ডেকে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে। আমিও চাহিলাম,—যাহা দেখিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না; সে এক বর্ণনাতীত দৃশ্য! সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ ক্রমোচ্চ পার্বতীয় জনপদটি যেন সোপানের মত উঠিয়া গগন স্পর্শ করিয়াছে! উপরে—ঠিক তাহার দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকা সকল (দেব-ভবন সকল) নানা বর্ণে ও স্বর্ণচ্ছটায় শোভা পাইতেছে। আবার দুই পার্শ্বের অট্টালিকাগুলির পাদদেশ হইতে দুইটি প্রশস্ত পথ সমরেখায় নামিয়া আসিয়া সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। পথ দুইটিতে আবিরের ছড়াছড়ি, —দেবাঙ্গনারা এই মাত্র যেন 'হোলি' খেলিয়া গিয়াছেন! তাহারই আভা—জলে ও জাহাজে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

যিনি এদৃশ্য না দেখিয়াছেন, তিনি যেন সহজেই বলিবেন—'ওটা মেঘের মেলা।' যিনি দেখিয়াছেন, এমন কেহ ও-কথাটা বলিলে—শ্রুত-সংস্কার বশেই বিজ্ঞতাটা করিবেন। কিন্তু আমি তাহা পারিতেছি কই! আমরা যে এই দৃশ্যটা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া দেখিয়াছি; আর এই দীর্ঘ সময়-মধ্যে তাহার তিলমাত্র পরিবর্তনও ঘটিতে দেখি নাই; তাই এই নিখুঁত সুশৃঙ্খল ব্যাপারটা প্রহেলিকার মতই রহিয়া গিয়াছে।

নিসর্গলীলা ত বটেই, অথচ হাসির কথা হইবে যদি বলি,—বোধ হয় গগনের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া, এই নিভৃত নিকুঞ্জে, দেব-সম্পদের কণামাত্র আভাস দেখা দিয়াছিল। পূর্বে পূর্বে অনেক কথাই ত আড্ডার আবিষ্কার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি—পরে যখন অচেতন গ্রামোফোন্ গান শুনাইল, টেলিফোনে বাক্য-বিনিময় চলিল, বে-তার্ বার্তাবহ সংবাদ বহন করিল, মানুষ আকাশে উড়িল,—তখন আবার অবনত মস্তকে সে-সব স্বীকার করিয়া লইতেও বিলম্ব হয় নাই। যাহা হউক, যে-দেশে 'বিটিশ্' ছাপ্ মারা—পায়ের জিনিসটাও ষোল আনা সম্মান পায়, সে-দেশে একজন ব্রিটিশ বিদুষীর কথা, অসম্মান না পাওয়াই সম্ভব। তাই একটু উদ্ধৃত করিলাম;—

'...You, absorbed in the gathering together of such

perishable trash as you conceive good for your self on this planet, you dare, in the puny reach of your mortal intelligence to dispute and question the everlasting things invisible! You, by the Creator's will are permitted to see the Natural Universe,—but in mercy to you the vail is drawn across the Supernatural! For such things as exist there, would break your puny earth-brain as a frail shell is broken by passing wheel—and because you cannot, see, you doubt!—'

পঞ্চানন আসিয়া বলিল—'কি বলুন দিকি মশাই?' আমি অন্যমনস্কভাবেই বলিলাম—'তোমার কি বোধ হয়।' পঞ্চানন উত্তর করিল—এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে পরীর-দেশ নয় ত?' আমি হাসিয়া বলিলাম—'ঐরূপই কিছু হবে,—চাটুয্যেকে সাবধান!' ভাবিলাম,—কেবল আমারই নয়,—দৃশ্যটা সকলেরই মনে প্রশ্ন তুলেছে।

এক জাতের কথাগুলা এক জায়গায় শেষ করাই ভাল। কলিকাতা ছাড়িয়া ক্রমে সাত-সমুদ্রের জল দেখিলাম। কখন বাদামী, কখন ফিকে নীল, কখন গাঢ় নীল—পরেই কালো, আবার আশমানী,—কখন সবুজ, কখন গৈরিক! আশ্চর্য এই—যখনি যখনি জলের রং বদল হইয়াছে, তখনি লক্ষ্য করিয়াছি—এক জল অন্য জলের সীমারেখা কোথাও এক চুল অতিক্রম করে নাই!

যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিয়াছি সেই সুদীর্ঘ বিভাগ, সদা-চঞ্চল উত্তাল-তরঙ্গ-তাড়নে কোথাও বাঁকে না; এত যুদ্ধেও কেহ কাহাকে আপনার সূচ্যগ্র অংশ ছাড়ে না! যখনি কেহ কাহারও উপর চড়াও হইয়াছে, অমনি trespasser-কে (অনধিকার প্রবেশকারীকে) অপরটির রংয়ে পরিণত হইতে হইয়াছে, মুহূর্তের জন্যও সীমারেখার নড়্‌চড়্ হয় নাই। সে যেন রুল্‌টানা লাইন বা আইন। দেখিলে বড় বড় বিস্‌মার্কের বাক্‌রোধ হয়।

সে-দিনকার সন্ধ্যাটা ঐ-সব কথা লইয়াই কাটিল।

২৫

পাড়িটা খুব লম্বা হ'লেও হংকং ছাড়ার পর আমাদের সরাসরি উত্তর চিনে—অর্থাৎ নির্দিষ্ট মোকামে পৌঁছিবার কথা ছিল। টাইফুন্—মাঝে পড়িয়া প্রাণটা লইল না বটে, কিন্তু ১০।১২ ঘণ্টার কয়লা লইয়া যায় ;—জান্ বাঁচিল, কিন্তু হিসাবের কয়লায় টান্ ধরিল। কাজেই তাহার জন্য জাহাজকে চীফু বন্দরে যাইয়া নঙ্গর করিতে হইল। বন্দরটি সহুরে সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের বেড়া দিয়া ঘেরা নয় ;জাহাজের ভিড় কম। Battle-ship-এর বালাই নাই man-of-war-এর মোড়লীও দেখিলাম না। যেন একটি শান্ত পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সময়টাও সন্ধ্যার প্রাক্কাল ছিল,—বেশ উপভোগ্য বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

কয়েকখানি ছোট গরিবী হালের ডিঙ্গী, আর দু' একখানি ছোট লঞ্চ, আমাদের জাহাজের চারিদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডিঙ্গিগুলিতে বালক ও যুবকেরা পিচ্, অ্যাপেল, আঙ্গুর, চীনের-বাদাম প্রভৃতি ফল আর দেশী মদ বেচিয়া বেড়াইতে লাগিল। পিচ্‌গুলি ভারতের পিচ অপেক্ষা তিনগুণ বড়, বর্ণও চিত্তাকর্ষক। অ্যাপেলগুলি ছোট—টকটকে লাল, যেন মোমের খেল্‌না, স্বাদু ও সুমিষ্ট। দশ পয়সায় (ten cent) পঁচিশটি হিসাবে অনেকেই কিনিল। দিশী-মদ দশ পয়সায় এক বোতল (pint)—আবদুল্লার দল ঝুঁকিয়া পড়িল! চীফ সাহেব হুকুম দিলেন—কেহ এক বোতলের বেশী কিনিতে পারিবে না। আবদুল্লা বিনীতভাবে তথাস্তু বলিল এবং যাহারা মদ ছোঁয়না এমন সব I, thou, he, she, it. খাড়া করিয়া খরিদ আরম্ভ করিয়া দিল ও যজ্ঞের আয়োজন জড় করিয়া ফেলিল।

বিক্রেতারা সমুদ্রকূলবর্তী জঙ্গলী বা অসভ্য চীনে বলিয়াই বোধ হইল,—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উলঙ্গ, কাহারো কাহারো নাম মাত্র লেংটি আছে। মাল বেচা শেষ হইলে তাহারা ইঙ্গিত করিয়া বলিতে

লাগিল—'সমুদ্রে টাকা পয়সা ফ্যালো,—আমরা তোমাদের সাক্ষাতেই ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়া দেখাইতেছি, অর্থাৎ তুলিয়া লইতেছি।' তামাসা দেখিবার জন্য অনেকেই কিছু কিছু ফেলিতে লাগিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়া দেখাইতে লাগিল ও নিজের নিজের ডিঙ্গিতে সেগুলি ফেলিতে লাগিল। হায়-রে পয়সা! যাহার জন্য আজ আমরা সমুদ্রে ভাসিতেছি, তাহারই জন্য এই বালকেরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছে! জগতে সর্বত্রই তোমার জয়। অন্যান্য বন্দরেও এই পয়সা তোলার অভিনয় ছিল ; কিন্তু সহর দেখা আর পত্র পোস্ট করার ঝোঁকটা মাত্রায় বেশী থাকায়, এটা দেখার তেমন অবসর হয় নাই। আশ্চর্য বটে—ক্ষুদ্র দুয়ানিটি পর্যন্ত তাহাদের এড়াইয়া যাইতে পারে না।

যাহারা লঞ্চে আসিয়াছিল, তাহারা চীফুর সওদাগর শ্রেণীর লোক,—বেশ সভ্য, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদও সুন্দর। লঞ্চে বিবিধ বিলাস-সামগ্রী—সাবান, বাতি, ছবি, সিগারেট, চা, চিনামাটির বাসন, চায়ের set প্রভৃতি ত ছিলই,—কিন্তু তাহাদের পণ্যের মধ্যে রেশমী বস্ত্রই প্রধান :—নানা রংয়ের রেশমের থান, রুমাল, সুন্দর কারু-কার্য-করা টেবিল দর্পণ প্রভৃতির আচ্ছাদন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সস্তাও বেশ ;—যে রুমাল কলিকাতায় পাঁচ সিকে দেড় টাকা, এখানে অনেকেই তাহা চার পাঁচ আনা করিয়া কিনিলেন। সাধারণ ব্যবহারের বা কর্মস্থানে (আপিসে) ব্যবহারের সুট্ প্রস্তুত করিবার যে রেশম দেখিলাম, তাহা ash-colour-এর (ছায়ের রংয়ের)। চার পাঁচ টাকা হইতে দশ এগার টাকার এক থান পাওয়া যায়। সার্টিন-জিনের মত খোল, সার্জ বা রিবের বুনোন্, খুব ট্যাক্সই। এক থানে একটি সম্পূর্ণ সুট্, অথবা দুইটি কোট ও একটি ওয়েস্ট-কোট হয়।

সুটের জন্য চার পাঁচ টাকা করিয়া থান—আমরা অনেকেই লইলাম ; কারণ, পরিচ্ছদের আবশ্যকটা যে আমাদের কতখানি, তাহা যতই অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল ও পীড়া দিতেছিল। দামী রেশমের বয়ান্, অনাবশ্যক বোধে বাদ দিলাম। ফল কথা—চীফু জায়গাটি রেশমী কাপড়ের জন্য ও রেশমের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইতিপূর্বে যে, কায়চু ও শ্যান-টং-এ (Kao-chiu-Shan-tung-এ) জার্মানরা বেশ বাঁশগাড়ী করিয়া বসিয়াছিল ও বিগত জার্মান-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, জাপান যাহা অবরোধ ও অধিকার করে এবং যেখানে হইতে জার্মানীর জাহাজ 'এমডেন্' সরিয়া আসিয়া দিন কয়েক আমাদের হিম্‌সিম্ খাওয়ায়,—এই চীফু সহরটি তাহারই ঠিক উত্তর পার্শ্বে—পিচিল উপসাগরের তীরেই অবস্থিত।

পরদিন প্রাতেই জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমাদের যাত্রাপথটা (Gulf of Pichili-র) পিচিল উপসাগরের উপর দিয়া এবং তখনকার রুশের অধিকারগত পোর্ট আর্থারের (Port Arthur-এর) ঠিক দক্ষিণ বা নীচে দিয়া। সিঙ্গাপুর পার হইয়া পর্যন্ত এক প্রকার চীনের জলেই চলিয়াছি।

চীফুতে নামা ঘটে নাই, তবে পত্র পোস্টিংটা, সরকারী ডাকের সামিল করিয়া দিয়া সমাধা করা হইয়াছে। সুতরাং জলে জলেই আছি,—জল ছাড়া কথা নাই,—ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদ্রের উপরই তাল রাখিতে হয়। বাল্যকালে দেখিয়াছি—পোটো প্রতিমা চিত্র করিতেছে। কার্তিকের গায়ে রং দিতেছে, কিন্তু গণেশের পেটে তুলি মুছিতেছে,—লক্ষ্মীকে টিপ্ পরাইতেছে—গণেশের পেটে তুলি মুছিতেছে; মা দুর্গার পায়ে আল্‌তা পরাইল,—গণেশের পেটে তুলি মুছিল; সরস্বতীর চোখ চান্‌কাইল,—গণেশের পেটে তুলি মুছিল; সিঙ্গির জিহ্বায়, ময়ূরের ঠোঁটে, ইঁদুরের ল্যাজে রং দিল,—তুলি মুছিল গণেশের পেটে! অথচ গণেশের পূজাই সর্বাগ্রে। দেখিতেছি আমারও এ-ক্ষেত্রে সমুদ্রই গণেশের পেট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে—কূলের কাছাকাছি হইয়াছি; আজ আর কাল,—এই দুইটা দিন কাটাইতে পারিলে, এই মহান্ ও বিরাট বিভূতিকে প্রণাম করিয়া তীরস্থ হই।

চিন-সমুদ্রের হরিদ্রাংশ (Yellow-sea) উত্তীর্ণ হইয়া, পিচিলি উপসাগরের (Gulf of Pichili-র) প্রবেশ-পথের কিঞ্চিৎ উত্তরেই উই-হাই-উই (Wei-hai-wei)। এটি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই উই-হাই-উই দ্বীপটির এমন চোটের-জায়গায় স্থিতি যে, হাত বাড়াইলেই—উত্তরে পোর্ট আর্থার, পূর্বে কোরিয়া, আর পশ্চিমে চিন,—সকলগুলিই সন্নিকট।

এটি ইংরাজের ইজারা-মহল, কি চীনের নিকট হইতে খেসারত (Indemnity) আদায়ের চাপ্ দখল, তাহা নাকি খোলসা কেহ জানেন না।

তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে—প্রশান্ত মহাসাগর শীর্ষক প্রবন্ধে—চিন-জাপান যুদ্ধে পরাজিত চীনের ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের সন্ধির সংস্রবে ও তাহার পরবর্তী তিন বৎসর মধ্যে বিবিধ ঘটনার অন্যতম রূপে, উই-হাই-উই সম্বন্ধে এই মাত্র বলিয়াছেন—'ইংরাজও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়াই উই-হাই-উই দখল করিয়া তথায় বৃটিশ পতাকা উড়াইলেন। তাহার পরেই জার্মান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ—জার্মানীও দুইজন মিশনরী হত্যার অজুহাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গায়ের জোরে কিয়াও-চাও বন্দরে ও সমগ্র শ্যান্-টং প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

কোথাও কোন দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিলে সভ্য শক্তিশালী প্রবল জাতিরা অনুগ্রহ করিয়া—নয় সালিশীরূপে, না হয় সাক্ষীরূপে, অযাচিত ভাবেই, শান্তিরক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। পরে কষ্ট স্বীকার, সময় নষ্ট, প্রভৃতি খাতে কিঞ্চিৎ লাভ বা খরচা আদায় না করিয়া ফেরেন না। ইহার নাকি একটা মস্ত উপকারিতা আছে ;—কোন যুদ্ধমান পক্ষ বে-আইনী বা অন্যায় কিছু করিতে সাহস পান না। এই দয়ার কাজের জন্য পাঁচ হাজার মাইলের পাল্লা মারা অল্প উদারতা নহে, ত্যাগ স্বীকারটাও ততোধিক।

চিন বোধ হয় মিনতি জানাইয়া জার্মানী হইতে মিশনরী আমদানী করে নাই। যাহা হউক, এই সব ব্যাপারে কাশীর এক সম্প্রদায় দালালদের কথা মনে পড়ে। কেহ কাশীর চকে কোন দোকানে কিছু কিনিতেছেন তাঁহার অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে কোন দালাল, দোকানদারকে একবার দেখা দিয়া বা একটা সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। তাহার অর্থ আমার প্রাপ্যটা যেন তোলা থাকে! দোকানদারও তাহা তামিল করিতে বাধ্য। তবে দোকানদার দালালিটা নিজের ঘর হইতে দেয় না—খরিদ্দারের মুণ্ডেই চাপাইয়া লয়।—আর এসব ক্ষেত্রে দুর্বলকেই সব চাপটা সহিতে হয়,—

প্রভেদ এই।

শুনিয়াছি, কোন কোন নামী এটর্নী মহোদয় যখন মোটরে যান, পথে বে-আক্কেল মক্কেল যদি নমস্কার করিয়া সাধারণ-সৌজন্য হিসাবে কুশলটা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে এবং তিনি চলন্ত গাড়ী হইতে ঈষৎ হাস্য-সংযুক্ত মুখ ও মাথাটা নাড়া-না-নাড়ার মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যান, পরদিন এটর্নীর সেই অর্থহীন অনুগ্রহ,—তজ্জনিত শ্রম,—সময় নষ্ট,—চোষ্য-চিন্তা-স্রোতে বাধা প্রভৃতি দৈনিক মানসিক ও শৌষিক ত্যাগস্বীকারের জন্য, একখানি অন্তত পঁচিশটাকার পরোয়ানা (bill) মক্কেলের সেই সৌজন্যরূপ অপরাধে আক্কেল-সেলামী আদায় করিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এসকল বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা অনুমোদিত, সুতরাং অবশ্যস্বীকার্য।

২৬

আজ শয্যা ত্যাগ করিতে আমার একটু বেলা হওয়ায়, উপরের ডেকে গিয়া দেখি—বড়বাবু (বোসজা) জাহাজের এক প্রান্তে, রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া উদাসভাবে শূন্যে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে এরূপ স্থানচ্যুত হইতে এক দিনও দেখি নাই,—নিজের ক্যাম্বিসের চেয়ার খানিতে অচল বিগ্রহের মতই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাই নিকটে গিয়া বলিলাম,—'অকস্মাৎ আজ আপনার আসন টোল্‌ল যে?' তিনি উদাসভাবেই উত্তর দিলেন,—'যখন বুঝতেই পারচি--চেয়ারে বসা চুক্‌তে আর বেশী দিন নয়, তখন দিন থাক্‌তে ত্যাগের তালিম নেওয়াই ভাল।' তাঁর কথার মধ্যে অনুপ্রাসের অসদ্ভাব না থাক্‌লেও আওয়াজে রহস্যের রসমাত্রও ছিলনা। ভাবলুম, জাহাজবাসের এই শেষ দুটো দিন mean করচেন।

এই সময় মজুমদার ভায়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত, সঙ্গে দত্তজা। ভায়ার হাসি দেখিয়া বোসজা একটু বিরক্তির স্বরেই বল্লেন—'আর হাসির সময় নেই, আমিও তোমাদের সঙ্গে আজ একমাস হেসেই কাটিয়েছি, কোন কথাই গায়ে মাখিনি। কিন্তু কাল বাদে পরশু যে-যার সব কাজে বসতে হবে,—সাহেবরা ত আর আমাদের ঠাকরুণ-বিষয় শোনবার তরে তলব করেনি।'

বোসজার সহিত আমার এই পাড়িতেই প্রথম পরিচয়। তাঁকে বেশ আমুদে আর মিশুক বলেই জেনেছি। এইভাব এই প্রথম পেলুম! অকস্মাৎ আপিসের আর সাহেবের নাম শুনে যেন চট্‌কা ভাঙ্গলো ; বুকের ভিতরটা যেন 'গিলে' বুলিয়ে কে কুঁচ্‌কে দিলে! ভাবিলাম—এইবার বোধ হয় স্বরূপের সাড়া দিতেছেন,—বড় বাবুত্বের ভূমিকা ভাঁজা আরম্ভ করলেন।

আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি একটু কড়ি-মধ্যমে নামিয়া বলিলেন—

'বাঁড়ুয্যে মশাই বুঝি জানেন না,—আমার গোরের মাটি পর্যন্ত এসে গেছে!' মজুমদার ভায়া বলিলেন,—'বাঁড়ুয্যের ত এই ঘুম ভাঙ্গলো! আমরা ওঁর অপেক্ষায় subject (বিষয়টা) ফাঁশ্ করিনি ; চায়ের মজলিসের জন্যে reserved (জীইয়ে) রাখা হয়েছে।' আমি ত একদম্ বোকা ব'নে গেলুম।

চা এসে গেল,—কিন্তু চাটুয্যে আসে না। হরিপদ বলিল—'তিনি ট্রঙ্ক গোছাচ্চেন্, এখন আসতে পারবেন না, পাঁচু-দা তাঁকে সাহায্য করছেন। আমি তাঁর চা নিয়ে যাই, আর পাঁচু-দাকে পাঠিয়েদি।' বোসজা বলিলেন—'সেই ভাল।' পরক্ষণেই সহাস্য পঞ্চানন—তার দ্বিরদ-রদ-লাঞ্ছিত বিকশিত দশনগুলি সামলাইতে সামলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোসজা বলিলেন—'আজ সকালের ব্যাপারটা বাঁড়ুয্যে মশাইকে একবার শুনিয়ে দাও পঞ্চানন।' শুনিয়াই পঞ্চাননের দশনগুলি সহসা যেন শিমুলের কোষ ফাটিয়া শুভ্র সৌন্দর্যে বিকাশ পাইল। এখন তাহার পক্ষে একই সঙ্গে দাঁত সামলানো আর কথা কওয়া কঠিন হইয়া উঠিল ;—দ্বৈতবাদের ঐ দোষ।

উত্তেজনার তোড়ে সে যাহা বলিয়া গেল, তাহাতে বুঝিলাম,—সে মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে, শয্যা ত্যাগান্তে চাটুয্যে তাড়াতাড়ি একবার নিজের ট্রঙ্কটা খোলে। আজ বোধ হয় তার শৌচের বেজায় জোর তলব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই ট্রঙ্কটা বন্ধ করা ত হয়ই নাই, এমন কি তাহার ডালাটি পর্যন্ত ফেলিয়া যায় নাই।

এ সুযোগ সামলাইবার মত সংযম না থাকায়, পঞ্চানন উঁকি মারিয়া তন্মধ্যে অর্ধাধিক স্থান জুড়িয়া এক পুঁট্‌লি মাটি ও তাহার উপর একটি দেয়ালির প্রদীপ আবিষ্কার করিয়া ফেলে! এই অসীম অতলস্পর্শ সমুদ্র-বক্ষে এক পুঁট্‌লি মাটির অস্তিত্ব বিস্ময়ের হইলেও, পঞ্চানন স্থিরই করিতে পারে নাই—সেটা তুক্ কি যক্! আমাকে নিদ্রিত পাইয়া রহস্যভেদের জন্য পুঁট্‌লি-সমেত তাই বড়বাবুর নিকট উপস্থিত হয়।

এইখানে পঞ্চাননকে বিরাম দিয়া বোসজা স্বয়ংই সুরু করিলেন,—'আমি ঘুম্ ভেঙ্গে সেইমাত্র বিছানায় উঠে বসেছি, আর পঞ্চানন, তিরিশ

সের আন্দাজ সেই স্বর্গাদপি গরীয়সীর গুঁড়ো এনে হাজির করলে। আমাদের আনরপুর পরগনায় বাড়ী, অনেক লোকের অনেক কূট সমস্যা solve (সমাধান) করতে হয়েছে, কিন্তু এ মাটির খাঁটি তত্ত্ব মাথায় ঘেঁশছিল না। এমন সময় মুক্তকচ্ছ চাটুয্যে, ঝড়ের মত এসে পোড়ল। পঞ্চাননের প্রাণ নেয় আর কি! অনেক ক'রে সে আগুন নেবালুম।

পঞ্চানন তখন বিনীতভাবে করজোড়ে চাটুয্যেকে বল্লে—'আমাকে কেটে ফেলুন,—দুখ্‌খু নেই—আপনাকেই প্রাচিত্তির করতে হবে ; কিন্তু আগে দয়া করে বলুন প্রভু—এ বিরাট্ বোঝার ব্যাপার ওটা কি?' চাটুয্যে তার কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে ফিরে বল্লে,—'আপনারাও ত এসেছেন ; এ মুখ্‌খুকে বুঝিয়ে দিন্।' সর্বনাশ! আমার অবস্থাটা তখন বুঝুন! ফশ্ ক'রে বলে ফেল্লুম,—'কেন—বাঁড়ুয্যের দ্যাখনি পঞ্চানন! তাঁর যে দুটি ট্রঙ্ক ঠাশা! চাটুয্যে তুমিই ওকে ব'লে, কান মলে দাও।' চাটুয্যে খুব খুসী হয়ে বল্লে—'বাড়ুয্যে মশাই একটা গোটা মানুষ, আর কলাপোড়া-খেগো-বুদ্ধি নিয়ে, এটা বলে কি না,—ওঁর কলকেতায় বাড়ী! চীনে চলেছেন, আর খোঁজ নেই চীনের মাটি বস্তুটা কি ; মুখ্‌খু—হাতে মাটি দেবে কিসে!' এই বলে, পঞ্চাননের হাত থেকে পুঁট্‌লিটি কেড়ে নিয়ে বিজয়ীর মত চলে গেল।'

শুনিয়া মজুমদার ভায়া—'ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে'—বলিয়া, উঠিয়াই লাফাইতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—'বাঁড়ুয্যে, আমাকে ধর—জলে পড়ে না জান্‌টা যায়। ওরে বাপ্—জার্মানীতে জন্মেছিলেন বিশ্‌মার্ক আর বঙ্গের ভাগ্য অন্ধকার ক'রে চীনে চলেছেন আমাদের এই ত্রিশমার্ক! হায় বঙ্গমাতা—কি দুঃখে এই ওরেবাদ-বুদ্ধি সাগরে ভাসিয়ে দিলে মা!' একটা হাসির ঝড় বয়ে গেল। পঞ্চাননের কবলে এক ঢোক্ চা থাকায়, তাহা সবলে ও সশব্দে এক ঝাপ্‌টা বৃষ্টির মত বর্ষিয়া গেল।

বোসজাকে বলিলাম—'সেদিন এক ঠাকরুণ-বিষয় শুনে, অক্ষয় দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ' পর্যন্ত টান্ ধরেছিল, আর আজ?'

বোসজা বলিলেন—'আর আজ আমার চাকরী পর্যন্ত টান ধরেছে ;

আর দ্বিতীয় দণ্ডটির কথাই স্মরণ হচ্ছে—

'দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে?'

বড় বড় বিলিতী কেউটেকে ধূলোপড়া দিয়ে কেঁচো বানিয়ে এলুম কি চাটুয্যের জন্যে চাকরী খোয়াতে? তোমরা হেস না। পরশু না হয় তরশু, আমাকেই ত লোক বুঝে আর লোক বেছে কাজের ভার দিতে হবে! চাটুয্যে আবার store-keeper (গমস্তা বা ভাঁড়ারী); কেরানী নয় যে পাঁচজনের ভেতর চালিয়ে নেব। তার বোধ করি হাজার টাকা security-ও (জমানতও) আছে। field-এর (অভিযানের) সব দামী জিনিসই গুদামে ঠাশা।

শুনেছি শীতের আয়োজন খুব বেশী; প্রায় সব পোশাক-পরিচ্ছদই ক্যানাডা হতে আমদানী। কোন গুদামেই লাখটাকার জিনিসের কম নেই। তার কোন একটির ভার ত ঐ মাটির-মুরোদকে দিতেই হবে! তারপর? ঐ ব্রাহ্মণের জামানতের টাকা জল্ আর চাকরী খতম্,—হাতে দড়ির আশাও দুরাশা নয়;—ঐ সঙ্গে আমারও চেয়ার-চ্যুতি! এ অভিযানে বিলাতের সংস্রবে (imperial connection-এ) কাজ-কর্ম, সাহেব-সুবোও অচেনা;—তার ওপর field-এর (যুদ্ধক্ষেত্রের) আইন-কানুন মানেই—মহাপুরুষদের মর্‌জি।'

বোসজার এক একটি কথা যেন (এক মাস ম্যানিন্‌জাইটিসের পর) ধাক্কা দিয়া দিয়া চাক্‌রির পাক্কা মূর্তি প্রকট করিতে লাগিল ও পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতে লাগিল। ফাঁক পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি চাটুয্যের চাকরী ভালমন্দ ভেবে চিন্তিত হচ্চেন!'

বোসজা বলিলেন—'ভাল ত আদৌ নয়, মন্দটা ভেবেই ভয় পাচ্চি; আর কেবল চাটুয্যের নয়—নিজেরও।'

বলিলাম—'এ-চিন্তার জন্মটা কি ঠাকরুণ-বিষয়ের অর্থগৌরবের মধ্যে না—চীনে-মাটি ফুঁড়ে এর অঙ্কুর দেখা দিলে?'

বোসজা সবিস্ময়ে বলিলেন—'আপনি কি তবে বল্‌তে চান,—আমার ভাবনাটার ও-গুলো অন্যতম কারণও হ'তে পারে না!'

আমি বলিলাম—'চাটুয্যে যদি ঐ ঠাকরুণ-বিষয় সত্ত্বেও সাত আট বছর চাকরী বজায় করে এসে থাকে ত আজ সেটাকে এত বড় ভয়ের কারণ ভাব্‌চেন কেন? 'সরকারী কাম্‌ আপসে্‌ চল্‌তা হায়,—' এ কথাটা অর্থহীন নয়। ঐ যে boiler room-এ (তাপ্‌ কামরায়) অগ্নিমূর্তিটি বসে থাকেন তাঁর তাতে কাজ সুধু চলে না—ছুটে চলে। তাঁর হুঙ্কারে পঙ্গুও গিরি লঙঘন করতে পথ পায় না।'

আমার কথা শুনিয়া বোসজা বলিলেন—'আপনার কথায় চাটুয্যে-সম্বন্ধে বিশেষ আশ্বস্ত হ'তে না পারলেও, আপনার কৃষ্ণপক্ষ সমর্থনের পরিচয় পেলেম বটে। কিন্তু ঐ লোকের হাতে লাখ টাকার মাল, আর সেই অসংখ্য জিনিসের আদান-প্রদানের হিসাবের ভার দিয়ে যে কি করে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, তা এখনো আমি বুঝতে পারচি না।'

বলিলাম—'আপনি এত সত্বর fresh fruit-এর (ফলের) কথা ভুলে গেলেন নাকি? জাহাজে ব্যবহারের জন্য আমরা সকলেই কিছু কিছু ফল (আঁব, ডাব, আনারস প্রভৃতি) এনেছিলুম। পাঁচ দিনেই তার পনের-আনা চাটুয্যের পেটেই পৌঁছে গেল! আমি বল্লুম,—'অন্ততঃ সিঙ্গাপুর পর্যন্ত চলা উচিত ছিল, এর মাঝে ত কোথাও কিছু পাব না।' তাতে চাটুয্যে চট্‌ উত্তর করে,—'ভাবচেন কেন, আমার fruits (ফল) সবই মজুদ রয়েছে।'

পর দিন পঞ্চানন যখন সেই প্রপঞ্চের টুকরি মজলিসের মধ্যে এনে হাজির করলে, সকলেই দেখে নয়ন জুড়িয়েছিলেন,—একটা তাল, দুটো চাল্‌তা, আর শুকিয়ে তেউড়ে যাওয়া কতকগুলো শিক্‌ড়ে-মূলো, বর্‌বটি আর কাঁচা লঙ্কা! অধিকন্তু গোটা ছয়েক গোঁড়া নেবু, আধপাকা কাঁচকলা, আর আদ্‌খানা পচা কাঁটাল! মনে পড়ে কি?'

শুনিয়াই পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—'ওরে বাবারে, আবার সেই শৈবলিনীর নরক দর্শনের স্মৃতি!' প্রথম দর্শনে পঞ্চাননই বলিয়াছিল—'If these be thy fresh-fruits, O Israel!' etc

বোসজা বলিলেন—'সেই দিনই ত 'ফলেন পরিচীয়তে' কথাটার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি, আর ফলের মধ্যেই ত চাটুয্যের প্রথম পরিচয় পাই।'

বলিলাম—'সবটা আগে শুনুন; তারপর এই দীর্ঘ এক মাসকাল চাটুয্যের একটি পয়সাও খরচের খাতে দেখেছেন কি? এক দিন তার মোজা দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, এক-পাটিরও তলা নেই! শুনলাম, সে-জোড়াটি এই সবে সাত বছরে পড়েছে। যে-লোক গুদামে থাকে, তার ত মোজার অভাব হবার কথা নয়, অনায়াসে পুরাতন জোড়াটির বদলে নূতন একজোড়া নিতে পারে। কিন্তু পয়সা বা জিনিস সম্বন্ধে সে যক্ষ। তাকে ও-দুটিতে ফাঁকি দেবার লোক আজো জন্মায়নি জানবেন। আমি সে-সম্বন্ধে আপনাকে অভয় দিতে পারি, আপনি বে-ফিকির থাকুন।'

পঞ্চানন উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল—'আমি স্বচক্ষে দেখেছি মশাই—মাছের কাঁটা ফেলে না, একদম্ হুলো-cat (হুলো বেরাল)।'

এই কথায় ঐক্যতান হাস্যের মধ্যে চাটুয্যে আসিয়া মুখভঙ্গীসহ পঞ্চাননকে বলিল—'আর হাস্‌মার্‌তে হবে না, কলকেতার মুখ্‌খু। আজ বিদ্যেবুদ্ধি বেরিয়ে পড়েছে। বাঁড়ুয্যে মশাই শুনেছেন ত?'

বলিলাম—'আরে ছিঃ—ওটা অপদার্থ! ও যে এতটা নিরেট্—তা জানতুম না।'

এই সময় জাহাজের স্টুয়ার্ড্ 'গুড্‌মর্নিং' করিলেন ও নিজেই চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। এতদিন একত্র বাসে পরস্পরের প্রতি যে একটা ভালবাসা জন্মিয়াছিল তাই লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন, ও বলিলেন—'আমাদের জীবনটাই এইরূপ;—বিচ্ছেদের কষ্টটা প্রায়ই ভোগ করিতে হয়,—কত লোক আসেন, যান, কত চিহ্ন কত স্মৃতিই রাখিয়া যান! তবে,—চাকুরী এমন Jealous জিনিস, যে চাবুকের মত সর্বক্ষণ উদ্যত থাকিয়া, মনকে (তা ছাড়া) অন্য চিন্তা করিবার অবকাশই দেয় না,—সব ভুলাইয়া দেয়' ইত্যাদি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইরূপ আলাপ আপ্যায়নের পর, তিনি বলিলেন,—'আমি আর আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আজ রাত্রে আপনারা আমার guest (নিমন্ত্রিত অতিথি), কাল রাত্রে আপনাদের আর পাইব কিনা সন্দেহ। আপনাদের ইচ্ছা ও আদেশ মত আজ রাত্রের আহার্য

প্রস্তুত করাইবার বাসনা করিয়াছি। আপনারা অসঙ্কোচে আমাকে আপনাদের ফরমাজ্‌টা বেলা তিনটার মধ্যে জানাইলে সুখী হইব।' এই বলিয়া তিনি বিনয় ও সৌজন্য বিনিময়ের মধ্যে উঠিয়া গেলেন। আমাদের মনগুলাও যেন কেমন ভিজে-ভিজে হইয়া গেল। বিপদ-সঙ্কুল পথের সঙ্গীরা অল্পেই আপনার হইয়া পড়ে।

ব্রেক্‌-ফাস্টের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৈঠকও ভাঙ্গিল।

২৭

পিত্তনাশের পর সকলেই আবার উপরে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল ; কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ব পূর্বদিনের স্ফূর্তিটা আজ আর ফিরিয়া পাইলাম না। দেখিলাম সকলেরি সুর যেন নাবিয়া গিয়াছে। কথাবার্তায় আগেকার সে উত্তেজনা নাই, সবই ঢিলে-ঢিলে। মন জিনিসটার মত ভাঙতে গড়্‌তে মজবুত আর কিছুই দেখিনা, সে তুলতেও যেমন, ফেলতেও তেমনি ; ভাবান্তর সৃষ্টিই তার কাজ।

সকলে আসা গেল, বসা গেল, কিন্তু তেমন হাসা গেল না। আজ আর যেন একটা কোন বিশেষ বিষয় কেহ খুঁজিয়া পাইল না—যাহা লইয়া সমবেত উৎসাহে সকলে তাহাতে যোগ দেয়! তাই সকলেই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন হইল,—কেহ কাহারো মুখের দিকে তাকায় না। হরিপদ দু'পা আসে, কিন্তু কাহারো মুখে কথা নাই দেখিয়া অপরাধীর মত ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। পঞ্চানন খানিকক্ষণ উস্‌খুশ্‌ করিয়া চাটুয্যের সন্ধানে চলিয়া গেল। চাটুয্যে break-fast (ব্রেক্‌ফাস্ট্‌) বুঝিত না, সে পুরোপুরি break-belly-র মত (পেট্‌ ফাঁশার মত) load (বোঝাই) লইত, ও আসন ছাড়িয়া শয্যাও লইত।

পূর্বোক্ত ভাবটা আমাকেও পাইয়া বসিয়াছিল। ভাবিলাম—এমন কি ঘটিয়াছে যে, অকস্মাৎ এই অবসাদের আমদানি করিয়া বসিলাম! 'ক্লাইভের' কবলে যখন আশ্রয় লইয়াছিলাম, তখনি ত জানা ছিল— প্রভু স্বধর্ম ভুলিবেন না,—পরবাসীও করিতে পারেন, পরলোকেও পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। ফল কথা—এতদিন যে বিক্রমাদিত্যের বৈঠক বসান হইয়াছিল, তাহার চৌহদ্দির মধ্যে চাকুরীর চিন্তা বা সাহেবের সংহার-মূর্তি প্রবেশ-পথ পায় নাই।

কিন্তু আজিকার প্রভাত সেটাকে নানা রূপে বর্ণে ও ছন্দে বারবার প্রকট করিয়া প্রাণে একটা অব্যক্ত আতঙ্ক আঁকিয়া দিয়াছে। তাই—সময়ে

অসময়ে, কাজে অকাজে, কারণে অকারণে, মন তাহারই উপর রং চড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে;—কে কোথায় ও কোন্ কাজে posted হইবে, কার ভাগ্যে কিরূপ মুনিব্ জুটিবে; জাহাজ ছাড়িয়াই বোধ হয় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইবে। মামুলী (station duty) কাজ হইতে সমরক্ষেত্রের (active service-এর) কাজ স্বতন্ত্র।

আবার এ অভিযানটির সহিত বিলাতের সংস্রব (Imperial connection) থাকায়, কাজকর্মের ধারা ও নিয়ম-কানুন বিভিন্ন হওয়াই সম্ভব;—সেটা আমাদের পক্ষে বিলাতী বিস্ফোটক্ হইয়া না দাঁড়ায়,—ইত্যাদি ইত্যাদি—সত্য মিথ্যা, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ভাবনা, ভিতরে ভিতরে বিভীষিকার বীজ ছড়াইতেছিল। স্বজনহীন অপরিচিত দেশে, শত্রুপুরীমধ্যে পা বাড়াইতে বড় বড় সাহসী বীরেরও বুকটা কাঁপিয়া উঠে,—আর আমরা ত বাঙ্গালী কেরানী! পরাজয়ক্ষেত্রে পয়জার-প্রাপ্তি, না হয় মৃত্যু; আর বিজয়ে—বেতনটি ছাড়া লাভের বা আশার কিছুই নাই।

সম্ভবতঃ এই সব চিন্তাই, ভাগাভাগি করিয়া আজ সকলের মনকে অধিকার ও আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু যে দুইটি তরুণ যুবা, চাকুরির আশায়—সখ্ করিয়া সঙ্গী হইয়াছিল, তাহারা ত এসব চিন্তার কারণও বোঝে না, স্বাদও জানে না, সুতরাং—সহসা সকলের এই ভাবান্তরটা তাহাদের আঘাত করিয়া মন্মরা করিয়া দিতেছিল।

তাহারা খোঁজে—হাসি খুসী, গান গল্প, আমোদ-প্রমোদ। তা' ছাড়া জীবনটাকে যে কত কাঁটাবন বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া শেষ-বোঝা নামাইতে হয়, সে-সংবাদ এখনো তারা পায়ও নাই, তাহার খোঁজেও রাখে না। তাহাদের পা ঘসিতে ঘসিতে মলিন মুখে নীচে নামিয়া যাইতে দেখিয়া মনে হইল,—তাহারা আজ যেন প্রতিমা দেখিতে আসিয়া শূন্য দালান দেখিয়া ফিরিল।

প্রাণটায় বড় ব্যথা বোধ করিলাম। মনে হইল—আজ ওরা ভাবিতেছে—এঁদের কি এখন এই ভাবই চলিবে? তবে কেন আসিলাম? এর চেয়ে কলিকাতার পথে পথে ঘোরাও ভাল ছিল!

হায়—বালকেরা জানে না চাক্‌রী কি বস্তু। চাক্‌রেদের—কেতাদুরস্ত চুল ছাঁটা, বেশবিন্যাস, স্বহস্তে ব্ল্যাঙ্কো লাগানো ডেভেন্‌পোর্ট শ্যু, কোটের home-cut (বিলাতী) ছাঁট্‌ আর সিল্কের রুমালে—পাঁচটি ন্যাংড়া বা ছয়টি কমলা বেঁধে, ছ'খিলি ছাঁচি পান্‌ আর কাঁচি সিগারেট্‌ মুখে দে' বাড়ী ফেরা—তারা এইটাই দেখিয়াছে ও বাবুদের বাহিরের বড় বড় বাঘ্‌-মারা বাক্য আর হাস্য-পরিহাসই শুনিয়াছে।

অতুল বাবুকে গোঁফ্‌ কামাইয়া গিরিজায়া সাজিতে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে 'মথুরাবাসিনী' শুনিয়া, ঠিক ঐরূপটি হইতে ও করিতে না পারিলে যে জীবনটাই একদম্‌ মাটি, সে-সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হইয়া আছে। এগুলি যে দিন-মজুরদের দাঁড়া-গ্লাস্‌ বা তাড়িরই রূপান্তর মাত্র, তরুণেরা তাহা বোঝে না। তাহারা জানে না যে, উহার ঠিক পশ্চাতেই—সর্বক্ষণ একটা ভয়মিশ্রিত ভাবনা, অশান্তি ও অনটন বাসা বাঁধিয়া আছে।

আমার চরিত্রের নানা দুর্বলতার মধ্যে—তরুণদের আব্দার সওয়া, এমন কি তাহাদের আস্কারা দেওয়া অন্যতম। তাহারাও তাই আমার কাছে অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করিত। সেই কারণে আমার সমবয়স্ক সঙ্গীদের কাছে সময়ে সময়ে আমাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে, আর উপার্জনের মধ্যে চিরদিন 'উপদেশ' উপার্জনই ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় না হইলেও, আজ তাই পঞ্চানন ও হরিপদর অবস্থা দেখিয়া কষ্ট বোধ করিতেছিলাম। তাহারা চাকুরী লইয়া চীনে চলে নাই। তবে কি লইয়া থাকিবে,—কিসের উপর দাঁড়াইবে? সমুদ্র-যাত্রা, জাহাজ-চড়া, বিদেশ দেখা,—এই সব আনন্দ লইয়া কাটানো, এইরূপ একটা তরুণ-সুলভ বাসনার ধাক্কাই, তাহাদের ঘরের বার্‌ করিয়াছে; চাকরীটা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। তাই, মজার বাজার মন্দা দেখিলেই, তাহারা ত মন্‌মরা হইয়া পড়িবেই। কিন্তু এ'তো বর্ধমান বেড়াইতে বাহির হওয়া হয় নাই যে, ভাল না লাগিলেই—তিন ঘণ্টায় পাড়ি জমাইয়া বাড়ী ঢোকা চলিবে।

২৮

মন্‌টা মিইয়ে থাকায়, আহারান্তে দেড়টার পর,—অভ্যাসমত উপরের ডেকে না গিয়া, আজ নিজের কেবিনে গিয়া শয্যা লইলাম। শুইয়া শুইয়া উদাসভাবে একটা সিগারেট টানিতেছি, পঞ্চানন আসিয়া বলিল—'আপনাকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্চি,—আজ যে উপরে যাননি?' বলিলাম—'কি জানি আজ যেন ভূতে পেয়েছে, কিছু ভাল লাগছে না।' পঞ্চানন বলিল—'আমরাই ত পেয়ে থাকি—পাবার জন্যে ছট্ ফট্ করে বেড়াচ্চি—আবার নতুন কোন্ ভূত এল!' বলিলাম—'চাকরী জিনিসটাকে ছোটখাটো ভূত ঠাউরো না পঞ্চানন। বড়বাবু আজ সেই বিচিত্র চ্যাপ্‌টার (অধ্যায়) খুলে,—সকলকে চম্‌কে দিয়েছেন!' পঞ্চানন সভয়ে বলিল—'এখন কি তবে আপনাদের এই ভাব-ই চল্‌বে নাকি? তা হ'লে ত বাঁচব না মশাই! এ-তো তা'হলে আমাদেব দ্বীপান্তরের রূপান্তর দাঁড়িয়ে যাবে! তার চেয়ে—ফির্‌তি জাহাজে ফিরিয়ে দিন্।'

তার কথার সুরে অসত্য ত ছিলই না, বরং কাতরতাই বেশী। বুঝিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। বলিলাম—'লোকের কত কারণে অমন অবসাদ আসতে পারে ; এক আধ্ দিনের ভাবান্তরে অমন চঞ্চল হ'লে চল্‌বে কেন? একটা কত বড় প্রাচিন দেশে চলেছ—দেখবার শোনবার শেখবার কত কি আছে ; এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? জীবনটার মূল্য বাড়িয়ে নিয়ে ফেরা চাই।'

পঞ্চানন বলিল—'তবে আপনি এখন ওপরে চলুন ; সকলেই চুপ্‌-চাপ বসে আছেন, মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যাচ্চে, কিছু বলবেন চলুন।' জিজ্ঞাসা করিলাম—'চাটুয্যে নেই?' পঞ্চানন বলিল—'আছেন ত, কিন্তু নাড়া দিতে সাহস হচ্চে না।'

বুঝিলাম—পঞ্চাননের ধাত ফির্‌চে। উঠিয়া পড়িলাম ও উভয়ে উপরে গেলাম। গিয়া দেখি—সব দিকে দিকে চাহিয়া, চুপ্ চাপ্ বসিয়া

আছেন! আমরা একটু তফাতে আসন করায়, চাটুয্যে আর হরিপদ আসিয়া হাজির হইল। চাটুয্যে আসিয়াই বলিল—'বাঁড়ুয্যে মশাই কি রাগ করেছেন, কোন কথা কইচেন না!' বলিলাম—'পঞ্চাননের মুখ্‌খুমী আর পরাজয় নিয়ে সকালে এত কথা হয়ে গেছে যে, পাঁচ দিন এখন কথা না কইলেও চলে!'

চাটুয্যে শুনিয়া খুবই খুসী হইল। বড়বাবু হাঁকিয়া বলিলেন—'বাঁড়ুয্যে মশাই কি মহেশ চক্রবর্ত্তীর ভাঙ্গাদল বানালেন, আমরা বাদ পড়লুম নাকি?' বলিলাম—'লোকসেনে মাল নিয়ে ব্যবসা চলে না ; না করেন হাঁ, না আছেন দোয়ারকীতে, আছেন কেবল খোরাকীতে! না আছে সাজবার সুরৎ, না আছে চেহারার চটক্। তয়েরি ছেলেরা তাই বিগ্‌ড়ুতে বসেছে, তাদের সামলাতে হবে ত?'

জনার্দ্দন নায়ডুকে (মান্দ্রাজী ক্লার্ক্) বটুয়া খুলিতে দেখিয়া, চিকি সুপারির প্রত্যাশায় 'আসচি' বলিয়া চাটুয্যে তাহার কাছে ছুটিল।

বড়বাবু বলিলেন—'চাটুয্যে কি আমাদের চেয়ে বেশী খোল্‌তাই-দার!' আমি বলিলাম—'অমন সাজন্ত চেহারা হাজারে একটা মেলে না। জাহাজে ত এত দেশের এত লোক রয়েছে, চাটুয্যের মত অমন আকর্ণবিস্তৃত 'হাঁ' একটা বার করুন দিকি।' বড়বাবু বলিলেন—'কিন্তু 'হাঁ' হিসেবে চাটুয্যেকে আপনি কি সার্টিফিকেট দিতে চান তা'ত বুঝলাম না, যাত্রার দলেই বা তার সার্থকতা কি?'

বলিলাম—'লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, অধুনা বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে রক্তবর্ণ বৃকোদর Letter Box-এর শুভ-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায়, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পত্রের প্রবল বন্যা দেখা দেবেই, তখন উক্ত বড় রাস্তার ব্যবস্থা বঙ্গের অলিতে গলিতে বাহাল করতে হবে ; ক্রমে চলন্ত Letter Box-এর (চিঠি ফ্যালা বাক্সর) দরকার স্বতঃসিদ্ধ। সে অবস্থার নট-লাট্ অমৃতবাবু যে নাটক লিখবেন, তাতে চলন্ত লেটার বক্স অবশ্যই থাকবে এবং তার সাজবার লোক দরকার হবেই।

গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা লাল সালুর গেলাপ্ আঁটা, মাথায় একটা

টক্‌টকে কাবুলী কুল্লা পরা, আর কপালে সাদা অক্ষরে Letter Box ছাপা, একটি এমন লোক চাই—যে হা ক'রে আগন্তুক পত্রগুলিকে কবলে নেবে। আমাদের মধ্যে কে এমন বাহাদুর আছেন, যিনি এই পার্ট নিতে পারেন?'

বড়বাবু বলিলেন—'সর্বনাশ! মাপ্ করুন মশাই্।' একটা হাসি পড়িয়া গেল। চাটুয্যেও ছুটিয়া আসিল। পঞ্চানন হাত জোড় করিয়া বলিল 'এমন সৃষ্টিছাড়া সংয়ের কথা ত কখন ideaতেই (কল্পনাতেই) আসেনি মশাই?'

মজুমদার ভায়া সলম্ফে বলিয়া উঠিলেন—'It beggars imagination'.—কল্পনা এখানে ফতুর।

চাটুয্যে কিছু না বুঝিয়াই হাসিটায় যোগ দিয়াছিল; প্রাবল্যটা একটু কমিলে নিম্ন কণ্ঠে পঞ্চাননকেই জিজ্ঞাসা করিল,—'ব্যাপারটা কি?'

পঞ্চানন কিন্তু উচ্চকণ্ঠেই বলিল—'এই আপনারই গুণের কথা হচ্চিল, সেদিন যে-কথা বলেছিলেন,—বাল্যকালে আস্তো একটা চাল্‌তা খেতে গিয়ে, দু'কস্ কেটে হাঁ-টা কি ক'রে অমন ফ্যালাও হয়ে পোড়ল!'

চাটুয্যে,—'চ্যাংড়া কিনা, প্যাঁচাকে কোন কথা বলবার যো নেই।'

পঞ্চানন,—কেন, এতে নিন্দের কথা কি আছে? জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন, বাল্যকালেই তাঁদের কাজে কর্মে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। কেউ সূর্যদেবকে গিল্‌তে গিয়েছেন; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কড়ে আঙ্গুলে গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কই—কেউ ত তাঁদের মন্দ বলে না। তবে কেষ্টর কাজটায় আমাদের একটা অনিষ্ট হয়েছে বটে। তাঁর বইবার আর সইবার শক্তিটা প্রমাণ হওয়ায়,—পৃথিবীর পাপের বোঝাটা বেপরোয়া বেড়ে চলেছে।

মজুমদার—Bravo (বাহবা) পঞ্চানন!

বোসজা এতক্ষণ ভাবী লেটার-বক্সের কথাই ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাঁড়ুয্যে মশায়ের লেখাপড়াটা করা হয়েছিল কোন ইস্কুলে?'

আমি আশ্চর্য হইলাম,—বলিলাম—'তা হ'লে বুঝতে হয়—আমি যে ইস্কুলে গিয়েছিলুম, আর লেখাপড়া করেছিলুম, সে-সম্বন্ধে

আপনাদের সন্দেহ নেই। বদনামের কথা হলেও এটা আমি মেনে নিতে বাধ্য ; কারণ বাবার ভুল চুকে সে কুকাজ একবার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনেই মাস্টারদের দয়া আর দূরদর্শিতা—সে ভুল সুধরে দেয়।'

ঘটনাটা সবিস্তারে শুনিবার জন্য মজুমদার ভায়া আড়্ হইয়া পড়িলেন, অন্য সকলেও সবেগে ঝুঁকিলেন।

কোন বিষয়ের বাড়াবাড়িতে আমি নারাজ ; বিশেষতঃ ঐ ইস্কুলের সংস্রবে একটি ভুল, সিঁদুরে মেঘের মত আমাকে সাবধান করে দেয়। আজ আবার সেই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল! কিন্তু সকাল থেকে যে মানসিক গুমোট্‌টা জমাট বেঁধে সকলের বাক্‌রোধ করিয়া রাখিয়াছিল,—সেটা সবেমাত্র শনৈঃশনৈঃ সরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কত ডিগ্রি উত্তাপে যে সেটা একদম বাষ্প হইয়া বিদায় লইবে, তাহা জানা নাই। ভিজে কাঠ ধরান হইয়াছে—ফুঁ থামিলেই আবার না শোল্-পোড়া হয়! তাই প্রসঙ্গটা কিছুক্ষণ বজায় রাখাই বিহিত ভাবিলাম।

বলিলাম—'ইস্কুলে পদার্পণ ক'রে পাঠারম্ভেই মন খিঁচ্‌ড়ে গেল—প্রারম্ভেই অশুভ দর্শন! One morn I met a lame man! কেনরে বাপু—সরকার মহাশয়ের কি অন্য কোন man জোটে নি? noble man, honest man,—অন্ততঃ bad manও জুট্‌তে পারত,—দেশে তার ত অভাব নেই! এ কিনা সক্কাল বেলা একেবারে মুখোমুখী বিকলাঙ্গ দর্শন,—যাত্রা-ভঙ্গের দেবতা! তখুনি বুঝলাম—সুবিধা নয়,—বড় এগুতে হবে না!

ঘটনাটা আবার গোলাবাড়ীর পাশে ;—অথচ বিদ্যেটা হচ্ছে—গোলাবাড়ী ঘুঁচিয়ে সাহেববাড়ী ঢোকবার! আবার দেখাটা কিনা ঘোড়ায় চ'ড়ে,—যে জাতের দেব সেনাপতি চড়েন পক্ষীতে! এই সব অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের মধ্যে আমার পড়াশুনো দোর্‌কুচে উঠ্‌তে লাগল।

এমন সময় আমাদের গোবর্ধন পণ্ডিত মশায়ের গৌহাটিতে বদলি হ'ল। তাঁকে Farewell (বিদায়) দেবার প্রস্তাব হওয়ায়, হুজুক্ পেয়ে হাম্‌রাই হয়ে পড়লুম। পাছে পান্‌সে হয় তাই কবিতা রচনার ভারটা নিজেই নিলুম। উৎরেও গেল। একদম করুণ রসের কুজ্ঝটিকা! তার মধ্যে এমন মড়াকান্না কেঁদেছিলুম যে, কোন শ্রোতাই অশ্রু-সম্বরণ করতে পারেননি।

ছেলেরা হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনয়ের সময়— শ্মশানে শৈব্যার মুখে সেই কবিতাটি দেয়। কান্নার জন্যে এত এন্‌কোর্‌ বাংলা দেশে নাকি ইতিপূর্বে কেউ আদায় করতে পারেনি। তাতে গোবর্ধন-গৃহিণী আমাদের বাড়ী পর্যন্ত তেড়ে এসে বলেছিলেন,— হতভাগা ছোঁড়া কোন কথাই বাদ দেয়নি,— একটা কথাও আমার তরে রাখেনি ;— উনি ম'লে আমি যে কাঁদবার আর নতুন কথা খুঁজে পাব না!'

কবি নিরঙ্কুশ, তাই তোড়ের মুখে সেরা (poetry) পোইট্রী প্রকট হয়ে পড়েছিল। সেটা গোবর্ধন মাস্টারের বদলির স্থাননির্বাচনে কর্তাদের সূক্ষ্ম রসবোধের প্রশংসা করতে গিয়ে। সেইদিনই বৈকালে বাবা হেডমাস্টার পশুপতি বাবুর এক পত্র পেয়ে আমাকে বল্লেন— 'তোর আর ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই, তুই বাড়ীতে ব'সে হাতের লেখা পাকা!'

'ভাবলুম,— সত্যিকার বিদ্বান্‌ আর বড় হ'তে হলে, ইস্কুল-কলেজে যাবার কোন দরকারই দেখি না ;— 'জন্‌ স্টুয়ার্ট্‌ মিল্‌'— রস্‌কিন্‌, কার্লাইল ও-কারখানার গড়ন্‌ নন্‌। প্রৌঢ়ে বুঝলাম— মস্তিষ্কটা খুবই উর্বর ছিল,— ভাবাটায় ভুল করিনি,— দেশে কি বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ক'জন?'

বহু উৎসাহ বাক্য ও আমার সর্বাঙ্গে পঞ্চাননের মুখ-নিঃসৃত হাস্য-রসামৃত সিঞ্চনের বাধার মধ্যে— মদীয় শিক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম।

২৯

হায়— আজ ঠিক্ বিশ বৎসর পরে সন্দেহ হইতেছে, আমার সেই গোবর্ধন-গৃহিণী প্রদত্ত পাট্টা বুঝি খসিয়া পড়ে! তিনি কান্নার জন্য নূতন কথার অভাব অনুভব করিয়া ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়াছিলেন। আর আজ দেখিতেছি বঙ্গ-সাহিত্য তাহা অপেক্ষা সঙ্গীন সমস্যার সম্মুখীন! যেমনি হউক না কেন— রঙ্গিন চিত্র-চাকচিক্যে— সিল্কের মলাট মোড়া বই বাহির হইলেই, তাহার বাহাদুরীর বিজ্ঞাপনে, বিশেষণের যেরূপ বৃষোৎসর্গ আরম্ভ হইয়াছে, যথার্থ একখানি ভাল বইয়ের ভাগ্যে যে কি জুটিবে, তাহা সত্যি ভাবনার কথা।

বোধ হয় এরূপ অবস্থায় ভাল বইগুলি, বিশেষণের বিদ্রূপ হইতে রেহাই ও রক্ষা পাইলেই মঙ্গল। সেগুলি যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত সাদা মলাটেই শোভা পায়; নচেৎ তাহাদের বাচাই বা কি করিয়া সম্ভব হইবে, ও কে তাহা করিয়া দিবে? যাঁহাদের নিকট বাংলা দেশ সে-আশা করিয়াছিল এবং যাঁহাদের তাহাতে ন্যায়-সঙ্গত অধিকার তাঁহারা অশোক আর আদিশূরের ইঁট্ পাথর উদ্ধার করিতে এবং কোন্ মনসার ভাসানখানি খোদ্ বিভীষণের নিজের হাতের লেখা, তাহা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত। একটি বন্ধু বলিতেছিলেন— 'শুনিয়াছি তাঁহাদের মজলিসে— একেবারে খাঁটি তিব্বতদেশীয় স্বর্ণঘটিত ষড়জাড়িত বিশুদ্ধ মকরধ্বজ বনিতেছে।' আশার কথা।

চাটুয্যে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল— 'হ্যাঁ মশাই, শুনেছি চীনে নাকি আমাদের মা কালী, শ্রীরাধা প্রভৃতি দেবীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে;— সত্যি কি?'

বলিলাম— 'আমিও শুনেছি— বশিষ্ঠদেবের প্রতিষ্ঠিতা কালী নাকি সেখানে আছেন।'

কথাটায় বড়বাবুও যোগ দিয়া বলিলেন— 'লোক নিজের নিজের

দেশের ঠাকরুণদের চেহারা আর সাজসজ্জার অনুরূপ, দেবীদের মূর্তি গড়ে ও তাঁকে সাজায়। পুরুষরা এর চেয়ে বড় model (আদর্শ) মাথায় আনতেই পারেন না। যা হোক—আমি কিন্তু শুনেছি— চীনে মেয়েদের পা লোহার জুতো দিয়ে আঁটা! তা হ'লে সেখানকার দেবীদের পায়েও লোহার জুতো জুটে থাকবে।'

বলিলাম— 'ডিঃ গুপ্ত ত প্রায় হাতের কাছেই এসে পড়েছেন,— ফলেন পরিচীয়তে।'

পঞ্চানন মুখ চোখাচ্ছিল, সে বলিল,— 'কবিতা লেখবার পক্ষে Subject-টা (বিষয়টা) খুব গ্র্যান্ড্! লিখতে পারলে— বঙ্গ-সাহিত্যকে একটা নূতন জিনিস দেওয়া হয়।'

বড়বাবু বলিলেন— 'তা বটে। আজকাল বঙ্গ-কবি-কুঞ্জে বিষয়েরা বড়ই অভাব ;— ললিত-লবঙ্গলতা থেকে— পাহাড়ী ময়না,— স্থলপদ্ম থেকে— জলহস্তী, সবই তাঁরা ফুরিয়ে ফেলেচেন! প্রেমের পান্ দেওয়া আল্না আলমারী আলতা পর্যন্ত তাঁদের খাতায় পাওয়া যাবে।

দেশটা প্রেমের পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট। মুড়ি-মুড়কির কবিতাতেও ময়রাণীর মুখে মধুর আলাপ গুঁজে দিয়ে কবিরা প্রেমের পরোয়ানা জারি করেন। বিষয়টা দুর্লভ হ'লে কি হবে, যিনিই লিখুন— ঐ লোহার জুতোর মধ্যেই প্রেম তার পথ খুঁজে নেবে ;— কি বলেন বাঁড়ুয্যে মশাই ?'

ভণিতা ভাঁজার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম— এঁদের একটা মতলব আছে। থাকুক— আজ আমার কিছুতেই 'না' ছিল না। বলিলাম— 'স্ত্রীলোকের পায়ে লোহার জুতো বাস্তবিকই মহাকাব্যের বিষয়! কারণ, গুণে সেটা চামড়ার জুতোর চেয়ে শতগুণ ট্যাক্সই,— আবার অবশ্যক হলে— উনুনে চড়িয়ে তেল্ ছেড়ে দে' মাছ ভাজাও চলতে পারে। তবে, বদ্‌রাগীর পক্ষে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। চীনেরা প্রাচীন পণ্ডিতের জাত, তাই ওটা মেয়েদের জন্যেই ব্যবস্থা করেচেন ;— তাতে আমার কিন্তু মনটা দমে গেল। এতে ক'রে প্রমাণ হ'য়ে পড়ে— হয় চীনেরা ভারতবাসী অপেক্ষা নির্ভীক, না হয় চিনা রমণীরা পাতিব্রত্যে প্রধানা।'

মজুমদার ভায়া বলিল— 'না, তামাসা নয় বাঁড়ুয্যে, আর ব্যাখ্যা বাড়িও না ; এখন এ-সম্বন্ধে তোমাকে একটা কবিতা লিখতেই হবে ; এটি আমাদের সকলেরই অনুরোধ।'

এইটিই ছিল খোলা কথা,— বলিলাম— 'আপত্তি ছিল না, কিন্তু পূর্বেই দেখেছ ও জিনিসটে আমার সয়না, ওর ওপর এমন এক দেবতার দৃষ্টি আছে, যিনি একটা কিছু না নিয়ে নড়েন না। তিনি বরাবরই গোচরে আছেন,— এবার তা'হলে চাকরিটারই উপর তাঁর শুভদৃষ্টি পড়া সম্ভব।'

বোসজা হাতজোড় করিয়া বলিলেন— 'মাপ্ করুন,— তিনি কিন্তু আমি নই!' হাসিটা একটু উচ্চগ্রামে উঠিয়া পড়িল।

মজুমদার বলিল— 'ইস— আজ যে তোমার চাকরির মায়া মহীয়সী হ'য়ে দাঁড়াল! কই— এ অপবাদ ত তোমার কস্মিন্ কালে ছিল না।'

বলিলাম— 'জলধি আর যুদ্ধক্ষেত্র, দুই-ই যমের বারবাড়ী। সেখানে পা বাড়াতে হলে, মিথ্যা থেকে পা তুলতে হয়। ভদ্রলোকের সম্ভ্রম ব'লে জিনিসটে বজায় রেখে চলবার মিথ্যেটাই বোধ হয় সেরা আশ্রয়, চাকরিতে ঢুকে সেটার খরচ প্রচুর পরিমাণেই করা হয়েছে ; অশিক্ষিতের ও-বালাই নেই বল্লেই হয়।'

'লোকের ধারণা— বাংলা দেশটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার 'ডিপো', সেটা চিরকালই অজীর্ণের আড়ৎ,— বদ্‌হজমের বদ্‌নাম তার বুকে-পিঠে। পাহাড়ী-কুঞ্জের কথা ছেড়ে দিলেও,— বাবুরা পশ্চিমে মধুপুর থেকে আরম্ভ করে ডিহিরি, মায় মসুরী, দক্ষিণে পুরী থেকে ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি হাওয়া খেয়ে চোঁয়াঢেঁকুর চাপা দিতে যান।

কিন্তু আমাদের এই কেরানী-ক্লাসটি— হজমের হারকিউলিস, এরা বড় বড় বিলিতী জিনিস অবলীলাক্রমে হজম করে থাকে,— নীলকণ্ঠও সে গরল গিলতে পারতেন না। ভায়া!— সেটা আমাদের চাকরির মায়ায় সুপাচ্য হয়েছে, কি মোহে সুমিষ্ট লেগেছে, সেটা ভাবার কখন দরকারই বোধ করিনি। গিরিজায়ার ঝাঁটা না খেলে যেমন দিগ্বিজয়ের মনটা দোমে যেত, বোধ হয় এও ক্রমে সেই formulaরই (নিয়মেরই) অন্তর্গত হয়ে যায়। দেখছি, বড়লাট,-দপ্তরের একজন ক্লার্ক ('Autobiography of a

clerk' শীর্ষক প্রবন্ধে) লিখচেন-- 'It kills the soul in those who had it'. মুশকিল এই যে, এর মজ্জাগত ভাবটা প্রকাশের একটা যুত্ মাফিক কথা মিলচে না।'

(আজ দেখিতেছি আমাদের সে অভাব ঘুচিয়াছে। 'Slave mentality' কথাটি, মায় উপসর্গ— রোগটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। 'দাস্য-ভাব' কথাটি, হাজার বৎসর হাতের কাছে হাজির থাকিলেও তার দুর্বলতার দোষে— পদাবলীতেই পড়িয়া রহিল! এখন অনেকের নাকি ধারণা, রোগটা যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন আরোগ্যের আশা আছে। অভিজ্ঞেরা কিন্তু একমত নন ;— তাঁরা বলেন— এ যে রাজ-যক্ষ্মা!)

শুনেছি রাজা রামমোহন রায়ও এই রোগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু 'মানুষের জন্মগত অধিকার' ব'লে কি একটা জিনিস নাকি আছে,— সেটা বাড়ীতে রেখে যেতে ভুলে গিছলেন,— কাজেই কর্তার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইতে বা তাঁর কথা শুনতে, রাজি হননি— চেয়ার চেয়েছিলেন ; তাই রোগের সূচনাতেই রেহাই পান।

ভায়া! ওটা একেবারে রাধার প্রেম,— নিধু বাবুর টপ্পা— 'ভাল বাসিবে ব'লে— ভাল বাসিনে!'

মজুমদার ভায়া বলিলেন-- 'এমনটা কবে থেকে হ'ল! বরাবরইত দেখে এসেছি— তোমার বৈঠকী-চাকৃরি।'

বলিলাম— 'সেটা শুনতে হলে একটু সহিষ্ণু হ'তে হবে।'

বোসজা বলিলেন-- 'নিশ্চয়ই শুনতে হবে, auto-biography (স্বলিখিত আত্মজীবনী) বড় মিঠে জিনিস।'

বলিলাম— 'তথাস্তু। আমার চাকরির উপর মায়া সম্বন্ধে কি ক'রে যে অবিহিত হলুম— সেই কথাটাই বলি। তবে সেটা সহজে হয়নি,— তাতেও তোপের দরকার হয়েছিল!'

পঞ্চানন বলিল,— 'ওরে বাবা— তোপের? চাকরির পায়ে নমস্কার!'

বলিলাম— 'সব শুনলে— 'শত কোটি' বলতে হবে, থাক্। গত বুয়োর যুদ্ধের ব্যবস্থা আর পদ্ধতি দেখে, বড় বড় বাবাজীদের বুদ্ধি ঠিকানায় পৌঁছয়,— সকল মানুষ-মারা (যুযুৎসু) সভ্যদেশেই একটা

সাড়া প'ড়ে যায়। তারপর বুয়োরদের অনেক কায়দা কানুন, সমরদক্ষ জাতিরা নিজের নিজের দলে চালাবার জন্যে কড়াকড়ি আরম্ভ করেন।

ভারতের পল্টনগুলি প্রাতঃকালে একবার খিদে বাড়াবার মত— সখের কুচ্‌কাওয়াজ (parade) সেরে, সারাদিন খস্-টাটির খাস-কামরায় পাখার হাওয়া খেয়ে কাটাতো। সুদান-সূদন কিচেনার সাহেব জঙ্গীলাট হয়ে এসে, সেই বিলাস-বাবুয়ানার বৈকুণ্ঠে বহ্নি প্রয়োগ করলেন। সকাল-সন্ধ্যা লম্বা লম্বা কদম্-মার্চ্, ছুট্-মার্চ্ (running march) প্রভৃতির চোটে, তাদের নাক্‌কে দম্ করে দিলেন।

আজ ঝুটোলড়াই (mock fight) কাল অমুক নদী পার হয়ে অমুক জায়গা আক্রমণ,— পরশু অমুক পাহাড় দখল ;—আবার এই সব ঝুটো ঝঞ্ঝাটের অভিনয়— অধিকাংশই রাত্রে! উদ্দেশ্য— পল্টন্‌কে সর্বক্ষণই লড়ায়ের তরে সতর্ক, অভ্যস্ত ও প্রস্তুত রাখা আর বিলাসের বদ্‌হাওয়াটা বার ক'রে দেওয়া।

ক্রমে তার ধাক্কা আমাদের উপরেও এসে পৌঁছুলো! দেখলুম— জেনারেল্ সাহেব হুকুম দিয়েছেন— কামান্ তিনবার দ্রুত দাগ্‌লেই (in quick succession) সামরিক বিভাগের সকল শাখার লোককেই, (৫-১০ মিনিটের মধ্যেই), তাদের নিজের নিজের নির্দিষ্ট স্থানে ও কাজে হাজির হয়ে, হুকুমের প্রতীক্ষা করতে হবে, অন্যথা— সাজা খুব কঠিন। ব্যাপারটা যে কবে কোন্ সময়ে ঘট্‌বে তার স্থিরতা নেই!

কি সর্বনাশ! একে ত ভাগ্যদোষে কেরানী হয়ে দেশের বুদ্ধিমান মাত্রেরই বিরাগভাজন হ'য়েছি ;— বক্তৃতার বোলে, আর কলমের খোঁচায় 'জর-জর',— তায়, রাতকানার উপর এই 'রোঁদের' ভার্। শুনেই রক্ত শুকিয়ে গেল। ভাবলুম— এতদিনের চাকরিটা দেখচি— তিন আওয়াজেই ফর্সা হবে।

পথের দুধারে যাকে পেলুম তাকেই আর পাড়াপ্রতিবেশীদের অনুরোধ জানিয়ে বাসায় ফিরলুম—তিন তোপ্ দাগলেই যেন খবরটা দেয়, ঝি-চাকরকে হুঁসিয়ার থাকতে বল্লুম। শুনে ব্রাহ্মণী বল্লেন— 'অত ভাবনা কেন,— না যেতে পারলে কেউ ত আর ফাঁসী দেবে না!' যেন ফাঁসী

ছাড়া আর সব সাজাই সহজ ও আমার তা' সইতে পারা উচিত,— আর তাঁরও সেটা সইবে! যা'হক্— দু'তিন রাত্রি মিথ্যা জাগরণের পর— চিন্তাটা ফিকে মেরে এল,— চর্চাও থেমে গেল।

সেটা কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি। মেঘ-ঝড়ের আয়োজন দেখে, বন্ধুরা তাস ফেলে বৈঠকখানা ছেড়ে উঠলেন। তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। আমিও শুতে গেলুম। বাসাটা বে-মজবুত ; বাইরে ঝড়-বৃষ্টি, মেঘগর্জন ; ভিতরে দোর-জানালার ফাঁক ব'য়ে বংশীধ্বনি আর বিদ্যুতের খেলা! আবার সর্বোপরি নাসিকা-নিনাদ!

সাত বছরের মেয়েটা ভয়ে আড়ষ্ট,— আমি বিপদাশঙ্কায় বিনিদ্র। এমন সময় সেই তিন তোপ! রাত তখন দুটো বেজে দশ মিনিট। বাসার লাগাও এক ঘর গয়লা থাকতো,— তাদের ঘর তখন জলে ভেসে যাচ্ছে,— কাজেই কর্তা জেগে ব'সে ছিল। সে দেখি চেঁচাচ্ছে— 'বাবুজি,— বাবুজি,— সয়তান্ বোলা হ্যায়।' বারাণ্ডায় বেরিয়ে বল্লুম— 'শুনতে পেয়েছি সর্দার।'

ব্রাহ্মণীর সেই ভাত-ঘুম— সহজে ভাঙতে চায়না,— ঠেলে তুলতে হ'ল। চাকরটা বাইরের ঘরে থাকত,— তাকে ডেকে, বারাণ্ডায় থাকতে বল্লুম। জুতোটায় পা ঢোকাতে ঢোকাতে— কোট্‌টা বগলে আর ছাতাটা হাতে নিতেই, ব্রাহ্মণী বল্লেন— 'চল্লে কোথায়?' বল্লুম— 'রোদ্ পোয়াতে!' বুঝলেন— কোন কথাই এখন চলবে না, বল্লেন— 'আমাদের কাছে থাকবে কে?'— 'সেটা জেনে আসব ;— রামলাল (ভৃত্য) বাইরের দরজা দিয়ে নে,'— বলতে বলতে একেবারে রাস্তায় ;— মেয়েটা কেঁদে উঠলো।

বাইরে তখন তুমুল ব্যাপার ;— ঝড়ের ঝুঁটি ধরে ধরে শত শত ঘোড়-সওয়ার্ (Cavalry) ছুটেছে ; ত্রিশ বত্রিশখানা Ambulance Cart (চল্‌তি হাঁসপাতাল), তোপখানার সঙ্গে সওয়ার শুদ্ধ শতাধিক artillery horse (তোপটানা ঘোড়া), mule-cart, bullock-cart (খচ্চরের গাড়ী, বয়েল গাড়ী) পদাতিক পল্টন্, Followers প্রভৃতি, সেই ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করে দ্রুত দৌড়েছে।

যেন রামের বে'র Procession (সমারোহ-যাত্রা),— কেবল জল ঝড়ে আলোটা নিবিয়ে দেছে। তাদের ঝন্‌ঝনানি আর ঘড়্‌ঘড়ানিতে ঝড়ও যেন ঝান্‌ খেয়ে। তখন ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারটা যেন কারুর মনেও নেই, গায়েও ঠেক্‌ছে না।

বাইরে পা বাড়াতেই— ছাতাটা উল্টে খাস্‌-গেলাস হয়ে গেল,— 'সখি উপলক্ষ্য মাত্র'— কেই বা সে দিকে মন দেয়! সেই অবস্থাতেই চোঁ-চা ছুট্‌। ভাগ্যে আপিসটা দূরে ছিল না,— দেড়-পো পথ হবে। পৌঁছে দেখি— প্রায় সকলেই হাজির,— সাহেব সর্বাগ্রে।

আলো জ্বালবার হুকুম নেই, সব— (শুধু ভূতের মত নয়) ভিজে ভূতের মত বসা গেল। শীতকাল হ'লে বাঙ্গালীর সাবু খাওয়া প্রাণটা বেরিয়ে যেত, জুলাই মাস বলেই কেবল কাঁপুনি আর হাঁপানীর ওপর দিয়েই গেল।

কেউ কারুকে চিন্‌তে পারছিলুম না। আওয়াজে বুঝলুম, তিনকড়ি বল্‌চে,— 'ছোট্‌বার সময় জুতোর তলাটা বাজপাই বাবুর বাড়ীর সামনেই ছেড়ে গেল,— খোল্‌টাই পায়ে রয়ে গেছে;—চাকরির চরম!' নীরদ বল্‌ছে— 'অন্ধকারে টেবিলের পায়াটা লেগে, হাঁটুটা ছেঁচে গেছে,— কত পাপেই যে লোকে চাকরি করে! লোকে জানে— কেরানীরা কেবল কলম চালায়,— মলমও যে লাগায়— তা' মালুম নেই!' এত কষ্টেও হাসতে হ'ল।

ঝড় বৃষ্টি কমে এল,— গায়ের কাপড়ও গায়ে শুকিয়ে এল; কিন্তু জেনারেল্‌ সাহেব স্বয়ং এসে হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত কারুর সরবার যো নেই। তাঁর ঘোড়ার খুরেব শব্দ-প্রতীক্ষায় কান খাড়া ক'রে,— হাই তুলতে আর ঢুলতে লাগলুম। শ্যামের বাঁশরী-রব শোনাবার জন্যে ব্রজ-সুন্দরীদের চৌদানী আর ঝুমকো-পরা কান কখনই অতটা খাড়া থাকতে পারত না!

প্রভু তোপখানা (artillery), রেশালা (cavalry), পদাতিক পল্টন (infantry), হাঁসপাতাল, Godown (গুদাম্‌), Transport line (বাহন-কুঞ্জ) প্রভৃতির পরিদর্শন শেষ করে,— ঊষার আলোয় এই উপেক্ষিতদের

সেলাম নিয়ে, বল্লেন— 'disperse' (সরে পড়)। বাঁচলুম।

তারপর বাইরে এসে— যে যার মুখ দেখে— ত্রেতায় হনুমানের first and successfull Ceylon trip-এর, পাল্‌টা পাড়ির পর, কপি-কটক সহসা স্ব স্ব শ্রীমুখ দেখে যেমন চম্‌কে উঠেছিল— আমরাও মনে মনে তেমনি আঁৎকে উঠলুম; আর ছাড়া পেয়ে তাদেরই মত মুখভঙ্গী সহকারে— তাদেরই ভদ্র ভাষায় আস্ফালন করতে করতে বাসায় ফিরলুম। সবার সম্মিলিত অভিভাষণের ভাবার্থ মোটামুটি এইরূপ ছিল ঃ— 'ঢের হয়েছে আর নয়! বেটারা কোন্ দিন কাবুলে নে গে কমোড্ বইতে না হয় Trench কাট্‌তে (খানা খুঁড়তে) বলবে নমস্কার চাকরির পায়,— কুতিয়া বোলালেরে বাপ,— বেলা থাকতে সরে পড়াই ভাল।

পিসেমশাই কত সাধ্যসাধনা করেছিলেন,— সওদাগরী আপিস ব'লে গেলুম না। এতদিনে দেড়শ' টাকা কেউ ঘোচাত না, আর উপ্‌রি ত ছিলই! হায় হায়,— কলা-পোড়া-খেগো কপাল কি না, তাই তখন মনে ওঠেনি। আজই চিঠি লিখচি।' উমেশ বল্লে— 'সব নিজের নিজের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত, গুরুজনের বাক্য অমান্য করেছি— আর কি ভালোই আছে! ইশা শ্বশুর মিলেছিল— তা এ শিলেখেগো কপালে সইবে কেন? পই পই করে বলেছিলেন— 'গিলেন্ডার্-হাউসে' গচিয়ে দি, পাঁচ বচরে মানুষ হয়ে যাবে।' তখন শোনে কে?

সেই ফাঁকে শনি এসে পাকড়ালে— এই তিরিশ টাকার তালুক মিল্‌লো! ক্রমে সে রন্ধ্রগত হয়ে three hundred horse powerএ ঘুরতে লাগ্‌লো,— দুম্ করে মুগুরের মত পরিবারটা মরে গেল,— সব ফর্সা! উমেশের 'উ' উড়ে গেল, কেবল 'মেশ' টুকু রেখে গেল! এখন পোছে কে— চুলোয় যাক্— চাকরি আর নয়! শুনেছি সিধু খুড়ো চৌরঙ্গী-কোয়ার্টারে 'সল্‌তের' কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছেন, তাঁকে ধরে কেল্লায় একখানা হাঁড়ির দোকান খোলবার চেষ্টাই চালাই;— রাজপুত্তুর আসছেন,— বেশ দু'পয়সা 'ফেচ্' করতে পারে।' বিভূতি বল্লে— ভাগ্যে বাবা বেলাবেলি বে' দিয়েছিলেন— রাত্রে আজো একা উঠতে পারি না।

উঃ, মিলিটারী লাইনে এসে কি ভুল করেছি, পথে আজ রথের ভিড় না থাকলে— কি ক'রে যে যেতুম কেবল তাই-ই ভাবছি। মামা শিবকেষ্ট দাঁর shopএ ধাঁ ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন,—মাইনেতে কি করে? নেটিবের চাকরি ব'লে মনে ধোরল না ; আক্কেলে এল না যে নামটারই মূল্য কত?

দিনের মধ্যে দশবারও নামটা করা হ'ত,— তা হবে কেন? তা হ'লে রক্তচক্ষু মেজার হর্নের ঘুঁতুনি সামলাবে কে? প্যারীচরণের পীরিতে প'ড়ে যে পবকাল ঝর্‌ঝরে হয়ে গেছে ;শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে 'হর্নের' গুঁতো খাবে কে,—তাঁরা ত 'শৃঙ্গিণাং দশহস্তেন' সাফ্ কয়ে দিয়েছেন। যাক্— বড় ভগ্নীপতি ডিস্ট্রীক্ট্ বোর্ডের বড় বাবু— horde (ডাঁই) করে ফেলেছেন। লিখলেই চাকরি,— আজ পিটিশন্ (দরখাস্ত) পাঠিয়ে তবে চা গ্রহণ।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাসায় ফিরে এসে দেখি— চাকরটা উঠেছে। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। দালানে একখানা খাটিয়ার ওপর ব্রাহ্মণী—গুম্ হয়ে বসে আছেন,— বদনে বেশ থর্ নেবেছে। ভাবলুম—রাত্রের ঝড়ে ত রক্ষা পেয়েছি; কিন্তু প্রাতে এ যে প্রলয়ের পরোয়ানা!

সকালের শিরঃপীড়া সুবিধের জিনিস নয়—বেলার সঙ্গে সঙ্গে তার শুলুনীও বাড়বে। কি করি, আপনা-আপনিই আরম্ভ করলুম—'উঃ—- এখনো বুকটা ধড়াস্-ধড়াস্ করছে;—মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। পথে বাজপাইজী না ধরে ফেল্লে,—সে টাল্ সামলাতে পারতুম না,— কি ঘট্‌তো, তা' ভগবান জানেন।

কে আর কবে এ সব দেখেছে! পাঁচ মিনিটের দেরীর জন্যে—তিন তিনটে লোককে, চোখের সামনে তোপে উড়িয়ে দিলে! পাঁটা কাটা দেখতে পারি না, আর এই নরহত্যা দেখতে হ'ল! যেন মগের মুল্লুক! হায়, হায়, হায়, জল্-জ্যান্তো গরিবরা ছুটতে ছুটতে এল—আর গোলার মুখে গেল! একটা কথা পর্যন্ত কেউ শুনলে না। আহা হা! মনে হচ্ছে আর মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে।' এই বলে দেলটা ধ'রে ফেলতেই ব্রাহ্মণী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—'তুমি আগে বিছানায় বোসবে এস।' বিছানায় বসে

বল্লুম—'উঃ জাতটাকে চেনা দায়'—

ব্রাহ্মণী,— 'আবার চেনা দায় কি রকম! কাটোয়া জাত,— দত্তি। আর তোমার আপিসে যাওয়া হচ্চে না,— চাকরিতে কাজ নেই।'

বল্লুম— 'সবটা শোনো, আবার দয়াও আছে, 'গরু মেরে জুতো দান' যাকে বলে। জেনারেল্ সাহেব যাবার সময হুকুম দিয়ে গেলেন,— যারা সময়ে এসেছে, তাদের এমাস থেকে দশ টাকা করে মাইনে বাড়্লো!'

ব্রাহ্মণী একগাল হেসে বল্লেন— 'পোড়ারমুখোরা সব পারে! তা না ত আর রাজ্জি আছে,— ওদের কাছে অবিচারটি নেই। সে হতচ্ছাড়ারা দেরী ক'রে মোলো কেন? তবে,— তোপের মুখে,— ওঃ মা— গা শিউরে উঠে! তা অদেষ্টের লেখা ত খণ্ডাবে না. সাহেবরা কি করবে। হাঁগা, বল্লে— 'এ মাস থেকে?'— আচ্ছা জুলাই মাসের আর ক'টা দিনই বা আছে. তাতেও পুরোপুরি বাড়তি দশ টাকা দেবে?'

বল্লাম— 'তা দেবে— '

ব্রাহ্মণী— 'ওরা এক-কথার জাত কি না,— কথার নড়্ চড়্ হয় না। এখন তুমি একটু শুয়ে পড় ত দেখি।'

বল্লাম— 'আর এখন ঘুম হবে না, কাজ ত কিছুই করতে হয়নি,— টেবিলে মাথা রেখে দু' ঘণ্টার ওপর ঘুমিয়েছি। তোমারও যে-কষ্ট গেছে, বলতে প্রাণ চায় না,—কোন রকমে একটু চা'র জোগাড় হ'লে শরীরটা ঝর্‌ঝরে হয়ে যায়,— কেবলি সেই তিনটে লোকের চেহারা মাথার মধ্যে ঘুরেছে— '

ব্রাহ্মণী— 'তোমার ও-সব ভাবতে হবে না, তাদের অদেষ্টে ঐ লেখা ছিল ; তা না ত হতচ্ছাড়ারা— দু' ঘণ্টা ঘুমুতে যাবে, তাও পারে না ত মরবে না ত কি? আমি এখুনি চা করে দিচ্ছি— '

বাঁচলুম,— চাকরটাকে ভাল ক'রে এক ছিলিম তামাক দিতে বলে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলুম। চাকরি সম্বন্ধে অনেক চিন্তাই মাথায় জোগান দিতে লাগল। দশ মিনিটের মধ্যেই রামলাল (চাকর) চা এনে দিলে,— সঙ্গে সঙ্গেই তাওয়াদার গয়ার পিণ্ডি।

দর্শনেই প্রাণটা যেন ফিরে পেলুম। মাথাটা নিরেট মেরে গিয়েছিল,—

চায়ে চুমুক দিতেই খাজার মত তার পরদা খুলতে লাগল,— সট্‌কায় টান্‌ দিতেই যেন ভূত ছেড়ে গেল,— ধাতোদ্ধার হ'ল। আবার মানুষের মত হতেই— চিন্তাগুলো পুরো সাত্ত্বিক-পথ ধ'রে ঠেল্‌ মারতে লাগলো। ভাবতে বসলুম— রাত্রে যা করে এলুম, সেটা চাকরি, না নকুরী, না কুকুরী? কলম পেসারই ত পেশা— কিন্তু আজ যার মওলা দেওয়া হ'ল, তার কওলা ত কেরানীরে সব করেনি। তবে যাই কেন? আপত্তি উত্থাপন করি না কেন? চাকরির মায়ায় করি না— না মোহে করি না? মায়া-মোহটা এখানে জ্ঞান-ভক্তির মতই জড়াজড়ি ক'রে থাকে,— দুই-ই অবিচ্ছেদ্য আর sympathetic,— একদম্‌ চিনির পানা।

জ্ঞানেতে ক'রে পাচ্ছি,— চা-বাগানের recruit (নব-নিযুক্ত) কুলির,— কাজের পূর্বে পেশ্‌গি বা আগাম টাকা পাবার মত, আমাদের বাল্য-বিবাহের ফলটা, চাকরি বা রোজগারের আগাম, ফলতে আরম্ভ হয়। পণ্ডিতেরা স্থির করে গেছেন,— সংসার-বিষবৃক্ষের 'মধুরে ফলে'— মাত্র দু'টি ; কিন্তু বিবাহস্য ফলের সংখ্যাটা শাস্ত্রকারেরা ঠিক্‌ ক'রে দেননি এবং সেটা 'মধুরে ফলে' কি বিদ্‌কুটে 'ফলে'— তাও বলে দেয়নি। বিষবৃক্ষস্য ফল দুটি— না খায়, না পরে, না বায়না ধরে, অর্থাৎ— লোকশেনে নয়। কিন্তু বিবাহস্য ফলগুলির সংখ্যা ত নেই-ই, উপরন্তু— খাবে, পরবে, ডাক্তার ডাকাবে ইত্যাদি। আবার মহাশ্বেতার মনোবাঞ্ছাটা, অব্যক্ত স্থলেও সুব্যক্ত ঠাওরানই সমীচিন। অতএব দেখা যাচ্চে,— মায়া-মোহটার জড় ভিটেতেই মজুদ,— বাড়ীতেই বাড়চে। চাকরির উপর চাপ্‌টা sympathetic, যেহেতু চাকরিটাই direct feeder (প্রত্যক্ষ-পোষক), বোধ হয় তাই সেইটার উপরই মায়াটা জড়ায়,— যেমন আত্মাটাকে অন্তরালে ঠেলে,— দেহ-বুদ্ধিটাই বাড়তে থাকে।

কিন্তু মাইনে ত অধিকাংশেরই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, তখন উপরির উপায় উদ্ভাবনে অনেকেরই মস্তিষ্ক ক্রমে উর্বর হয়ে উঠে। সেই রোজগারটাই নাকি বড় মিঠে,— কারণ সেইটাই বাহ্যিক সম্ভ্রম আর বাবুয়ানা রক্ষার বাহন— চাকরির চারপেয়ে মায়ামৃগ।

দরজি মরজিমত সুট জোগায় ; ময়দা নিয়েই মহোদয় মুদী দয়া ক'রে

ঘি-টাও লিখে রাখেন,— কারণ কেরানীদের ঋণই লক্ষ্মী ; তাঁরা তাই মাথা-কেনা মুদীর উপর সন্দেহ করা বা তাঁর হিসাব দেখা অকৃতজ্ঞতা বলেই ভাবেন। মেওয়াওলা মেওয়া, ময়রা মিষ্টান্ন গচিয়ে দেয় ; গয়লা তাঁদের প্রীত্যর্থে নিত্য কলসী উচ্ছুগ্‌গু করে ; স্বর্ণকার বউ-বাহার হার দিয়ে যায়, মণিহার ল্যাভেন্ডার মাথায়,— কেউ দাম চায় না!

এই মোহের মওড়া সাম্‌লানোই শক্ত। তারা কেবল মাসকাবারে সেলামটা জানায়,— আর সেই সেলামেই গোলামের গায়ের মাস কাবার করতে থাকে! যেমন তিথি-জ্বর, পালা-জ্বর আছে, তেমনই কেরানী-জ্বরের পালা— প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাটা। সেটা কাটাতে পারলেই— কেরানী গা-ঝাড়া দে' আবার জবাকুসুম মাখে!

বক্তব্যটা বেজায় বেড়ে যাচ্চে— থাক্, শুনে— সেকেলে 'Human Understanding'-এর লক্ সাহেব, কবরে কেঁপে উঠতে পারেন। ফল কথা— গুড়ুকের টানে টানে গবেষণা ঘোরালো হ'য়ে, শেষ এমন সত্য একটা আবিষ্কার ক'রে ফেল্লে,— যার বিরুদ্ধে কারুর কথাটি কওয়া চলে না। প্রারম্ভেই নিবেদন করেছি— সম্ভ্রম রক্ষার্থে বাগ্‌জাল বিস্তার চলতে পারে,— চলেও থাকে ; কিন্তু চাকরের কাছে চাকরির আসন— মনিব ছাড়া সবার ওপর।

মহাত্মা Job (যোব) বলেছিলেন— 'আমার কিছুই হয়নি,— আমি এখনো ঐ কুকুরটার মতও নিরভিমান সহিষ্ণু হতে পারিনি! ওকে শতবার দূর দূর করে তাড়ালে, এমন কি আঘাত করলেও, ও তখুনি এসে প্রভুর পায়ের কাছে ল্যাজ্ নাড়ে, আর কাতর চক্ষে ক্ষমা চায়। আমি তেমনটা হতে পেরেছি কই?' মহাত্মাকে কোন প্রভুত্ব-পরায়ণ (imperious) মনিবের চাকরী করতে হয়নি ; তা'হলে বোধ হয় উক্ত ক্ষোভের কারণ থাকত না। আমাদের অনেকেরই সে ক্ষোভটা ত নেই-ই ; বরং সগৌরবে বল্‌তে পারি, — 'তবু ল্যাজ্ নেই!'

মজুমদার ভায়া করজোড়ে বলিলেন— 'আমার ঘাট হয়েছে বাঁড়ুয্যে, এ bitter pill (তিক্ত বটিকা) আর গিলিও না,— have mercy (দয়া কর)'।

বলিলাম— 'আর দুটো কথা মাত্র। সংক্ষেপেই বলি,— তখন সট্‌কা থেমে গেছে, চিন্তা থামেনি ; ভাবচি,— গতরাত্রে যে-দুর্যোগের মধ্যে ছুটে বেরুনো হয়েছিল, বাপ্ মা বল্লে (যদিও তাঁরা কখন এমন কথা বল্‌তেন না)— এই মিছে কাজে, বা অনিশ্চিত ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে তয়ের থাকবার তালিম্ নেবার জন্যে, ঐ সঙ্কট অবস্থায় কোন ছেলে বেরুতেন কি? আমার ত মনে হয় এমন বৃষকেতু আমাদের মধ্যে বিরল।

আত্মসম্মান রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবানও এমন আদেশ করতে ভয় পেতেন, কারণ সে আদেশ অমান্য হবার আশঙ্কাই ষোল আনা। সকলেই বেশ জানেন— এঁদের কাছে ক্ষমা আছে। যে কারণেই হোক্, ও-ক্ষেত্রে কারুর কথাই যে থাকত না, সে-সম্বন্ধে লুকোচুরি থাকতে পারে না, মনকে চোখ-ঠারাও চলে না। চাকরি যার জাত মেরেছে,— ধাত্ মেরেছে, তার কাছে ও-জিনিসটা যে, ভগবান কি বাপ-মায়ের ওপর, সে-কথাটা ত্রয়ীর মুখে না শুনলেও তোপের মুখে শুনে নিয়েছি।

ভাবনাটা আরো কত এগুতো জানি না; কিন্তু ব্রাহ্মণী বলে পাঠালেন— 'পউনে দশটা।' ও-সংবাদে বাপ-মার শ্রাদ্ধ থেমে যায়। ভাবনাটা যেন স্প্রিং ছিঁড়ে কোথায় ছট্‌কে পড়্‌ল। উঠে পড়্‌লুম।

আপিসে গিয়ে দেখি সকলেই হাজির! কারুর আর পূর্বভাব নেই! আলোচনা আরম্ভ হয়েছে— তোপের আওয়াজটা কার কর্ণ-কুহর সর্বাগ্রে পবিত্র করেছিল, কে সর্বাগ্রে এসে হাজির হয়েছিল,— আর সেই বাহাদুরিটে নিয়ে, উঁচু সুরে কাড়াকাড়ি চলেছে। এ কাজের আধ্যাত্মিকভাবই এই। কিমধিকম্-ইতি—

আমাদের বড়বাবু ছিলেন গৌরবর্ণ পুরুষ। হাসির মধ্যেও তাঁহার বদনমণ্ডলে মাঝে মাঝে নীলের আভাযুক্ত ঈষৎ লোহিত ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন— 'খুব বলে নিলেন বাঁড়ুয্যে মশাই,— আমরা কিন্তু hide-bound (ছালপুরু) হয়ে গিছি। সন্ধ্যা না হয়ে গেলে মুক্তিস্নানের চেষ্টা পেতুম, এখন তার আর সময় নেই, too late।'

পঞ্চানন বিনীতভাবে জানাইল— এঁরা যে এটাকে ট্রাজিডির দিকেই টানচেন! কলকেতায় ফিরতে পারলে, এই ফলহরি ঠাকুরের (চাটুয্যের)

পায়ের ধূলো নে' ফলের দোকান খুলব। আপনার পা ছুঁয়ে বলচি—চাকরী কোরব না। এখন দয়া ক'রে সেই কবিতাটা—

মজুমদার ভায়া সোৎসাহে বলিল— 'Thank you পঞ্চানন ;আমাদের আসল কথা ত সেইটেই ছিল। উঃ— বাঁড়ুয্যে এতক্ষণ কি হিপ্‌নোটাইজ্‌ই ক'রে রেখেছিল! না— তা হচ্ছে না ভায়া! কি জানি কোথায় ঠেলে দেবে, এমন দিন আর পাব না।'

দত্তজা বলিলেন— 'সেটা ঠিক বটে। আর সকলেরি যখন ইচ্ছে সেটাকে snub করা (দমিয়ে দেওয়া) তোমার nature-এর (প্রকৃতির) অনুরূপ কাজ হবে না বাঁড়ুয্যে।'

দত্তজাকে একথায় যোগ দিতে দেখিয়া আমি ত অবাক! বোসজা এত বড় pleaটা (ওছিলে) পেয়ে বল্লেন,— 'নাঃ— আর আপনার 'না' বলা উচিত হবে না। দত্তজার এই অনুরোধটিকে তাঁর maiden speech (লজ্জাভাঙ্গা লেক্‌চার) বলা চলে। এটা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে নেওয়াই উচিত।'

কথাটা মিথ্যা নয়। দত্তজাকে হাসিতে বা কথা কহিতে কদাচ কোন ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন! আর দ্বিরুক্তি করা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া বলিলাম— 'বেশ, আজ স্টুয়ার্ড সাহেব আমাদের ভোজ দিচ্ছেন, সেই আসরেই এক টুক্‌রো পেশ করা যাবে,— কিন্তু শেষ রক্ষার ভার বোসজা মশায়ের।'

মহোল্লাসে মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিল। পঞ্চানন আর হরিপদকে কি একটা ইঙ্গিত করিয়া চাটুয্যে চট্ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। তাহারাও অবিলম্বে অনুসরণ করিল। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। আমি আজ এই অসময়েই নিজের কেবিনে ঢুকিলাম।

৩০

আজ আমরা স্টুয়ার্ড সাহেবের guest (অতিথি)। রাত্রি নয়টার সময় সেই বিশেষ ভোজে হাজির হওয়া গেল। আজ সকল বন্দোবস্তই first class (প্রথম শ্রেণীর), সাজসজ্জা সবই সুন্দর,— table-cloth (টেবিলে ঢাকা কাপড়) খানা যেন বড় বাড়ীর বরাসন,— একেবারে রাজত্তি!

বেজায় অনভ্যাসের ফোঁটা,— না আছে পিঁড়ে যে, উঁবু হয়ে বসি, না আছে উলঙ্গ-ছেলেমেয়ের পাল যে, পাতের সন্নিকটেই কোনরূপ ত্যাগের দ্বারা ভোগের বাহার বাড়ায় ; মাথার উপর বাঁশের আল্‌নায় না আছে নিশি-গন্ধা কন্থা যে, সত্বর আহার সমাপ্তির পন্থা করিয়া দেয়। এই সময় ফ্রাইডের মত চাটুয্যের প্রবেশ ও তৎ-পশ্চাতে প্রকাশিতদন্ত পঞ্চানন— অনেকটা relief (স্বস্তি) দিল, একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। আজিকার রাত্রিটি, আমাদের এ-যাত্রার জাহাজ-বাসের শেষ রাত্রি,— কাল কূল পাইবার দিন,— এ বিভীষিকাময় সুখের রাজ্য খসিয়া যাইবে। তাই আজিকার রাত্রিটা তরুণদের কাছে যেন বিজয়ার রাত্রের মতই উপস্থিত হইয়াছে। তদুপরি এই জামাই-ভোজ! কাজেই তাহাদের আনন্দ-বাহুল্যটা আজ একটু ক্ষমার চক্ষে (Charitably) দেখিতে অনুরোধ করি।

পাকস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন আকারে প্রকারে ও বর্ণে মৎস্য-মটনের মহোৎসব আরম্ভ হইল। তাহাদের বর্ণনাটা বাদ দেওয়াই ভাল, নচেৎ আবার একখানি পাশ্চাত্য পাকপ্রণালী ফাঁদিতে হয়! শ্রুত ছিলাম— আমাদের দত্তজা বাল্যকালে 'খোরায়' খাইতেন, অন্যথা তাঁহার খর্পর খালি থাকিত।

জাহাজে পদার্পণের পর তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও পাই। কিন্তু আজ এই ভোজ-সভায় দত্তজার খোরাকের বিপুল বহর দেখিয়া, সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে তাঁহাকে খেতাব দেওয়া হইল 'খোরাশানী'। তন্ময় চাটুয্যে

তখন আড়াই সের আন্দাজ উদবস্থ করিয়াছেন, চপ্ ছাড়িয়া ফ্রাই try করিতেছিলেন। এমন সময় 'খোরশানী' খেতাবটা কর্ণে প্রবেশ লাভ করায়, তাহার চট্‌কা ভাঙ্গিল, সঙ্গে সঙ্গে হরদম ঐ কথার আবৃত্তি ও হাস্য আরম্ভ হইল। হরিপদও তাহাতে যোগ দিল। আমি অবাক হইয়া গেলাম, কারণ হরিপদ আদৌ বে-আদব্ ছিল না— বিশেষ আমাদের সমক্ষে।

দেখি, পঞ্চানন বেশ গম্ভীরভাবে জ্যামের (মোরব্বার) পাত্রটা ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। তখন চাটুয্যের বৈকালিক ইঙ্গিত এবং পঞ্চানন ও হরিপদর তাহাকে অনুসরণের কথাটা স্মরণ হইল,— বুঝিলাম, নিশ্চয়ই আবদুল্লার আড্ডায় গিয়া ভোজপুরী ভাং খাইয়া মরিয়াছে। পঞ্চানন তাহাদের আরো পাকাইয়া তুলিবার ইচ্ছায় জ্যামের পাত্রটি সহজলভ্য করিয়া দিতেছে। আমি পাত্রটি অন্যত্র চালান করিয়া দিলাম। কিন্তু 'খোরাসানের' অবসান নাই।

অনেক করিয়া তাহাদের আবার আহারের দিকে মোড় ফেরান হইল। ইতিপূর্বেই চাটুয্যেকে 'ভোজ-ভৈরব' খেতাব দেওয়া হইয়াছিল,— আজ বোধ হয় সেই উপাধির উপদেবতা তাহার উদরে আসন গাড়িয়াছিলেন। সে নিমেষমধ্যেই প্রচুর cake (পিষ্টক) ও pudding (পায়েস্) ধ্বংস করিয়া পুনরায় পাকিয়া দাঁড়াইল। কেবল হাসে আর ব'লে— 'আচ্ছা,— বাঁড়ুয্যে মশায় 'পিনাং' কি?'

পঞ্চানন এতক্ষণ অতিকষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিতেছিল ; ভিতরে ভাংয়ের টান-ধরায়, Jockey-Cap-এর কার্ণিসের মত তাহার উপর পাটির দন্তগুলি বদনের বহির্দেশে হাজির হইয়াছিল। সে আর পারিল না ; টেবিলের নীচে মাথা গুঁজিয়া, হাসির ধাক্কায় টেবিল কাঁপাইয়া তুলিল। ক্রমে লম্বা ময়দানব-ছন্দ আরম্ভ করিয়া দিল। কেবলি বলে— 'ওঃ বাবা, লিহংচং-এর প্রেতাত্মা গোর ফুঁড়ে বেরুল নাকি? বলে— 'পিনাং কি?' চীনে পা না-দিয়েই চীনে বুলি চালিয়ে দিলে রে বাবা! সবাই 'র‍্যাংচ্যাং' বলুন— 'র‍্যাংচ্যাং' বলুন,— চীনে ভূতে চেপেছে!' আর বেদম্ হাসি।

মজুমদার ভায়া না-দেয় তাহাদের করিতে, না দেয় তাহাদের

থামাইতে। তাহার ইচ্ছা— আনন্দ বা মজাটা পুরো মাত্রায় উপভোগ করা। কিন্তু শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়ায় দেখিয়া, বোসজার সাহায্যে সেটাকে দমন করিতেই হইল। তবুও এক একবার ভিজে ছুঁচোবাজির মত, অকস্মাৎ দমকা-বেগে তাহা ফর্‌ফর্‌ ভর্‌ভর্‌ শব্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ-সম্বন্ধে এই পর্যন্তই ভাল।

যাহা হউক, ভোজের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। সে-সম্বন্ধে সকলেই প্রায় সমান সচেতন ছিলেন। টেবিল্‌ সাফ্‌ হইল ;এইবার দ্বিতীয় চ্যাপ্‌টার চলিবার কথা। আমোদের ঝোঁকে সকলেই সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম— 'আজ চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার পর কোন subject-ই (বিষয়ই) জমিবে না।'

বড় বাবুর বক্তব্যে বুঝিলাম,— বিষয়টা (কবিতাটা) সে-ক্ষেত্রে বিমলিন হইয়া মাধুর্য হারাইবে, কারণ, কাল চরণার্পণে চিনকে চরিতার্থ করিবার বন্দোবস্তে সকলকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। চীনে উপস্থিত হইলে, কিরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাও অনুমান করা কঠিন,— সুতরাং এ সুরলোকের সুর, যে গোলামলোকে কতটা বজায় থাকিবে, সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ। আজিকার এই অধীর আগ্রহটা মাটি হইয়া যাইলে,— কবিতাটাও তার যোগ্য সম্মান পাইবে না— ইত্যাদি। সম্মান সম্বন্ধে আমি এক প্রকার নির্ভয়ই ছিলাম।

দত্তজা খুব গম্ভীরভাবে, বড়বাবুর অভিমতটা অনুমোদন করিলেন। মজুমদার ভায়া ত মূলগায়েন ছিলেনই, পঞ্চানন ও চাটুয্যে চিতেন ধরিলেন। ফল কথা— আমি রেহাই পাইলাম না। বলিলাম— 'একটু মুখবন্ধ আছে ;শুনেছি পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতই নাকি সব্‌সে মিঠে ; তেমনি কবিতার সারাংশ সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই ইঙ্গিতের কাজ করে।

সময়াভাবে, আমার বক্তব্যটাও তাই সঙ্গীতেই বদ্ধ করিতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় কথা, যখন দেবীদের পা নিয়ে আলোচনা, তখন বিষয়টা 'মানভঞ্জনই' নিতে হয়েছে। তিনের নম্বর,— বিষয়টা যখন রাধার প্রেমই দাঁড়িয়ে গেল, তখন পদকর্তা মহাজনদের সম্মানরক্ষার্থে, প্রথম লাইনটা তাঁদেরি পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রজ বুলিতে আরম্ভ করেছি। ইতি---

এই বলিয়া, কাগজখানা মজুমদার ভায়ার হাতে দিলাম। পঞ্চানন তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রথম লাইন পড়িতে গিয়া ভায়া নিজেই পড়িয়া গেলেন. কথাটা অনুচ্চারিতই রহিল।

বোসজা গম্ভীরভাবে বলিলেন— 'কি সব ছেলেমানুষী কর, দাও, বাঁড়ুয্যে মশাই নিজেই পড়ুন।' মজুমদার করজোড়ে বলিল,— 'মাপ করুন বড়বাবু, পড়াটা যেন উপরের ডেকে গিয়ে হয়, এখানে ডিগ্‌বাজি খাবার জায়গা পাব না।' বোসজা বলিলেন,— 'না-না, তোমাদের এ-সব বাড়াবাড়ি ; একটু স্থির হয়ে শুনতে দাও।' পঞ্চানন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল— 'দিন্, আমিই পড়্চি।' দত্তজা বলিল— 'নাঃ বাঁড়ুয্যেই পড়ুক, তানা ত motion ঠিক হবে না।' মজুমদার বলিল— 'সে-বিষয়ে আজ কারুর দুখ্‌খু থাকবে না।'

বোসজা বিরক্ত হইয়া কাগজখানা লইয়া আমার হাতে দিলেন। আমি বলিলাম— 'এটা ঠিক্ ঠাকরুণ-বিষয় না হলেও, দেবী-বিষয় বটে,— এতে হাসি-তামাসা চল্‌তে পারে না। জানি না, মজুমদার ভায়া পূর্ব হ'তেই কেন আপনাদের prejudiced ক'রে দিচ্ছেন।

শুনিয়া সকলেই গম্ভীর হইয়া বসিলেন। সুরু করিলাম—

'একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!'

সর্বনাশ! বড়বাবু হইতে ছোটবাবু পর্যন্ত হাসির একটা হুল্লোড় পড়িয়া গেল। বলিলাম— 'তবে মাপ করুন, এ রইল।' চেষ্টা করিয়া সকলে একটু স্থির হইলেন।

"একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!"
অত ঘেঁসে যেওনাকো,— মরিয়া এখন রাধা প্যারী॥
চীনের রাধা পা' চালালে,
চোট্‌কে তোমার যাবে পীলে,
বেটক্করে লেগে গেলে
এক্কেবারে যাবে মরি॥

একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!
ও-নহে পদ-পল্লব,—
বিশুদ্ধ লৌহ ভৈরব ;
হাত বুলুতে সাধ্‌ যদি হয়—
(হরি) কর সে কাজ উকো (file) ধরি।
একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি॥

সমঝে কেষ্ট কর কাজ,
রাধার এখন্‌ পুরো ঝাঁজ,
ঐ steel frame-এর*— প্রেমের গুঁতো—
(তোমার) সইবে না হে বংশীধারী!
একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি॥

পড়াটা কোন প্রকারে শেষ করিলাম। সে-সময়টার ও তাহার পরবর্তী কিছুক্ষণের কথা বর্ণনা করা করাই সভ্যতা-সম্মত। আমাদের দারুভূত দত্তও যে এতটা মত্ত হইতে পারে, তাহারও প্রমাণ পাইলাম। যাহা হউক, আজ সকাল হইতে যে উদাস ভাবটা সকলের বুকে ভারের মত চাপিয়াছিল, সেটা হট্টগোলের মধ্যে হার্‌ মানিয়া একদম্‌ হটিয়া গেল।

জগতে সকল জিনিসের সারাটাই টিকিয়া থাকে, যেমন সংসারের সার 'যন্ত্রণা',—তেমনি চাটুয্যের 'পিনাং' ও মাদৃশ সাঁচ্চা কবির— 'একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি,'—আমাদের সুদীর্ঘ চিন-প্রবাসের অবসন্ন ও অবসাদিত মুহূর্তগুলির মকরধ্বজ হইয়াছিল।

রাত্রি বারটার পর যে-যার শয্যা লওয়া গেল ; চাটুয্যে তৎপূর্বেই লাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

*লোহার জুতোর—

৩১

রাত্রি আন্দাজ দুইটা হইবে ; রজনীর নিস্তব্ধতায় সহসা সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন কানে আসিয়া, ভাসা-ভাসা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। সবিস্ময়ে বালিস হইতে মাথা তুলিতে হইল। জাহাজখানা স্বয়ং স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক হইলেও, তাহার গর্ভমধ্যে কোনদিন কন্যারাশির গন্ধ পর্যন্ত পাই নাই ;— এ কেমন হইল! তবে কি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেমসাহেব সঙ্গেই আছেন! সম্ভবতঃ গর্ভবতী লজ্জায় নেটিভ্-নয়নের অন্তরালে বাস করিতেছিলেন ; কারণ ঐ কদর্য উপসর্গটা বিলক্ষণ সৌন্দর্যহানিকরও বটে।

ভগবানের এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমেরিকায় নাকি মেয়েরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। বোধ হয় সেকালে এইরূপ একটা বিভ্রাটের সূত্রপাত দেখিয়া, আমাদের দেবাদিদেব স্বয়ং এ-বিপদটি পেটে ধরিয়া, মামলাটা আপোসে মিটাইয়া লইয়াছিলেন। একালের প্রেসিডেন্ট তা পারিবেন কিনা জানি না।

অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি,— বড়বাবু আসিয়া ডাকিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখি— সঙ্গে আমাদের খাঁ-সাহেব (Purchasing Agent)। তবে ত মামলা সহজ নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম— 'ব্যাপার কি— এত রাত্রে!' বড়বাবু বলিলেন— 'কিছু শোনেননি কি!' 'কচি ছেলের কান্নার কথা বলচেন! ও বোধ হয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পুত্ নামক নরক হতে উদ্ধার হলেন,— আমাদের আর একটি মালিক বাড়্লো।— মুখ দেখতে হবে নাকি?'

বড়বাবু— তামাসার কথা নয় বাঁড়ুয্যে মশাই—

আমি— না হয় আনন্দের কথা হল ; এখন করতে হবে কি?

বড়বাবু— ওপরে হুলুস্থুল পড়ে গেছে,— চারদিকে পাহারা মোতায়েন্। একজন একজন করে সাহেব সঙ্গে, খানাতল্লাসী খালাসির দল (search party) বেরিয়েছে! খাঁ-সাহেব খুবই ভয় পেয়েছেন,—

আমার কাছে ছুটে এসেছেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম— ‘অত বড় দাড়ি— ওঁর ,আবার ভয়ের কারণটা কি?— সমুদ্রের হাওয়ায় এমন হয় নাকি?’

খাঁ সাহেব অতি কাতরভাবে বলিলেন— ‘হাসি মস্‌করার বাত নয়, বাবু,— আমি বড়ই বিপদ বোধ করছি।’

তাঁর বলিবার ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর আমাকে থামাইয়া দিল।

বড়বাবু— আপনি জানেন না! ফলোয়ারদের ভার (charge) যে ওঁর, উনি যে তাদের কাজ-কর্মের জন্য responsible (দায়ী)।

আমি— তা ত জানি, তাঁর সঙ্গে ছেলে-কাঁদার সম্পর্কটা কি!

খাঁসাহেব— বাবু সাহেব, আপনি ও বেইমানদের চেনেন না, এমন কাজ দুনিয়ায় নেই যা ওদের অসাধ্য। কম্‌বক্তরা স্ত্রীলোককে পুরুষের পোশাকে ‘চিত্রাল্’ অভিযানে পর্যন্ত (Chitral Expedition-এ) নিয়ে গিছলো! সে কি বিপদ! শেষ, দুজন ফলোয়ারের Court-martial (সামরিক আদালতে বিচার) হয়। তাতে বদ্‌মাইস্‌রা বল্লে কিনা— ‘এজেন্ট্ অনন্তরামবাবুর জন্যে তাদের এ কাজ করতে হয়েছে, তানা তা চাকরী পায় না।’ মাগীটাও তাতে সায় দিলে। অনন্তরামবাবু বৃদ্ধ প্রাচীন লোক, অতি সজ্জন ; তিনি ছিলেন গমস্তা (agent), হুলুস্থূল পড়ে গেল। কর্ণেল সাহেব তাঁকে ভাল রকম জানতেন, তাই অনেক করে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু বদনামের বাকি রইল না। তিনি retire করলেন (পেন্‌সন্ নিলেন) আর সেই আঘাতে এক বৎসরের মধ্যে মরেও গেলেন।

বেইমানরা কিন্তু বেত খেয়ে, নাম বদলে, বরাবর বেশ বহাল হচ্ছে। এ দলেও যে সে জালিমরা নেই, তা কে জানে। আল্লা মিঞার কি মর্‌জি জানি না—, বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। তিনি স্বধর্মপরায়ণ নেমাজী মুসলমান, নির্বিরোধী এবং শান্তপ্রকৃতির লোক।

তাঁহার কথা শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া, ছেলে-কাঁদার গুরুত্বটা উপলব্ধি করিয়া ভীত হইলাম। দেখি বড়বাবুর মুখও পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম— তিনিও ভয় পাইয়াছেন,— পাইবারই কথা ; কারণ, বড়দের ধরিয়াই লোক বাঁচিবার চেষ্টা করে। বদমাইসরা কাহার উপর কৃপা

করিবে কে জানে ; এক্ষেত্রে তিনিই সবার বড়।

বলিলাম— "আবদুল্লাকে একবার ডাকান্।" বুঝিলাম,— কেহই সে সাহস পাইতেছেন না। জাহাজের লোক্ নেটিভ্দের উপর নজর রাখিয়াছে ; আবদুল্লাকে ডাকিয়া শেষে সন্দেহে না পড়িতে হয়, ফ্যাঁসাদ না ডাকিয়া আনা হয়। একটু দৃঢ় ভাবেই বলিলাম— 'আপনাব নিজেরই ত তদন্ত করা উচিত ; আপনি হচ্ছেন এ-জাহাজের non-combatant যাত্রীদের মধ্যে সবার উপর, পাঁচশ' টাকার অফিসার, আপনার authority (অধিকার)-ও আছে, responsibility (দায়িত্বও) আছে— যান্ সরাসরি চীফ্ সাহেবের কাছে চলে যান্ ; তাঁকে সাহায্য করা ত আপনারই কাজ।'

শুনিয়া বোসজা একটু যেন সামলাইলেন, বলিলেন— 'তা আমি রাজি আছি, কিন্তু কি বলব !' বলিলাম— 'বলবেন আমরা সকলেই অপ্রত্যাশিত শব্দে চম্‌কে গিছি, কিছু ঠাওরাতে পাচ্চিনা, তাই আপনার কাছে এলাম। কারণ এ সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব সবার চেয়ে বেশী। আমি ফলোয়ারদের মধ্যে একজনকে ডেকে private enquiry (গোপন অনুসন্ধান) করতে চাই ; আপনি কি বলেন? এই রকম যা-হয় একটা বলবেন ; ছোট হবেন না। গোড়াগুড়ি ঐ সাত-সিকে জোড়ার ধুতি পরেই ত সব মাটি করে রেখেছেন।'

তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটিল, বলিলেন— 'তার পর? আবদুল্লা যে কিছু বলবে, তার ঠিকানা কি? তাকেই আপনি ডাকতে বলচেন কেন? বরং একজন নির্বোধ গো-বেচারাকে ডাকা ভাল নয় কি?

বলিলাম— 'আমার ধারণা— ধারালো অস্ত্র ছাড়া এ-সব মামলায় সুবিধে হয় না। ভোঁতা অস্ত্রে মামলা থেত্‌লে বিগড়ে যাবে! এর মধ্যে যদি কিছু থাকে ত তা আবদুল্লার অগোচর থাকতেই পারে না। মাটির মুরোদগুলিকে সে তার পাত্তাও দেবে না ;—সে লোক চেনে।'

বোসজা— তবে আমি যাই?

আমি— নিশ্চয়ই, দেখচেন না চারদিকে কানাঘুসো চলছে—

বড়বাবু দুর্গা বলিয়া পা বাড়াইলেন। খাঁ-সাহেব 'আল্লা মালিক' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন।

৩২

তখন জাহাজময় একটা বিস্ময় ও রহস্য-ভেদের আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। ভয়-ভাবনার ভাবটা কেবল খাঁ-সাহেব আর বড়বাবু ভাগাভাগি করিয়াছেন। কোথাও কোথাও জমায়ৎ-মধ্যে হাসি-তামাসাও চলিয়াছে।

বড়বাবু যখন আপার-ডেকের সিঁড়িতে উঠিতেছেন, দেখি আমাদের পূর্বপরিচিত 'মউজী' মিস্টার সিঙ্গালী, অসম-পদে উপর হইতে নামিতেছে।

কিছু পূর্বে প্রায় সকলেই কেবিনের বাহিরে আসিয়া ব্যাপারটা লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়াছিল। আমার জাহাজে জোটা ইউরেসিয়ান মিস্টারটি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন— 'তোমাদের heronieটি (নায়িকাটি) কোথায়? I have come to congratulate (আমি আনন্দ জানাতে এসেছি)। New let me bless the child (নবজাত শিশুটিকে আশীর্বাদ করতে দাও)।' বলিলাম— Just come to the mirror and you will find her (আর্সির সামনে দাঁড়াইলেই তাঁকে দেখতে পাবে।)

মিস্টারটির বয়স বিশ বাইশের বেশী নয়, গোঁফ্ গজায়নি, হাতটা কিন্তু সেইখানেই থাকে, সর্বক্ষণ টানাটানিও চলে।

মিস্টার সিঙ্গালী সোজাসুজি আসিয়া, মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল,— 'Be not afraid Mr.—Keep yourself ready and steady to meet the Chief. He will be here presently to examine you'— (চীফ্ সাহেব এখনি এখানে আসচেন তোমায় পরীক্ষা করতে, ভয় খেওনা)।

মিস্টার— (সবিস্ময়ে) To examine me,—what for? (আমাকে পরীক্ষা করতে।— কারণ।)

মিস্টার সিঙ্গালী— They have taken you for a—disgraceful

indeed! Cheer up, we are all with you. (ছিঃ তাঁরা তোমাকে কি দেখে এমনটা ঠাওরালেন! আমরা সব তোমার পক্ষে রইলুম, কিছু ভেব না)।

ঠিক এই সময় চীফ্ সাহেবকে সিঁড়ির উপর বড়বাবুর সহিত কথা কহিতে দেখা গেল। কথায় কথায় চীফ্ সাহেব একবার নীচের দিকে আঙ্গুলীনির্দেশ করিলেন ;ইঙ্গিতটা ঠিক্ যেন আমার মিস্টারটির প্রতিই হইল! মিস্টার সিঙ্গালী বলিল— 'Have you noticed? I can swear'— (লক্ষ্য করেছ!— আমি শপথ করতে পারি—)

যেই এই পর্যন্ত শোনা, আমার মিস্টারটি কতকগুলি bloody বুলি উচ্চারণ করিতে করিতে চীফ্ সাহেবের কাছে ছুটিল। মিস্টার সিঙ্গালীও 'a funny fool' (মজাদার নির্বোধ) বলিয়া, নিজের দলে গিয়া হাসি-তামাসা জুড়িয়া দিল। সে অধিকাংশ সময়টাই এই ভাবে কাটাইত।

বড়বাবু আসিয়া বলিলেন— 'আপনার ইউরেসিয়ান মিস্টারটি কি পাগল! চীফ্ সাহেবকে বলে কিনা— 'আপনি কি নজিরে আমাকে মেয়েমানুষ ঠাউরেছেন?' শুনে তিনি ত অবাক! তাঁদের মধ্যে একটা হাসি পড়ে যাওয়ায়, পূর্বের দৃঢ় ভাবটা একটু শিথিল হয়ে আসতেই, সেই ফাঁকে আমি অনুমতিটা আদায় করে নিছি। এখন যা হয় করুন।'

৩৩

ফলোয়ারদের আস্তানায় বা আড্ডায় গিয়া দেখি, স্ফূর্তির উনিশ-বিশ ঘটিয়াছে। দু' এক জন গাঁজা টিপিতেছে বটে কিন্তু উৎসাহ কম। আবদুল্লা আসিয়া সেলাম করিল, আমি হাসিয়া বলিলাম— 'কি সর্দার, খবর কি, সব খ্যায়ের (কুশল) ত?' আবদুল্লা আমার সহাস্য স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া, একটু যেন বল পাইল; বলিল— 'মামলা কেয়া হায় হুজুর?'

আমি হাসিয়া বলিলাম— 'মামলা আবার কি? তোদের সে ভাবনা কেন?'

আবদুল্লা আশ্বস্ত হইয়া বলিল— 'তোভি বাত ক্যা হ্যায় হুজুর?'

বলিলাম— 'ওরা ত আমাদের চেনে না, একটুতেই ভয় পায়। বাইরে বন্দুক নিয়ে হুট্‌পাট্ করতে পারে, আর বাড়ীতে মেম সাহেবের গোলামী করতেই জানে! বলে— 'জাহাজে বাচ্চার কান্না এল কোথা থেকে,— ভূত নয় ত!' এই বলিয়া আমি হাসিতেই, আবদুল্লা হাসিয়া বলিল— 'এই বাত্। বাচ্চাকে টেঁ টেঁ শুন্‌তেহি এহি,—আভি বুড্‌ঢাকে নেহি শুনা। শুনাদে হুজুর?'

হঠাৎ আমার ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ভাবনা উৎকণ্ঠার টান্‌গুলা সহসা শিথিল হইয়া পড়িল। তাই নাকি? আবদুল্লা ত সকল বিদ্যাতেই ওস্তাদ,— ব্যাপারটা কি তারই অনুকরণবিদ্যার ফল! এতবড় গুরুতর বিষয়টা কি তার 'হরবোলামী' ছাড়া আর কিছু নয়?

বলিলাম— 'এখন নয় আবদুল্লা; কিন্তু কাপ্তেন সাহেবকে ঐ কান্নাটা না শোনালে তাঁর ভয় ভাঙ্গবে না, লোকটা ভারি ভীতু আর কিছু বড়িয়া মাল থাকে ত, তারও দু-একটা শুনিয়ে সকলকে খুস্ করে দিতে হবে। পারবি ত?'

আবদুল্লা বুক ঠুকিয়া বলিল— 'ওস্তাদ্‌কে কৃপাসে হাজ্জারো হায় হুজুর,— আপ হুকুম দিজিয়ে না।'

হাসিয়া বলিলাম— 'তোমার আবার ওস্তাদ্ আছে নাকি?' আবদুল্লাও হাসিল। সকলকে উৎসাহ দিয়া ও 'মউজ' করিতে বলিয়া ফিরিলাম।

আসিয়া দেখি খাঁ-সাহেবের মুখ বিবর্ণ, বড়বাবুও বিশেষ চিন্তাকুল। সকলকে অভয় দিয়া রিপোর্ট দাখিল করিলাম। উভয়ে যেন বদ্ধ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলেন। খাঁ সাহেব আমার মস্তকে বাছাবাছা ফারসী [illegible]র' আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন ও খোদাকে বারবার স্মরণ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্র হইলেন। ক্ষণিক স্তব্ধ-বিস্ময়ের পর বড়বাবুর মুখে হাসি দেখা দিল,— বলিলেন— 'বেটা ওস্তাদ বটে।'

বলিলাম— 'এখন আপনি যা হয় করুন; চীফ্‌সাহেবকে রিপোর্টটা দিয়ে আসুন। কিন্তু দেখবেন— আবদুল্লার উপর কোনরূপ কটাক্ষ না আসে। তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন—তারা গাঁজার নেশায়, নিজেদের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ করছিল মাত্র, তাতে যে এতটা দাঁড়াতে পারে, তা তাদের মাথায় আসেনি। তা' ছাড়া— জাহাজে আজকের রাত্রিটাই শেষ রাত্রি, এ হাঙ্গাম আর তাঁদের পোহাতে হবে না।'

বড়বাবু এবার উৎসাহের সহিত যাত্রা করিলেন।

জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে নেটিভ ক্রিশ্চান ছাড়া সাহেববেশধারী ইহুদি, পার্শী প্রভৃতিও ছিলেন। সকলেই একটা বড় রকম development (বাড়াবাড়ি) ও finding-এর (ধরপাকড়ের) আশায় হাঁ করিয়া ছিলেন, এবং নেটিভদের নাকাল হইবার ও লাঞ্ছনার মজাটা উপভোগের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াও উঠিয়াছিলেন। জানি না এমনটা কেন হয় শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন— 'আমরা এক আত্মবিস্মৃত জাতি।' বোধ হয়। পোশাকের মধ্য দিয়াই এই ভাবান্তরটা ঘটিয়া আসিতেছে, বেশান্তরই ভাবান্তর আনিয়াছে।

বোসজা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন— 'কাপ্তেন সাহেব আর চীফ্ সাহেব কান্নাটার পুনরাভিনয় না শুনে, বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন; তাঁরা সব দল বেঁধে আসছেন। আপনার আবদুল্লাকে ডাকুন।'

ভাবিয়াছিলাম, এরূপভাবে পরীক্ষা দিতে আবদুল্লা ভয় পাইবে। দেখি— সে যেন তাহাই চাহিতেছিল; স্ফূর্তির সহিত আসিয়া হাজির

হইল ; সাহেবেরাও উপস্থিত হইলেন। সে তখন এক মিলিটারি সেলাম ঠুকিয়া চীফ্ সাহেবকে বলিল— 'হুজুর, আমাকে একটু পর্দার পেছনে থাকতে হুকুম দিন্, সামনে ইয়ে কামকা মজা উড় যাতা।' সাহেবেরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, বিশেষ পরীক্ষান্তে, একটা খালি কেবিন্ তাহাকে দিলেন।

আবদুল্লা পুরাতন পাপী। কাহারও নিকট তাহার শঙ্কা-সঙ্কোচ কমই ছিল। সে সেলাম করিয়া কেবিনে প্রবেশ করিবার সময় সাহেবদের বলিল— 'হুকুম হোয়ে তো আউর ভি কুছ শুনায়েঙ্গে হুজুর।'

* * * *

আবদুল্লা আসিবার সময় বোধ করি কেহ কেহ তাহার উপর আসামীর উপহাস বর্ষণের আনন্দ ও লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এইবার নেটিভদের nasty (নোংরা) রহস্য রাষ্ট্র হইবার ও তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, দু-একজন এক-এক পদ অগ্রসর হইতেছিলেন,— এতক্ষণ সাহস পান নাই। পরে আবদুল্লাকে কেবিনমধ্যে অবরুদ্ধ করায়, অনেকেই 'ডবল্-মার্চ' করিয়া, আবদুল্লা-সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন।

আবদুল্লার সদ্যোজাত শিশুর কান্না এতই স্বাভাবিক হইল যে, সকলেই এদিক ওদিক, উপর নীচে, পরে পরস্পরের মুখের প্রতি, নির্বাক্ বিস্ময়ে তাকাইতে লাগিলেন। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে, কোন কোন মিস্টারের মুখ ফ্যাঁকাশে, আর উৎসাহটা ফিকে মারিয়া গেল।

তাহার পর দুষ্ট, এক অভিনব অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল। বিষয়টা— 'মিস্টার ডি-মার্টিন ও বিবি— সুখীয়া ধোবিন্!' তাহা এতই উপভোগ্য হইয়াছিল যে, কড়ামেজাজের কর্মচারীরা পর্যন্ত ছেলে-মানুষের মত হাসি ও হাততালি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ণনাটা সকল বর্ণের সমান প্রীতিকর নহে বলিয়া বাদ দিলাম।

আবদুল্লা কিছু পুরস্কারও পাইল। একজন বলিলেন— In Europe

he could have earned forty pounds a month (য়ুরোপে হলে লোকটা মাসে হাজার টাকা উপায় করতে পারত।)

যাহারা প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের— 'হোগিয়া—যাও' বলিতে বলিতে চীফ্ সাহেব উপরে চলিয়া গেলেন।

জগতে সকলেই একটা শাসালো কিছু চায়। এত বড় আয়োজন আর উৎসাহের পর, ব্যাপারটা যে এমন ফাঁকা দাঁড়াইবে, কেহ তাহা আশা করে নাই; তাই উপসংহারটা উপভোগ্য হইলেও, দেখা গেল—অধিকাংশের কাছেই সেটা যেন বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাহারা ক্ষুব্ধও হইল।

খাঁ-সাহেব নিশ্চিন্ত মনে নেমাজে গেলেন; আমরা শয্যা লইলাম। তখন ভোর হয় হয়।

৩৪

আমাদের চিন-যাত্রার শেষ রাত্রি কখন শেষ হইল জানি না। যখন অপার ডেকে আসিলাম তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গের ভৈরবদের ঘুম ভাঙ্গিল সাড়ে আটটায়। আজ চায়ের মজলিস্ বসিল নয়টার পর।

রাত্রের ঘটনা লইয়া আলোচনা চলিল। এমন মজাটা উপভোগ করা হইল না বলিয়া মজুমদার ভায়া ক্ষতি বোধ করিলেন ও বলিলেন— 'হায় হায়—কান্নাটা আমার কানে গিয়েছিল হে!' পঞ্চানন পস্তাইতে লাগিল।

বলিলাম— 'খোদ্ কর্মকর্তা— আমাদের সঙ্গেই রহিল, কত শুনবে শুনো।'

আবদুল্লার উল্লেখ পর্যন্ত দত্তজার অরুচিকর ছিল। তাঁর এই অসার খলু সংসার পার হইবার একমাত্র কর্ণধার যে, 'হক্‌শ্লী-স্পেন্সার্' এইটাই তিনি সকল আলোচনার মধ্যে গুঁজিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন। তাই সাজপরা সাহেবদের প্রতি আবদুল্লার ইঙ্গিত সম্বন্ধে, তিনি বেজায় চটিয়া সেই সার্‌মন্ (sermon) সুরু করিতেই, যথা—What is life but reputation and character' (চরিত্র আর খ্যাতিই জীবন) মজুমদার ভায়া শূন্যে তাকাইয়া একটু নীচু গলায় উচ্চারণ করিলেন— 'শুধু একটা 'ইঃ' আর একটা 'উঃ' আর একটা 'আঃ,' এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ!' 'Nonsense' বলিয়া দত্ত বড়-কথায় ঝুঁকিতেই বোসজা বলিলেন— 'দত্ত, এখানে তোমার ও-সব বড়-কথা কেউ বুঝতে পারবে না ভাই, বৃথা অপব্যয় কোরোনা; বরং ভারতচন্দ্রের ভাঁড়ার থেকে কিছু শোনাও। আবদুল্লা অশিক্ষিত লোক,— শিক্ষাভিমানীরা তাকে না ঘাঁটালে— মেড়ার শিংয়ে হীরের ধার ভাঙ্গে না। ও হীরের কদর বুঝবে কি?'

মজুমদার ভায়া মজা-লোলুপ লোক, সে বলিল,— 'তবে, শিক্ষিতমণ্ডলীর ভিতরে আমার একটা আবেদন আছে। গত রাত্রের দু'টো কথা এখনো লজ্জা দিচ্চে, অর্থ ঠাওরাতে পারচি না। লেখাপড়া শিখে,

অর্থ বুঝলাম না অথচ হাসলুম, এটা আত্ম-প্রবঞ্চনা করা, আর অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হ'ল না কি? কথা দুটো যখন কাজে লেগেছিল, তখন বাজে হতেই পারে না।'

বলিলাম— 'কি এমন কথা হয়েছিল? কই কিছু ত মনে পড়ে না ভায়া।'

মজুমদার ভায়া বলিল— 'সে কি হে? চাটুয্যে ত তোমাকেই বার বার প্রশ্ন করেছিল— 'বাঁডুয্যে মশায় 'পিনাং' কি?' কই, সে উত্তর পায়নি ত। আবার পঞ্চানন চীনে-ভূতের ভয় থেকে বাঁচবার রক্ষা-কবচ বাতলেছিল— 'র‍্যাংচ্যাং'! সবাই তখন হেসেছিলুম। লোকে অর্থ বোধান্তেই হাসে। আমায় মুখ্খু বল দুখ্খু নেই, আমি কিন্তু না বুঝেই হেসেছিলুম। এখন অর্থটা কেউ দয়া করে বলে দিন্।'

শ্রবণান্তে 'সাধু সাধু' রব পড়িয়া গেল। 'বলিলাম— বর্তমানে এরূপ বিনয় বড়ই বিরল! ভায়ার মতলবটা— পুনরায় পিনাং আর র‍্যাংচ্যাং চর্চ্চা।'

অনেক আলোচনা আর আঁচাআঁচির পর— 'হক্স্লী' হটিয়া গেলেন— দত্ত অশক্ত হইলেন। শেষে বলিলেন-- rubbish (রাবিস্)।

'পিনাং' ও 'র‍্যাংচ্যাং' শব্দগুলি অনুস্বর লইয়া উপস্থিত হইলেও 'শব্দকল্পদ্রুম' ইহাদের অল্পই সংবাদ রাখেন।

গত রাত্রের শব্দগুলির প্রয়োগকর্তারা উপস্থিত থাকিলেও, নিদ্রান্তে এখন তাঁহারা সে প্রতিভা হারাইয়াছেন। মজুমদার ভায়াও মজলিস্ ভাঙ্গিতে নারাজ,— মহা মুশকিল!

অবস্থা, সময় ও স্মৃতি এই ত্র্যহস্পর্শ সংঘর্ষে মস্তিষ্ক মথন করিয়া শেষ রোগীরাই অর্থোদ্ধারে সাহায্য করিলেন।

বুঝিলাম— 'পিনাং' শব্দটি ইংরাজি 'oponion' শব্দের অপভ্রংশরূপে তৎপরিবর্তেই উপস্থিত হইয়াছিল।

আর 'র‍্যাংচ্যাং' চীনের 'রামচন্দ্র'-জ্ঞাপক! (অবশ্য,—অনুমানসিদ্ধ)

তখন উচ্চ হাস্যে সভা ভঙ্গ হইল। বলিলাম— 'আমাদের ইতিহাসে নবাবী-আমলের আজ এই খতম্। এইবার আহারান্তে— 'যে যার ঘটিবাটি সামলা'!'

৩৫

মধ্যাহ্নিক আহারাদি সমাপনান্তে উপরের ডেকে আসিয়া দেখি,— চতুর্দিকেই একটা ব্যস্ততার হাওয়া বহিয়াছে, নাবিকেরা পাল গুটাইতেছে— মাল সামলাইতেছে; একটা কেমন পরিবর্তনের ভাব! ইউরেসিয়ান সাহেবরা সশব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিতেছেন ;— দেখি বুটে ব্রঙ্কো লাগাইয়া, কেশ আঁচড়াইয়া বেশ বদলাইয়া আসিলেন। ঘন ঘন কোটেরমুড়ো টানিয়া কোঁচ্ মারিতেছেন, আর পা'গুলো নানা angle-এ ফাঁক করিয়া অস্বস্তির টান্‌গুলো শিথিল করিতেছেন।

আমাদের সব কাজই 'কাল' বলিয়া কথাটার আশ্রয়ে আরাম লাভ করে। 'কাল' আছে তাই 'আজ' কাটে। 'কালের' দোহাইটাই রেহাই পাবার রাজপথ! সুতরাং বিনা amendment-এই স্থির হইল— 'কাল কাপড় ছাড়া যাবে।' অর্থাৎ কে আর নড়ে-চড়ে।

দেখি ফলোয়ারেরা যে-যার তল্‌পি-তল্‌পা বাঁধিয়া প্রস্তুত। সেগুলি শিবলিঙ্গের মত সম্মুখে রাখিয়া, হরদম্ গাঁজা চড়াইতেছে।

যে দিকে চাই— দশমীর দশা, বিজয়ার ভাঙ্গা উৎসব। একটা ঘোলাটে ভাব। আনন্দ অপেক্ষা নিরুৎসাহেব মাত্রাই অধিক। মধ্যে মধ্যে পক্ষীর সাক্ষাৎও পাইতেছি। ভূরাজ্য নিশ্চয়ই সন্নিকট।

আমরা সাতটি বাঙ্গালীতে, জাহাজে আজ মাসাবধি কাল ঘরকর্‌না করিতেছিলাম। আজ নড়িতে হইবে, এ আবার কি উৎপাৎ ;— এইটাই যেন বোধ হইতেছিল। মানসিক অবস্থাটা এমন দাঁড়াইল, যেন আমাদের জাহাজ হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। ডাকিয়া খাওয়ায়,— বাকি সময়টা— বিচরণ, উপবেশন, গল্পগুজব আর শয়নে ইচ্ছামত কাটে। এর মমতা কাটাইতে একটু ক্ষমতার খরচ হয় বই কি। সংসার, সমাজ, বিষয়-কর্মাদি কিছুই ছিল না ; 'চাল নাই'— এ কথা কেহ বলে না ; মেয়েটার জ্বরও হয় না! একেবারে পরমহংস অবস্থা।

ঘন ঘন বংশীধ্বনির পর, জাহাজের ক্রমে মন্থর গতি আরম্ভ হইল। জেলেরা দূরে-দূরে ডিঙ্গিতে পাল তুলিয়া, জাল ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কয়েকখানি আধা-ইস্টিমার, ফ্ল্যাট্ বোট— আমাদের দিকে আসিতেছে দেখিলাম। জাহাজের গতি মন্দ হইয়া জাহাজ থামিল, সেগুলিও আসিয়া পৌঁছিল।

কিনারার চেহারা ত চক্ষে ঠেকিল না, কিন্তু হড়্ হড়্ শব্দে নোঙ্গর নামিয়া পড়িল। আগন্তুক স্টিমার হইতে একটি উচ্চ ইংরাজ কর্মচারী ও একটি কোট-প্যান্টের উপর Cap-ধারী, আমাদের জাহাজের উপর আসিয়া উঠিলেন। শেষেরটিকে বাংলাদেশের বস্তু বলিয়াই বোধ হইল।

চারি চক্ষু এক হইতেই অপাঙ্গে যেন একটু সাদর-আভাস পাইলাম। ভাবটা— 'আসুন্, সুখ-দুঃখটা ভাগাভাগি করা যাক্।' আমাদের অনুমান ভুল হয় নাই ; পরিচয়ে জানিলাম, ইনি লাহিড়ী মশাই। ওজনে মোনটাক্ হইবেন! এই শরীরে— দাদখানির চাল আর রাজধানীর মাল ছাড়িয়া কি সাহসে যে চীনে মাল-সামাল করিতে Tally-Clerk হইয়া আসিয়াছেন, বুঝিলাম না। পাকাচাকরীও নয়, বয়সও কম। পেটের জ্বালায় কালাপানী পার হইয়াছেন কি adventurous spirit-এ (দেশ-বিদেশ মারা রোগে) আসিয়াছেন, জানি না। যদি শেষেরটি হয় ত আশার কথা এবং 'বাঢ়ম্'।

জাহাজের কাপ্তেন আর চীফ্-সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আগন্তুক অফিসারটি একবার উপর-নীচ দ্রুত ঘুরিয়া যাত্রীদের বলিয়া গেলেন— 'জাহাজসে জল্দি উতর্ পড়ো?'

কোথায় 'উতর্ পোড়বো,'— জলে নাকি? জাহাজ ত সমুদ্রে, সীমারও সন্ধান নেই। এই অস্তমুখী সময়ে, উৎসাহশূন্য অবস্থায় একটা কথা মনে পড়িল, কিন্তু অনুচ্চারিতই রহিয়া গেল। ফতেপুরে এক ফিরিঙ্গি সাহেব কোন এক আপিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ ছিলেন। মেম সাহেবের সঙ্গে টিফিন্ করিতে রোজ বাংলায় যাইতেন। একদিন একটা জরুরি কাজ পড়ায় ক্লার্ক নীলকমল বাবু কাগজপত্র লইয়া টিফিনের সময় বাঙ্গলায় উপস্থিত হন।

নীলকমল বাবু সরাসরি দ্বারে উপস্থিত হইতেই সাহেব হাঁকিয়া বলিলেন— 'লীলকমল, নীচু যাও।' বাঙ্গলার দরজা রাস্তার সঙ্গে একই level-এ (সমক্ষেত্রে) ছিল ;— নীলকমল 'নীচু' খুঁজিয়া পায় না ; মহা মুশকিলে পড়িয়া বলিল,— 'এর চেয়ে নীচু যে খুঁজে পাচ্চিনা সার্।' সাহেব আগুন। 'হাম দেখাতা হায়' বলিয়া যেই ওঠা, নীলকমল— টেনে ছুট্। এখানে সে সুযোগও নাই।

যাহা হউক, লাহিড়ী মশাই বলিলেন— 'ফলোয়ারের ফ্ল্যাটে নেবে পড়ুক। তারপর আপনারা iunk-এ (চীনে-স্টিমারে) গিয়ে বসুন। আমি আপনাদের মালপত্র নাবিয়ে দিচ্চি।' বলিলাম, 'আমাদের মালই বলুন, আর মালের মালিকই বলুন, ঐ চাটুয্যে মশাইটি ; ওঁর ট্রঙ্কটি একটু সাবধানে নাবিয়ে দেবেন, সেটিকে নমস্কারও করতে পারেন, সেটি আমাদের মাতৃ-মন্দির, খাঁটি মাতৃ-ভূমিতে ভরা।' লাহিড়ী মশাই একটু অবাক্ থাকিয়া বলিলেন— 'আপনারা ভাববেন না, আমি খুব সাবধানে নাবিয়ে দেব,— কি ঠাকুর বল্লেন্?'

বলিলাম 'সে ক্রমশঃ শুনবেন্ ; আগে বলুন ত এখন যেতে হবে কোথায়?' লাহিড়ী মশাই বলিলেন— 'আপাততঃ Hsinho-এ (সিন্হোয়), সেটা আমাদের out-post (বাহিরের আড্ডা), তারপর কাল ট্রেনে Tienstin (টিয়েন্সিন্) যাবেন,— সেটাই Head Quarters (মূল আড্ডা)। বলা বাহুল্য, সিন্হোও যত বুঝিলাম, টিয়েন্সিন্ও ততই। তবে এটা বুঝিলাম বটে যে আপাততঃ টিয়েন্সিনে আমাদের ড্রপ-সিন্ (যবনিকা) পড়িবে।

দেখি ইতিমধ্যে সরকারী-কুর্তি পরিয়া, ফুর্তি করিয়া Haver-sack (রসদের ঝুলি) সহ নবশাখ্ নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ;— কাহারো হাতে, কাহারো কাঁধে, ঝোলা-ঝুলি, প্যাঁট্রা-পুঁটলি, সারেঙ্গি, বাঁয়া, তবলা, হুড়ুক, মাদল্, গোপীযন্ত্র ; আর সকলেরি হাতে হুঁকো-কল্কে,— এক একটি কল্কি-অবতার। যেন বক্কেশ্বর পাইনের যাত্রার দল গাওনা বায়না পাইয়া পদ্মা-পারে রওনা হইতেছে। জবর সমর-যাত্রা বটে! এই ভাবে ফলোয়ারেরা গিয়া ফ্ল্যাট ভরাট করিয়া

ফেলিল।

এইবার আমাদের পালা। তার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। জাহাজের স্টুয়ার্ড বট্‌লার হইতে অপরাপর কর্মচারী পর্যন্ত আপনার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক মাসের ঘরকন্না ও আলাপ পরিচয়ের পর বিদায় লইতে উভয় পক্ষকেই কষ্ট অনুভব করিতে হইল। ব্যথা-বোধটাই সাধারণ বিদায়ের প্রধান অঙ্গ,— তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে পাইল না। 'ক্লাইভ'কে সাত সেলামান্তর আমরা জাহাজ ছাড়িয়া একে একে 'জঙ্কে' নামিলাম। এত দিনে বত্রিশ সিংহাসন ভাঙ্গিল। কেবল,— খালি একখানা শূন্যগর্ভ লোহার-খোল ভাসিতে লাগিল।

৬

একমাস বাঁধা-খোরাকে থাকিয়া ও বিক্রমাদিত্যের বৈঠকখানা বজায় রাখিয়া, যখন জঙ্কে ও ফ্ল্যাটে নামিয়া নূতন ব্যবস্থায় যাত্রা করা গেল, তখন গুড়ের নাগরীর অবস্থাই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তখনো ঘণ্টা খানেক বেলা আছে; কিন্তু কূলের কোন পাত্তা নাই,— তিনি কাছে কি গাছে তাহাও বলা কঠিন। শুনিলাম, এখানে জল অগভীর বলিয়া বড় জাহাজ চলিতে নারাজ বা অচল; তাই সাত মাইল থাকিতেই আমাদের বিদায়ের এই ব্যবস্থা।

এই সজল সাত মাইল জলমগ্ন কিনারাটিকে Taku Bar (টাকু বার) বলা হয়। ইনিই এখানে হার্‌বারের (বন্দরের) কারবার করেন;— জাহাজকে অগ্রসর হইতে বাধা দেন বলিয়াই 'Bar' উপাধি পাইয়াছেন।

ফ্ল্যাট লইয়া জঙ্ক্ কখন বক্র কখন চক্র গতিতে চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা, পরে অন্ধকার,— সঙ্গে সঙ্গেই ফিকে মেঘ আর হাওয়া। এই নূতন যাত্রা একমাসের সুখপুষ্ট শরীরে দুঃখের মাত্রা ক্রমেই বাড়াইতে লাগিল; কখনও উঠা, কখনও বসা, অস্বস্তির একশেষ।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনের তেজটাও যেন নিবিয়া গেল। সকলে অবসন্ন আর মনমরা হইয়া পড়িলাম। টুক্‌রো টুক্‌রো এলোমেলো চিন্তা, আর দুর্বল দুর্ভাবনাগুলো আসিয়া অবস্থাটাকে অসহনীয় করিয়া তুলিল। সকলেরই মনে হইতে লাগিল— জাহাজে বেশ ছিলাম। অতবড় ভীষণ অতলস্পর্শ জলধির পারে পৌঁছিবার আনন্দ একটুও অনুভব করিতে পারিলাম না। পুরো পাঁচ ঘণ্টা একটানা হাওয়া, একঘেয়ে জল-কল্লোল, আর ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার, যম-পুরীর পথের আভাসই দিতে লাগিল।

এই অবস্থায়— সেই আকূল পারাবার, বিপুল ব্যবধান, পার হইয়া সকলেরই চিত্ত এক-একবার ক্ষিপ্তের মত, নিজ নিজ পল্লীভবনে স্ত্রী-

পুত্রের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া শান্তি খুঁজিয়াছে; আবার মুহূর্তেই অসহায় মুমূর্ষুর মত হাত পা ছাড়িয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এইখানেই দিনে আর রাতে তফাৎ। দিনের আলোটা যে মানুষের কত বড় বল, মানুষের মনে সে-যে কতটা শক্তি সঞ্চার করে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কবি সকলের ভাবনাই ভাবেন,— সহৃদয় সত্যেন্দ্রনাথ তাই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

'আশা রেখো মনে, দুর্দ্দিনে কভু
নিরাশ হ'য়োনা ভাই,
কোন দিনে যাহা পোহাবেনা হায়
তেমন রাত্রি নাই।'

কথাটা কাহারো অজানা কথা নয়; কিন্তু কবির নিকট হইতে সেটা দৈববাণীর মত আসিয়া, সহস্র সহস্র হতাশ প্রাণে বীর-বাতাসের মত কাজ করিয়াছে।

ফল কথা— এটা লক্ষীমন্তের স্বইচ্ছায় সখের দেশভ্রমণ ছিল না। সময় তামিল করিতে চীনে চলা,— হুকুমের হায়রাণী।

৩৭

কখন যে সমুদ্র-সফর শেষ হইয়া গিয়াছে, কখন যে আমরা 'পি-হো' (Pi-ho) নদীতে আসিয়া পড়িয়াছি, কেহই তাহা বুঝিতে পারি নাই। কেবল বহুদূরে একটা ক্ষীণ আলো আমাদের যেন আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেটা ক্রমেই পাছু হাটিয়া চলিল।

রাত্রি দশটার পর তাহার সন্নিকট হইলাম। দেখি— দু'ধারে ক্ষেত, অদূরে পাঁচ-সাতখানা বড় বড় আটচালা ধরনের বাড়ী, আর আলোটা জ্বলিতেছে একটা জেটির উপর। জঙ্ক্ সেইখানে পৌঁছিয়া যাত্রা-শেষের শঙ্খ-ধ্বনি করিল,— কয়েকটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আমরা 'দুর্গা' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম,— কোমরটা যেন 'আঃ—' বলিয়া উঠিল।

তল্‌পি তল্‌পা লইয়া উচ্চকণ্ঠে 'জয় কালীমাইকি জয়' বলিয়া, ফলোয়ারেরা সবেগে জেটির উপর উঠিয়া পড়িল। ফ্ল্যাটেও তাদের গান-গল্প-গঞ্জিকা বজায় ছিল, স্ফূর্তি ফিকে মারে নাই,— জিত তাহাদেরই।

আমরা যেন আধমরা-অবস্থায় উঠিলাম ; সম্পূর্ণ উদ্যম-উৎসাহ-শূন্য ! ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অবসন্নতা মিশ্রিত একটা অবসাদ আমাদের এমনই করিয়া ফেলিয়াছিল। মনে হইল,— এতদিন পরে আমরা সর্বপ্রকারেই যেন 'তীরস্থ' হইলাম।

সহসা একটা দমকা হাওয়ায় জেটির আলোটাও নিবিয়া গেল। সকলে যেন একখানা বৃহৎ কাল কম্বল চাপা পড়িলাম। গুঁড়ুনি বৃষ্টিও গায়ে পড়িল। সবাই নিঃশব্দ— কেবল মজুমদার ভায়া Corunna-র সেই করুণ কথাগুলি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন ঃ —

'Not a drum was heard, not a funeral note,
Not a soldier discharged his farewell shot'—

কথাগুলি সে-সময়ে বে-সুরো লাগে নাই। আমরাও অভিযানের

আসামী এবং শত্রুপুরীর সীমানার মধ্যেও উপস্থিত। বোসজা বলিয়া উঠিলেন,— 'appropriate (উপযোগী) বটে,— বৃষ্টিও এসে গেছে। তবে এটাকে আমাদের চীনে পদার্পণে পুষ্প-বৃষ্টি বলেও নেওয়া চলে।' বলিলাম— 'এখন আমাদের ইন্দুমতীর শরীর দাঁড়িয়েছে, এ পুষ্পের আঘাত সইলে বাঁচি।'

হঠাৎ কান্নার সুর কানে এলো, দেখি চাটুয্যে কাঁদিতেছে,— (এতক্ষণ বোধ হয় ভাঁজিতেছিল)— 'অনু-মা আর তোকে দেখতে পাবনা,— তুই জেনেছিলি বলেই অত কেঁদেছিলি।' চাটুয্যের ছোট মেয়েটির নাম অন্নপূর্ণা, তার জন্মদিনে চাটুয্যের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল। মুখে বলিলাম— 'ওকি চাটুয্যে, ভগবান কৃপা করে এই অকূল সমুদ্র উত্তীর্ণ করে কূল দিলেন, এখন আবার ওকি?'

চাটুয্যে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল— 'আমি যে কেবলি তার সেই কান্না শুন্‌তে পাচ্ছি। এ সুমুদ্দর কি কেউ দু'বার পার হতে পারে!' তার কথাটা আর ব্যথাটা দুই-ই সত্য।

কবিরা সর্বজ্ঞ ও দূরদর্শী। তাঁরা দুনিয়ার ভাবনা বেদনা পূর্বাহ্নেই ভাষায় বুনিয়া রাখিয়াছেন। মনে পড়িল—

'— চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা-কণ্ঠস্বরে।'

চাটুয্যে মুখে ইহারই প্রতিধ্বনি পাইলাম। তাহাকে সামলানো বরাবরই আমার একটা বড় কাজ ছিল ;— বলিলাম— 'তুমি কি কোন খবরই রাখনা,— আবার সমুদ্র পার হতে হবে কেন? তা হলে এ শর্মাও আসতেন না। তিন মাসের মধ্যে 'হোয়াংহো বর্মা রেল্‌ওয়ে' খুলে যাবে, তখন রেঙ্গুন পৌঁছিতে বড় জোর চারদিন নেবে। যখন এসে পড়া গেছে, মাস ছয়েক দেখে শুনে নেওয়া যাক্ না। তারপর অন্নপূর্ণার তরে যত

ইচ্ছে চীনের পুতুল, চীনে-পটকা নিয়ে ফিরো।' চাটুয্যের অনেকগুলি আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের পর, এ তাল সামলানো গেল ; Ignorance is bliss, আর— অন্ধকারে কেহ কাহারো মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল না,— তাই রক্ষা।

ফল কথা, জেটিতে উঠিবার পর-মুহূর্তেই involuntary shock-এর মত অনেকেরি প্রাণটা অনুভব করিয়াছিল— 'এতদিনে সত্যই স্বদেশ হইতে বিচ্যুত হইলাম, স্বদেশ এখন স্বপ্ন-কথা!' সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও কেমন করিয়া উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সমুদ্রের উপর ছিলাম,— একটা যেন যোগ-সূত্র ছিল ;— ডাঙ্গায় পা দিতেই সেটা ছিন্ন হইয়া গেল। এই নাড়ী-ছেঁড়া আঘাতটা চাটুয্যে চাপিতে পারে নাই।

মৃত্যুর পূর্বে নাকি কাহারো কাহারো অস্বাভাবিক লক্ষণ সকল দেখা দেয়। স্মরণ-শক্তির সহিত কস্মিন্‌কালেই আমার সদ্ভাব ছিল না, দেখি হঠাৎ আজ সে হাজির! রবিবাবুর লেখা, আর বহুদিন দেখা—

"একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতি-শঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লির রব
অরণ্য গভীরে,
দিনান্তের শেষ আলো, দিগন্তে মিশায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
অনন্তের যাত্রা পথে, সুদূরে জ্বলিবে শুধু
প্রদীপ তারার"— ইত্যাদি

আমার মগজে কেবলি সাড়া দিয়া উঠিতেছিল, আর মনে হইতেছিল,— এতদিন পরে সেই 'একদা'টা আজই নয় ত! সমাবেশগুলি সবই ত তুঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

মামীর লোকান্তর ঘটিলে, আমার মাইনর-পড়া মাতুলের মুখেও একদিন কবিতা কুহরিয়া উঠিয়াছিল। বোধহয় সাধারণ কথিতভাষা

মথিত-প্রাণের ভাষা নয়। আবেগের ভাষার বেগগান হইবার দিকেই ঝোঁক্। দেখি— পত্নী-বিরহ্-বিধুর মাতুল আমার একাকী শয্যায় পড়িয়া আওড়াইতেছেন—

"হায় রে যেমতি বরজে সজারু পশি"— ইত্যাদি। আমাকেও তাই আজ পোইট্রিতে পাইয়া বসিয়াছে।

বাঙ্গালীর 'ঘরকুণো' অপবাদটার বিপক্ষে আজকাল কেহ কেহ ব্রিফ্ লইয়াছেন দেখিতেছি। ভালমন্দ জানি না, তবে বাঙ্গালী যে 'ছায়া-ঢাকা কোকিল-ডাকা' দেশে, মায়ার শরীর লইয়া জন্মায়, আর চণ্ডীমণ্ডপের চৌকাঠ ছাড়িতে বেদনায় নিশ্বাস ফেলে, সে-কথাটা অস্বীকার করা কঠিন।

এ জাতের নিকট 'মনিষ্যি না পক্ষী' কথাটার উদ্ভব, নিশ্চয়ই in anticipation (কাজের আগেই) হইয়াছিল। জাতটা জন্ম-ভাবুক,— ভাব্‌তে আর ভাঁজ্‌তে জন্ম কেটে যায়। কোন কিছু না ক'রে, কেবল ব'সে ব'সে ভাব্-ভেঁজে— এত কান্না আর কোন জাত কাঁদেনি। Imagination-কে (কল্পনাকে) এমন সূক্ষ্মতম সীমায় টানিয়া লইয়া যাইতে, আর শরীরে ও মনে তার প্রভাব বা ফল ভোগ করিতে, জগতে এমন আর-একটি জাত আছে কিনা জানি না। দেশটি পর্বতবহুল না হলেও ঝরণাবহুল। কবি-সম্রাট্ বোধ হয় তাই আমাদের একটু সরমের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া সুফল লাভের আশায় লিখিয়াছিলেন—

"যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তা'রেই আঁখিজল সাজে গো॥"

চোখের নমুনা নির্দেশ করিয়া দিলেও এক 'যমুনা'র নাম শুনিলেই আজো ছোটবড় অনেক আঁখিই সজল হইয়া উঠে ও সেই দ্বাপর যুগের যমুনায় যতটুকু জল ছিল, তার এক ফোঁটাও কমিতে দেয় না; কদম্বমূল ঘেঁসিয়াই রাখিতে চায়।

যাহা হউক, চাটুয্যের চোখের জলটা সশব্দে পড়ায় সে ধরা

পরক্ষণেই পট-পরিবর্তন! চাটুয্যে বলিল 'খিদেয় দাঁড়াতে পাচ্চি না!' এই 'ম্যায় ভুখা হুঁ' সুরটা তখন সকলের নাড়ীতেই সমান বাজিতেছিল।

* * * *

যেখান জল ছাড়িয়া উঠিলাম— এইটিই সে লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শ্রুত 'সিনহো',— কিন্তু অন্ধকারে রূপ দেখিলাম না। বিশ গজ তফাতেই কমিসেরিয়েট্ (রসদ্) গুদাম ছিল। উক্ত গুদামের ভারপ্রাপ্ত একটি পার্শী ভদ্রলোক এজেন্ট্‌রূপে পরিচারকবর্গ লইয়া তথায় থাকিতেন। তিনি লোক ও লাণ্ঠান-সহ উপস্থিত হইয়া, মহা সমাদরে সকলকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। এতদিনে জাহাজী মাল ঘরে উঠিল।

দেখি, চাটুয্যের অন্নপূর্ণা, ছপ্পর্-ফোঁড়া আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। চা, চপ্, রুটী, লুচী, পোলাও, কালিয়া সবই প্রস্তুত ;— যেবা ইচ্ছা হয়। পেটে কিছু পড়িতেই, আমাদের দুর্বহ অবস্থাটা কাটিয়া গেল, ক্লান্তিটা শান্তিলাভ করিল,— যাত্রাটাও 'মধুরেণ' শেষ হইল।

চিনের নিদ্রাভঙ্গ

ঊনবিংশ শতাব্দী না শেষ হতেই চিনদেশে একটা বিদ্রোহবহ্নি জ্বলে ওঠে। চিনেরা অত্যন্ত রক্ষণশীল,—নূতন কিছুর নেশা তাদের সহজে ধরতে পারে না। কবে কোনো একস্থানে এসে সেই যে তারা থেমে গিয়েছিল, সেইখানেই বেশ নিশ্চিন্তে আরামে কাটিয়ে আসছিল। প্রকাণ্ড ভূখণ্ড, উর্বর শস্যক্ষেত্র, অগুণ্তি অপগণ্ড, মাছ মাংসের প্রাচুর্য, বিলাস ব্যসন বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমি উত্তরচিনের কথাই বলছি, যেটা ছিল চিনের উত্তমাঙ্গ। রাজাত্মীয় বা পোষ্য আমলা প্রভৃতি রাজসম্বন্ধীরা,—রাজধানী পেকিন্ সহরের সান্নিধ্য-ঘেঁষা সম্ভ্রান্তেরা,—পিকের মতো বহুবর্ণের সিল্কের পেখম বিস্তার করে, আহার বিহার আর আরাম নিয়েই থাকতেন।

ভীষণ শীতের দেশ। তাই পাড়ায় পাড়ায় গরম জলের Bath (Hall) বা স্নানাগার আছে। সেখানে সবার স্বতন্ত্র টেবিল চেয়ার আছে। টেবিলে আঙুর, আপেল, নাসপাতি ফলমূল, চা ও চিনের মদ (সামসু) সাজান থাকে। স্নানান্তে ভদ্রেরা সে সব উপভোগ করেন ও রহস্যালাপ চলে। আর চলে কেশ-বিন্যাসের পরিপাট্য।

যখনকার কথা বলছি তখন চিনাপুরুষদের অতি যত্নের Pig Tail বা গুল্‌ফ-প্রলম্ব কেশগুচ্ছ বা টিকি থাকত, ও কেশ বিন্যাস-কারিরা আড্ডায় আড্ডায় উপস্থিত থাকত। তারা সেই কেশ আঁচড়ে সুগন্ধি সহযোগে 'বিনুনী' করে দিত। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত বা উঁচুনীচু থাকের লোক।

আমাদের দেশে লক্ষপতি বললে—বড়লোক বোঝায়। কোটিপতি না হলে চিনে বড়লোক হয় না। তাঁরা বড় বেরন না, বাড়িতেই থাকেন, সেখানেই সকল ব্যবস্থা রাখেন ; ফল ফুলের বাগান, ঝিল, ঝিলে বেড়াবার বোট ইত্যাদি।

১৯০২/৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তরচিনে—টিন্‌সিন ও পিকিন পৌঁছে সাধারণ লোকদেরই দেখেছিলুম ও হতাশ হয়ে ভেবেছিলুম, মধ্যবিত্তরাই তো শিক্ষায় দীক্ষায় চিন্তায় জগতের প্রাণশক্তি—এঁদেরও আমাদের দশা দ্রুত এগিয়ে আসছে। বেচারিরা বোধকরি ভাবতো,—"কারো কিছুতে নজর দিলেই তো কলহ! আমরা যখন অপর দেশ বা জাতির দ্রব্যে লোভ রাখি না, কিছু চাই না, তখন কারো সঙ্গে বিবাদ দ্বন্দ্বের কারণই থাকতে পারে না। আমরা তো কারো কিছু নিতে যাচ্ছি না ;" ইত্যাদি।

তারা ভাবেনি—সময়ের সঙ্গে সভ্য জাতিদের কত দায়িত্ব, কত চিন্তা, কত কাজ বেড়েছে। শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও শিল্পাদির আদান-প্রদানে অমানুষদের মানুষ না করলে, জগতের উন্নতি হয় না। সে কাজে বলপ্রয়োগেও দোষ নেই। ডাক্তারেরা যেমন রোগীকে বাঁচাবার জন্যে অস্ত্রপ্রয়োগ করে থাকেন ; ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কথা তাদের মাথায় বোধহয় ঢোকেনি। তারা নিশ্চিন্তে কাটাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে জাপান এবং য়ুরোপ মহাদেশের কোনো কোনো সভ্য জাতিরা চিনদেশে কিছু কিছু স্থান সংগ্রহ করে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি আরম্ভ করেছিলেন। তাতে গরিব চিনাদের উপকারও হচ্ছিল, তারা সস্তায় সিগারেট, দেশলাই, বোতাম প্রভৃতি পাচ্ছিল,—ক্রমশ অনেক কিছু।

উন্নত ও সভ্য বিদেশিদের ব্যবহার, কথাবার্তা একটু বেসুরো হয়েই থাকে। বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা—মাস্টারী না করে পারে না। সেটার উদ্দেশ্য না বুঝলেই মন্দ ঠ্যাকে। একদল চিনাদের তা ঠেক্‌ছিলও। তারা চিরকাল বা জন্মাবধি নিজেদের স্বর্গ হতে প্রেরিত স্বতন্ত্র প্রাচীন জাতি বলেই গর্ব রাখে। জগতকে তারা দিয়েছে অনেক কিছু। তাই বিদেশিদের মোড়লী সইতে পাচ্ছিল না। কিন্তু যুগোচিত উন্নতি না করায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল,—জোর করে বিদেশিদের তাড়াবার শক্তিও ছিল না। মিশনরিদের মিষ্ট কথায়, অনেক গরিব চিনা খ্রিস্টান হয়েও যাচ্ছিল ও বিদেশিদের চাকুরি স্বীকার করছিল, তাঁদের সহায় ও শক্তি হয়ে পড়ছিল। চিনা-বিদ্রোহীরা তাদের বিদেশিদের দাস হয়ে সাহায্য করতে নিষেধ করে ও বলে—কথা না শুনলে তাদের ঝাড়ে বংশে নির্মূল করা হবে। গরিবরা

ও যারা সভ্যদের সাহায্যে উপকৃত হচ্ছিল তারা সকলে সহজে তা শুনতে পারেনি। তাই নিজেদের সেইসব লোককেই বিদ্রোহীরা হত্যা করতে আরম্ভ করে। বিদেশিরা তাদের রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করেন। তখন উভয় দলে রক্তারক্তি চলতে আরম্ভ হয়, তাতে মিশনরিও পড়ে মারা।

এতবড় কথা খ্রিস্টান-জগৎ সইবেন কেনো। সভ্য খ্রিস্টান দেশে সাড়া পড়ে যায়। সকল দেশের সৈন্যবাহিনী এসে চিনকে ঘেরাও করে ফ্যালে ও যা করতে আসা তাই করে।

প্রতাপশালী ইংরাজও না গিয়ে পারেন না, তাঁরাও ভারত হতে পাঞ্জাবি, পাঠান ডগরা প্রভৃতি পলটন্ সহ উপস্থিত হন। সেই সূত্রে হুকুম মতো আমাদেরও যেতে হয়,—লড়াই করতে নয়,—ফিরতে পারলে বড়াই করতে, আর বেকায়দায় পড়লে--মরতে।

সেটা হবে কেনো?—হয়নি। তাই, চিনে পৌঁছে যে অবস্থা দেখেছিলুম তারি দু'এক কথা আজ লিখছি। আমরা ১৯০২-এর শেষার্ধে পৌঁছে দেখি, রক্তারক্তির পালা একপ্রকার শেষ। নেড়া-যজ্ঞি চলেছে অর্থাৎ মিটমাটের নিরামিষ মহাস্ত্র চলছে, তাতে অধম পক্ষের রক্ত শুকোয় মাত্র—দেহটা থাকে।

যাঁরা ভেবেছিলেন,—"কারো কিছু তো চাই না, সুতরাং বিরোধের কারণ থাকতে পারে না, নিশ্চিন্ত"—তাঁদের কারো মুখে আর হাসিটুকু পর্যন্ত নাই। যেন সকলেরি সর্বনাশ হয়ে গেছে, বা সর্বনাশ আসন্ন। সকলেই নীরব, চিন্তাকুল, সর্বস্বান্ত। ভাবেনি—উপকার করবার পথ পেলে ভালো লোক ছাড়বে কেনো। ওটা যে ধর্মকর্ম। অজ্ঞানদের প্রতি জ্ঞানবানদের যে কর্তব্য বিস্তর! মা কালীর সিঁদুরের টিপের ভয়ে নীলকমল পালালে চলবে কেনো, ছাড়ে কে? শেষ তার বেয়ালাখানাও চুরমার হ'ল। তাতে হয়েছে কি! দয়া ধর্মের কাজে বাধা দেবার কারো অধিকার আছে কি? কারো সদ্‌বৃত্তির চর্চায় বাধা দিতে নাই।

এ সব জানা থাকলে মিছে দুঃখ করার বা আক্ষেপের কারণ থাকতো না।

চিনেরা নম্বরে আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর। সেটাও

বোধহয় তাদের নিশ্চিন্ত করে রেখে থাকবে। গিয়ে দেখি—আরামপন্থী রক্ষণশীলদের কলুর বাড়ি, অজ্ঞাত শতাব্দীর সেই ঘ্যানঘেনে ঘানি, মাঠে বলরামের সেই পরিত্যক্ত সনাতন লাঙল, বেশ সপ্রতিভভাবে চলছে। দেখে প্রাণটা আশ্বস্ত হ'ল—আমরাই একা নই, মহতো মহীয়ানও আছেন।—All great men are alike—বাঁচলুম। সান্নিধ্যেই জাপানের নব অভ্যুদয়, তাঁরা আবার সম্বন্ধে জ্ঞাতি, জ্ঞাতিদের শুভেচ্ছাদি আমাদের অজ্ঞাত নয় তো! সুতরাং চিনের অবস্থা আশাপ্রদ বলি কি করে! চিনেরা কিন্তু প্রাচীন কৌলীন্য হেতু জাপানকে তুচ্ছই ভাবে!

অনেক দিনের চিন্তা চেষ্টায় নাকি বেরিয়ে পড়েছে—কোন জাতের ভালো করতে হলে সর্বাগ্রে তাদের অভাব জ্ঞানটি বাড়িয়ে দেওয়া চাই। তারপর আর দেখতে হবে না, বলতে হবে না, নিজেদের চেষ্টাতেই তারা সাতদেশ খুঁজে সে সব জোগাড় করে' নেবে, নিতে বাধ্য হবে।

একবার অভ্যাসটা করিয়ে দিতে পারলে সেটা প্রকৃতিতে পরিণত না হয়ে পারে না। চিনকে তখনো জগতের সুসভ্য সপ্তরথী ঘিরে রয়েছে। দৈহিক পরাজয়ের পর, মানসিক প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে মাত্র। মুখে টুঁ শব্দটি নেই, হাসিও নেই, উচ্চকণ্ঠ নেই। কেউ বাড়িঘর-বিষয় সম্পত্তি, বাপ মা স্ত্রীপুত্র খুইয়েছে। সদাই দুর্ভাবনা—আবার কখন কি হয়!

মিটমাটের ব্যবস্থাদি তখন বেশ ধীরে সুস্থিরে চলতে লাগল। আর তাড়া কেনো—তাড়া তো নেই, তাড়া কিসের! পূর্বে যা অনাবশ্যক ছিল, সেই সব সুদৃশ্য চিত্তাকর্ষী মনোহরী পণ্যাদিও জাহাজ জাহাজ বন্দরে এসে ক্রমে চিনাদের অন্দরে প্রবেশ করে আদর পেতে লাগল। কিছুদিনে অভ্যাস পাকা হয়েও গেল।

পূর্বের আরাম তো মুকিয়ে ছিলই, এখন নূতন নূতন আয়েসের বস্তু অনায়াস-প্রাপ্য হল,—সাবান, সুগন্ধী,—ছাতা, দুল্, পিন্ পাউডার প্রভৃতি পেয়ে যেন দুঃখ আর রইল না। সস্তায় স্যাম্পেনের দরিয়া বয়ে গেল। অন্যে এনে দিলে তার চেয়ে আর সুখ কি আছে! সে কথা তো সকলেই বুঝতে পারি, তার মোহে আমরাও তো চিরমুগ্ধ। ভগবানের পরিহাসের

প্যাঁচ এমন, অতবড় শিল্পদক্ষ স্বাধীনজাতির মাথায় কিন্তু এল না যে, এ সবি তো নিজেরা করে নিতে পারি, শক্তটা কি! সবই রয়েছে, নড়েচড়ে করলেই হয়,—পরাধীনও নই, ঠুঁটোও নই। কারো মঞ্জুরির প্রত্যাশায় হত্যাও দিতে হবে না, কিন্তু তা হবে কেনো! আরাম কতো!

অতবড় বুদ্ধিমান জাতের কেউ যে এই অবস্থাটার কথা ভাবছিলেন না, এমন হতেই পারে না। Dr. সান্‌ইয়াৎ সেন তখন বেঁচে, উপায় চিন্তা নিয়ে পাগলের মতো দেশবিদেশে ছুটোছুটি করছিলেন, লোককে বোঝাচ্ছিলেন,—মানুষের মতো বাঁচতে বলছিলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। এ যুগে নিজের উদ্যমে নিজের কারখানায় সব করা চাই, নচেৎ বাঁচোয়া নাই। ইত্যাদি।

দেহসর্বস্ব অতিকায় দেশের আর কিছু থাকুক না থাকুক, নানা দল ও বিভাগ বিচ্ছেদের অভাব থাকে না। তাদের একমতে আনতে ভগবানও পারেন না। বজ্রপাত ভিন্ন তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

একটা কাণ্ড ঘটায় অর্থাৎ সহসা জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করায়, ও চিনের উত্তমাঙ্গগুলিতে হাত দেওয়ায় আজ চিনের চমক ভেঙে চৈতন্য এসেছে। এখন সংবাদপত্রে দেখি সেই আরামপন্থী চিন অন্যের বা জ্ঞাতীর গর্ভে স্বাধীনতাটা গমনোন্মুখ দেখে—যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রীপুত্র পরিজন যোগে এক হয়ে নানা ক্লেশ, নির্যাতন, অনাহার, অনিদ্রা, উপেক্ষা করে, জাপানের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনিময়ে যে ভাবে লড়ছে, তা আজ জগতের বিস্ময়।

সেই নিশ্চিন্ত চিনের আজ দেশজ্ঞান জেগেছে। গত কয় বৎসরের মধ্যে সে যেন শতবর্ষ এগিয়ে পড়েছে—সব দিক দিয়ে। তার অবচেতনার সিংহদ্বার মুক্ত হয়েছে।—আমার দেশ, অন্যে আজ কোন অধিকারে নিতে চায়—"আমরা কি মানুষ নই, অন্যের এ দস্যুবৃত্তি সইতে হবে নাকি? অন্যের দাস হয়ে তাদের আদেশ মতো থাকতে হবে নাকি?" এখন নাকি এই ভাব।

কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম যে নেই, সব যে সায়েন্সের খেলা, কলকব্জার কৌশল! তা হোক লোক আছে, হাত পা আছে, প্রাণ আছে,

ইচ্ছা থাকলেই হবে। তা বলে দেশকে পরের হাতে তুলে দিয়ে অন্যের তাবেদার হয়ে থাকতে হবে নাকি? এমন প্রাণ থেকে দরকার! এ জনবলের অর্থ কি? যারা সম্মুখ সমরে অনায়াসে দু'কোটি প্রাণ দিতে পারে, ভগবান তাদের উপায় করেই দেবেন। এইরূপ একটা বিশ্বাসে তারা নেবে পড়ে থাকবে।

তারপর যা হয়েছে ও হচ্ছে, সে সংবাদ সকলেই পাচ্ছেন। সেই চিন এখন ব্রিটন্ আমেরিকা ও রুশের সঙ্গে এক পংক্তিতে উল্লিখিত ও সম্মানিত। সকলের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি প্রবল ও একমুখী হলে উপায় এগিয়ে আসে, অসম্ভব সম্ভব হয়। কিন্তু বিভীষণ থাকলে যে হয় না!

চিনের স্মৃতি

চিন-জাপান সংঘর্ষ, উপস্থিত হওয়ায়, আজ অনেক কথাই মনে পড়ে। সে প্রায় ৩০ বছর পূর্বের কথা। যখন ১৯০৪ ফেব্রুয়ারিতে রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন আমরা উত্তর চিনের টিনসিনে উপস্থিত।

দুনিয়ার যত শ্বেতজাতি ১৯০০ সালে বদ্ধপরিকর হয়ে চিনের বিপক্ষে অভিযান করেন, যেহেতু তারা তাদের রাজ্যে বিদেশির গন্ধ সইতে পারছিল না, ধর্মপ্রচারকদের সদুপদেশ ও সদিচ্ছার কদর্থই করে বসেছিল।

চিনারা মহা রক্ষণশীল জাত। তারা নিজের সনাতন আচার বিচার সংস্কার নিয়ে থাকতে চায়। অন্যের মোড়োলি সইতে চায় না। তাদের ধারণা তাদের চেয়ে আবার বোঝে কে? —"তোমাদের কে ডেকেচে, —আমাদের তরে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেনো?" তারা বোঝে না, —জ্ঞান বিতরণ, আঁধার মোচন,—মহৎদের ধর্ম। রোগী আর কবে অস্ত্রোপচারে রাজি হয়—কিন্তু অবোধের উপকারের জন্য সেটা জোর করেই করতে হয়।

সহজে বাধা না দিতে পেরে, দুষ্টেরা ক্ষিপ্ত হয়ে শেষে খুনখারাপি করে বসে। তার পরিণাম,—সমগ্র শ্বেতজাতি রোষে রাঙা হয়ে চিন অভিযান করেন, এবং অস্ত্রোপচারও আরম্ভ হয়।

সেই সূত্রে এই শিষ্টেদেরও অর্থাৎ আমাদেরও ডাক পড়ে। অভিযানে জান দেবার মতো প্রাণ নিয়ে নয়, বরং প্রাণটা যাতে ঘরে ফিরে আসে, তাই কেউ রাম, কেউ আল্লা, কেউ দুর্গা, কেউ মা কালীর কাছে সকাতর পিটিসন পেস করে পা বাড়াই। প্রাণভয়ে ডাকগুলো বোধহয় বেসুরো বলেনি,—ঠাকুরদের কানে ধরেছিল।

পৌঁছে দেখি,—অষ্টবজ্র অনেক চিনেকে স্বর্গে পাঠিয়ে চটপট বালাই

মিটিয়ে ফেলেছে—স্থানে স্থানে পঞ্চভূত পচছে, একটু আধটু দুর্গন্ধ ছাড়চে মাত্র। এখন লড়াই চলছে লেখাপড়ার, অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে মাৎ করবার মতো চালের ও ছলের।

আমরা বিজয়ীর মতো, উপস্থিত হয়ে, চিনেদের ফেলে-পালানো সাজানো বাড়িতে আরামসে শয্যা পাতলুম। তাসের খোঁজ পড়ল। আমরা রাজবাড়ির আমলা, সাজসজ্জা আহার্যের অভাব নেই প্রাচুর্যই সমধিক। আপিসের কাজ মামুলি ; অভাব কেবল—জলখাবার ঘরে—ভোলা বেটা নেই যে গুড়ুক খাওয়াবে, আর মাসকাবারে হাসতে হাসতে হুঁকোটি হাতে দিয়ে সাড়ে সাত টাকার সিঙাড়া আর রসগোল্লা ফর্দটা শোনাবে!

ফাঁক পেলে পাছে বাড়ির চিন্তা আসে—কেউ তো আর পরিবার plus তিনটি কাচ্চাবাচ্চার কম ফেলে আসেন নি, বরং তদতিরিক্ত (অধুনা আশঙ্কা কমলেও) posthumous-এর দুশ্চিন্তাও ছিল,—তাই ফাঁক মারবার জন্য club, টেনিস্—তাস প্রভৃতিও ক্রমে অবলম্বনে দাঁড়াল। এই 'ফাঁক-ভরাট কল্পে সপ্তাহে সপ্তাহে টি-পার্টিও চলল। ফলকথা, লড়াই ক্রমে 'লাক্‌সারিতে' এসে গেল। কেবল অসুবিধা হল, 'ফলোয়ার' আর চাকর বাকর নিয়ে। মদের ডিউটি না থাকায়, বাসায় ফিরে তার বিউটি দেখতে হত নিত্যই—তারা হুইস্কি আর ছুঁতো না, —সেটা তাদের কাছে তখন ছোটলোকের খাদ্য ;—সাতসিকের শ্যাম্পেন্ মেরে সব লাশ্। কাজেই চিনে-বয় (boy) রাখতে হয়।

যিনি পাঠশালা পেরিয়ে কোনোদিন একপৃষ্ঠা বাংলা লেখেননি, তিনিও এখানে regular সাহিত্যচর্চা করতে বাধ্য হন। চিনেরা মস্ত-বাবু-জাত, তাদের চিঠির কাগজ, নানা চিত্রে-বর্ণে সুরঞ্জিত,—roll হিসাবে বিক্রি হয়। বড় বাড়ির মানত-প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সোনার চাঁদ ছেলেদের সেকেন্দরী কোষ্ঠিও অতবড় হয় না। প্রতি সপ্তাহে মেল (mail) যায়। প্রত্যেকে সেই (Mail day) মেল-ডে-তে ৩।৪ ঘণ্টা একাগ্র মনে সেই রোল্ মেলে সাহিত্যচর্চায় নিবিষ্ট হন। তখন হতাশের আক্ষেপের বিশিষ্ট লাইনগুলির খোঁজ পড়ে। 'ভগ্নহৃদয়' নিয়ে স্মৃতি চর্চা চলে, এবং

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' কাজে লাগে।

এইভাবে দিনগুলি মন্দ কাটছিল না। এমন সময় অকস্মাৎ রুশ-জাপান যুদ্ধের উৎপাত সকলকে চমকে দেয়। এত সুখ সইবে কেন!

টিন্‌সিনে তখন জগতের সব লড়ায়ে-জাতগুলিই উপস্থিত। প্রত্যেকে বেশ খানিকটে করে যুৎসই জায়গা দখল করে বসে আছেন। কিন্তু ৭ ফেব্রুয়ারি রুশের একটি প্রাণীকেও টিন্‌সিনে আর দেখতে পেলুম না। শুনলুম রাতারাতি তারা কোথায় সরে পড়েছে। জাপানীরা ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে তাদের খোঁজে।

আশা উত্তেজনা উৎসাহ—তাদের সবার মুখে সুস্পষ্ট। টাকুরোডেই (Taku Road) জাপানি দোকানদার ও ব্যবসাদারের আড্ডা :—মণিহারী, স্টেশনারী, মিসলেনিয়াস্, ছবি, সিগারেট, রেশমীফুল, পাখা, মাদুর প্রভৃতির ব্যবসায়ই বেশি। আজ বেচা-কেনা বন্ধ, সেদিকে তাদের মনই নেই। কেহই চিন্তিত বা বিমর্ষ নয়, মুখে বরং ক্রূর হাসি।

কয়েকমাস পূর্বে 'ওকুমুরাকে' (একটি জাপানি ছেলে) যেদিন আমাদের বাসায় প্রথম দেখি,—তাকে অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন, মলিন, দীন জাপানিযুবক—beggar boy বলাও চলে—ভাবেই পেয়েছিলুম। পরিচয়ও তাই পাই। রুমালে বাঁধা একটি কাগজের বাক্সে কতকগুলি সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে এসে অভিবাদনান্তে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে—

—"আপনি সিগারেট ব্যবহার করেন কি?"

"করি," শুনে জিজ্ঞাসা করে "কোন্ ব্র্যান্ড্?"

বলি—"জাপানের পিকক্ ব্র্যান্ড।"

শুনে সুখী হয়ে বলে—"আমার কাছে নিতে আপনার আপত্তি আছে কি? নিলে আমাকে সাহায্য করা হয়। আমি অত্যন্ত গরীব, এক দোকানদার বন্ধু আমাকে এই বাক্সটি বেচতে দিয়ে সাহায্য করেছেন, লাভ নেবেন না ; বিক্রি করে তার ন্যায্য দাম তাকে ফিরিয়ে দিলে, আবার মাল পাবো ;" ইত্যাদি।

বাসায় আমি ও আমার অফিস-বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার

থাকতুম এবং দুজনে কম্‌সে কম্ দশ ডলারের (চিনের ডলার তখন ১॥/০ করে) সিগারেট পোড়াতুম। উত্তর-চিনের হাড় ভাঙা শীতে—স্নানাহার আর নিদ্রার কয় ঘণ্টা ছাড়, টানের বিরাম ছিল না।

ওকুমুরা বড় খদ্দেরই পেলে। তিন চার মাস নিয়মিত নিজে এসে দিয়ে যেত। পরে টাকুরোডে একখানি ছোটখাটো দোকান খোলে। সেখানে থেকেও বিস্কুট, মাখন, কাগজ, সিগারেট, এসেন্স প্রভৃতি নিতে আমরা বাধ্য হই, ছোকরাটির অনুনয় বিনয় এড়াবার উপায় ছিল না।

রুশ জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হবার সপ্তাহ দুই তিন মধ্যে, সে একদিন তার বিধবা মা'কে সঙ্গে করে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত।

"কি খবর",—জিজ্ঞাসা করায় শুনলুম, সে যুদ্ধে যেতে চায়, কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি দূরপ্রসারি নয় বলে, ডাক্তার তাকে পাস্ করেনি। এই কথা বলতে বলতে তার চোখে ছলছলিয়ে এল।

বললুম,—"বেশ তো দোকান করচ',—ইচ্ছে করে যুদ্ধে যাওয়া কেনো? সকলকেই কি যুদ্ধে যেতে হবে? তোমার মা বৃদ্ধা—তাঁকেও তো দেখা চাই।"

শুনে সে নিজে কিছু বললে না, আমার কথাগুলি মাকে শোনালে। মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "আমার আর এক ছেলে আছে, তার বয়স মাত্র ১৫, তাকে ওরা পাঠাবে না—সে দোকান দেখতে পারে। আমার উপযুক্ত ছেলে থাকতে সামান্য কারণে সে এই বিপদের সময় দেশের কাজে লাগবে না? আমি মুখ দেখাবো কি করে? আপনি দয়া করে এমনভাবে কিছু লিখে দিন যাতে ওকুমুরার যাওয়া হয়। সে অন্য কেন্দ্রে গিয়ে দরখাস্ত দেবে।" ইত্যাদি বলে কেবলই হাতজোড় করতে লাগল।

যার মা এই কথা বলে, তার ছেলেকে আর বোঝাব কি? সুরেশ ভায়া বললেন—"বাঁড়ুয্যে ওরা বাঙালি নয় যে ২৫ টাকার কেরানি হয়ে বেঁচে থেকে বাপের নাম বজায় রাখবার কথা নির্লজ্জের মতো মুখে আনবে,—এখানে গয়াও নেই যে পিণ্ডি দেবার পরোয়ানা আছে। ওদের দেশ আছে, দেশের জন্য প্রাণও আছে। পারো উপায় করে দাও।"

১৮ বছর বয়স থেকে দরখাস্ত লেখার মক্সই করা হয়েছে। ফল হোক না হোক--মাথা ঘামিয়ে মুসুবিদে করে, লম্বা এক দরখাস্ত লিখে দিলুম।

দরখাস্ত হাতে পেয়ে ওকুমুরা বললে—Bless me Lama. (বেশি পরিচিতেরা আমাকে Lama—'লামা' বলতো)—তখন আমাদের মনের অবস্থা—"এরা গেলে যে বাঁচি!" 'যাক্—তারা খুসি হয়ে, হাঁটু গেড়ে অভিবাদন জানিয়ে 'বানজাই' Victory, বলে চলে গেল। অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলুম,--"দেশ কাকে বলে জানি না, কিন্তু এক ছটাক জমি নিয়ে খুনোখুনি,—মামলা মকর্দমা করে থাকি—এবং তার জন্য ঘরের পয়সা পরকে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েও থাকি। ১৯ বছরের ছেলে সাধ করে কাঁচা মাথা দিতে চায়! পাঠায়নি বলে মা কাঁদে! স্বপ্ন, না গল্প, না অভিনয়?"

সুরেশ ভায়া বললেন—"এতো ফ্যাঁসাদও জোটাতে পারো, কোনোদিন তুমিই মজাবে বাঁড়ুয্যে"...

"মরতে যাবে যাক্—আমাদের বাসায় ক্যানো? মাথাটা খারাপ করে দিয়ে গেল। ও মাগী ওর মা নয়। তুমি উচ্ছুগ্‌গু করে দিলে. এ পাপ তোমাকেও অর্শাবে। রুশের এই তোড়ের মুখে ও গেছে কি মরেছে—

শুনে শিউরে উঠলুম! এ সব আধ্যাত্মিক কথা তো আমার মাথায়ই আসেনি? সুরেশ তো সত্যি কথাই বলেছে, আমিই তো ওকে মরতে সাহায্য করলুম।"

ব্যাপারটা গুরুত্ব, বেলার সঙ্গে বেড়েই চলল,—যেন কি মহাপাতক করা হয়েছে। একথা একবারও মনে হল না যে, সে নিজের দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে—যেটা তার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের কাছে ও কর্তব্য কোন পুরুষে দেখা দিয়েছে কি যে, তার সত্যকার spiritটা সহজে অনুভবে আসবে? সারাদিনটা মনমরা হয়েই কাটল।

আমাদের বাসাটা ছিল 'North China Indian Recreation Club"-এর গায়েই। ক্লাবে আড্ডা দেবার পর বাঙালি বাবুরা আমাদের বাসা হয়ে ফিরতেন। সে রাতেও দু'জন এলেন।

রুশ-জাপান যুদ্ধের কথাই চললো। জাপান জলে স্থলে ক্ষিপ্তের মতো

লড়াই লাগিয়েছে—মরিয়ার মতো এগুচ্ছে, কোনো বাধাই তাদের কাছে বাধা নয়। কোরিয়া ভেদ করে যাবে তাদের আপত্তি শুনবে না। সব জাতই সাগ্রহে সেটা লক্ষ করছে।

সবার চেয়ে সমস্যা ইংরাজদের,—তাঁরা জাপানের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে ally—বন্ধু। আবশ্যক হলে পরস্পরকে সাহায্য করতে উভয়ে বদ্ধ ও বাধ্য। কি হোটেলে, কি অফিসে, কি ক্লাবে ওই কথা, ওই প্রসঙ্গ, অবশ্য সন্তর্পণে ফিস্ ফাস্! গোল বেঁধেছে—রুশ য়ুরোপের শ্বেত জাতি হয়ে। জাপানিরা এশিয়ার লোক, রংয়েও নিকৃষ্ট,—তার এ ধৃষ্টতা কেনো? স্পর্ধারও সীমা আছে। —তাই তো...এই ভাব।

একে নবোদ্যম, তায় যুদ্ধের প্রথম মুখ, জাপান উন্মত্তের মতো ছুটেছে। দেখতে দেখতে সংগ্রাম জেঁকে উঠল, দিন দিন ভীষণ আকার ধারণ করতে লাগল। জাপান এগুচ্ছে—এ সংবাদটা কারুর বড় উপভোগ্য হচ্ছিল বলে টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

যাই হোক্—আমাদের কিন্তু মুখ ও বুক দুই শুকোচ্ছিল, যেহেতু আমরা ally-র দাস, পাশ কাটাবার পথ নেই। মরার বাড়া গাল নেই বটে, সেটা দেশে হলেও সম্ভব হতে পারতো, এখানে চাকরি ছেড়ে এক সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া চলে।

বেলঘর নিবাসী অমূল্যধনবাবুই টীকা টিপ্পনীসহ এই সব সংবাদ শোনাচ্ছিলেন। তিনি পেকিনে থাকতেন, মধ্যে মধ্যে টিন্‌সিনে আসতেন, কারণ হেড অফিস ছিল টিন্‌সিনে।

অমূল্যবাবু ছিলেন বেশ কাজের লোক ; দশজনকে নিয়ে চলতে পারতেন। লোককে সাহায্য করতে, সাহস, আশা ও সান্ত্বনা দিতে তৎপর। বিদেশে বিপদের মধ্যে এরূপ একটি লোক মেলা কম কথা নয়। ভয় লাগিয়ে দিতে যেমন, আবার তার কাটান-ছিড়েন বাতলাতেও তেমনি। পেকিনে Legation দূতাবাসগুলির অধিষ্ঠান। সুতরাং অমূল্যবাবুর কাছে সকলেই সঠিক সংবাদের আশা করতো, তিনিও গম্ভীরভাবে বেশ মাতব্বরের মতো শোনাতেন।

আজ "চীনযাত্রীর" খ্যাতনামা চাটুয্যেও হাজির। সে ছিল মহাভীতু

লোক,—পরিবার কাছে না থাকলে সম্পূর্ণ অসহায়, একদম বেকাম ও অচল। কাপড়ের গুদোমের (Clothing Store-এর) ভার পড়েছিল তার উপর। লক্ষাধিক টাকার গরম পোশাক-পরিচ্ছদের বিলিব্যবস্থা তার হাতে। তায় সে বিষম সন্দিগ্ধচিত্ত, সর্বদাই কে কি সরালে—এই চিন্তা। চিনেকুলিরা ভয়ঙ্কর চোরও। সে বলতো—"পরিবার কাছে থাকলে আমায় কিছু দেখতে হতো না, কাপড় গোছাতে, কাপড়ের হিসাব রাখতে ওরাই ভালো পারে। একখানা রুমাল কেউ সরাক দিকি!" কথাটা অস্বীকার করতে বোধহয় বাঙালি জজেরাও সাহস পাবেন না।

চাটুয্যে একপাশে একখানি চেয়ারে চুপটি করে বসে রাবণের চিতার মতো জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে হাঁ করে উদাসভাবে চেয়ে অমূল্যবাবুর কথা শুনছিল। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসও ছাড়ছিল। সেই সঙ্গে একবার মধুসূদন নামটি কণ্ঠ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ায়, অমূল্যবাবু বললেন—"এটা মধুসূদনের এলাকার বাইরে চাটুয্যে, এখানে নিত্য দেবতার নাম বদলায়, Brigade order-এ যা বলে দেয় সেইটি স্মরণ রাখা চাই, আজ...ইত্যাদি।

অসময়ে সহসা গুডুম করে বন্দুকের আওয়াজ হওয়ায়, সকলে চমকে গেলুম, কথা থেমে গেল। সত্রাসে চাটুয্যে দাঁড়িয়ে উঠে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কি বাঁড়ুয্যে মশাই? বন্দুক ছোঁড়ে কেনো?"

অমূল্যবাবুই জবাব দিলেন—"আজকাল বড় কড়াকড়, বোধহয় কেউ Challenge-এর জবাব দিতে পারেনি, তাকে গুলি করলে"...

চাটুয্যে কম্পিত কণ্ঠে বললে—"পারেনি বলে' একেবারে মেরে ফেলবে নাকি?"

"ফেলবে না? শত্রুপুরী, কে কি উদ্দেশ্যে চলেছে, কে জানে?—তাই তো বলছিলুম—Watch-wordই এখানকার দেবতার নাম। আজকের মহামন্ত্র জানা আছে তো? মনে করে রাখ—Robbers"...

চাটুয্যে আমার দিকে চেয়ে বললে—"আমি আজ এইখানেই থাকব বাঁড়ুয্যে মশাই"...

"বেশ তো সেই ভালো"...

অমূল্যবাবু দেখতেও যেমন, হাতে বহরেও তেমনি,—সাহসী ও নির্ভীক। চাটুয্যেকে বললেন—"চলো না আমি পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি"...সে গেল না।

অমূল্যবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন "বাঁড়ুয্যে মশার কি শরীর ভালো নয়? তেমন কথা নেই, একটা সিগারেট টানতেও দেখলুম না"...

সুরেশ তাড়াতাড়ি বললে—"ও-আপনি শোনেননি বুঝি! উনি যে আজ একটা ভারী গর্হিত কাজ করে ফেলেছেন,—একটি ১৯ বছরের ছেলেকে যমের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।" এই বলে সকালের ঘটনা শোনালে।

রাত হয়েছিল—অমূল্যবাবু তার ওপর আর কারুকার্যের চেষ্টা না পেয়ে—সংক্ষেপেই সারলেন ; বললেন,—"তাতে হয়েছে কি? তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধাবার কর্তার মহাপাতক রাখবার স্থান মিলতো না। দু'দিন অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন ও জাতির মহিরাবণটি পর্যন্ত দেশের জন্য প্রাণ দিতে ছুটবে—এখনি হয়েছে কি? ওদের প্রত্যেকটি বামন-অবতার।" এই বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

চাটুয্যের দুঃখের কাহিনি ও বাড়ির অবস্থাদি শুনতে এবং সঙ্কট সময়ের কর্তব্য স্থির করতে অর্ধেক রাত কেটে গেল। সে বোধহয় ঘুমুতে পারেনি। শুনলুম, ভোর হতেই নিজের গুদোমে চলে গেছে।

ক্রমে একটা চিন্তার ও আতঙ্কের ভাব সকলের মনেই দিন দিন সুস্পষ্ট হতে লাগল।

জাপানের জয় প্রার্থনাটাও সঙ্গে সঙ্গে সকলে তখন করতে লাগলেন, পাছে ally-র না টান ধরে। কাছে লোক মজুদ থাকতে দূরে তো আর খুঁজতে হবে না। তা ছাড়া জাপান তখন সমুদ্রময় 'মাইন' ছড়িয়ে ফেলেছে। জলপথ বিপদসঙ্কুল, জাহাজ চলাচল নিরাপদ নয়। হাতের পাঁচ নিয়েই খেলতে হবে।

জলে স্থলে সংগ্রাম তখন তুমুল দাঁড়িয়েছে। এই বজ্র-বাঁটুলের জাত রুশকে নিত্যই ঠেলে নিয়ে এগুচ্ছে—সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে! আপিসের কাজকর্ম 'নেম' রক্ষায় চলেছে , সারাদিনই সংবাদপত্র আর

বুলেটিন বেরুচ্ছে, টেলিগ্রাম আসছে। উপরন্তু আমাদের 'রয়টার'—বাবুর্চি, খানসামা আর প্যায়দাও আছেন। তারা রিপোর্টগুলো এমন মুখ করে, শোনায়—পীলে চমকে দেয়, রক্ত শুকোয়! বড় সাহেবদের Table talk নাকি তাদের Stock ; শুনে আমরা তটস্থ।

জাপানিরা যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তারা ফেরবার জন্য যায় না—জয়ের জন্যই যায়। তারা লোক বাঁচিয়ে লড়বার কায়দাকানুন মানে না—সে হিসেব রাখে না। যুদ্ধ জয় করতে হবে, এই মাত্র জানে ও মানে। সুতরাং তাদের হটাবে কে? Honourable retreat শুনলে ঘৃণাব্যঞ্জক হাসিই হাসে। কিন্তু সুসভ্য দেশের বড় বড় জেনারেল ও ধুরন্ধরেরা এটাকে মূঢ়তা বলেন! এই মূঢ়তাই রুশকে কোণ-ঠাসা করেছিল।

কয়েক মাস তখন কেটে গেছে। এই মৃত্যুলীলা অনেকটা সয়ে সহজ হয়ে এসেছে।—বড় বড় বীরের বীরত্ব কাহিনি এবং নগণ্য সাধারণের মহত্ত্ব তখন "কিং-কোডো" কোম্পানির সচিত্র মাসিকের মার্ফৎ সবিস্ময়ে পড়া যাচ্ছে, আর দেশ জিনিসটা কি ও দেশ-প্রাণতা কাকে বলে, দেশপূজার মন্ত্র ও উপকরণ কি, দেখা যাচ্ছে। এই অদ্ভুত-কর্মারা যা দেখাচ্ছে তাই অভূতপূর্ব।

অন্যান্য লড়ায়েজাতের অভিজ্ঞেরা বলছেন,—'ট্রান্সভাল্ যুদ্ধের বুয়োরদের রীতিনীতি এরা অত্যল্প সময়ে আয়ত্ত করে কাজে লাগাচ্ছে। শ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ই এদের প্রধান অস্ত্র ও মূলমন্ত্র। অধিকন্তু এদের মধ্যে প্রাচীন সামরিক প্রবাদ ও ক্ষত্রবীর্য, বর্তমান, তাই আজো...কিন্তু...ইত্যাদি।

অহরহ এই বিরাট হত্যাকাণ্ডের আলোচনার মধ্যে ওকুমুরার নাম মাথা থেকে মুছেই গিয়েছিল। তাদের 'টাকু-রোডের' দোকানও উঠে গেছে।

একদিন অপিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি আমার নামে একখানা ছবি-কার্ড বা ছবি-পোস্ট-কার্ড এসেছে। সেটা বোধকরি আগস্ট মাস। সামান্য দু'ছত্র লেখা। পড়ে দেখি—ওকুমুরা লিখেছে—

Oh—How pretty Japans Victory and Lady—
From—y—Okumura—
Newchwang

নিউচাং স্থানটি 'পোর্টআর্থারের' সন্নিকট।

যাক—বাঁচলুম, ছেলেটা বেঁচে আছে। আরো দু'মাস পরে হারবিন্ থেকে আর একখানা পাই। তারপর আর পাইনি।

পত্র দু'খানি প্রায় ৩০ বছর আমার কাগজপত্রের মধ্যেই পড়েছিল। দ্বিতীয়খানি আজ দেখতে পাচ্ছি না, প্রথম কার্ডের টিকিটখানিও ড্যাম্প লেগে কোথায় খসে পড়েছে।

কেদারনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

অন্যত্র কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা নিবেদন করেছেন। দেখা যাচ্ছে ১৯০২ সালের ৩ জুলাই মাসে (অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দর জীবনাবসানের আগের দিন) চিনযাত্রা শুরু করে ১৯০৫ আগস্ট মাসে তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু এই তিন বছর চিনের অভ্যন্তরে কি দেখলেন সে বিষয়ে এই বইতে তিনি নিশ্চুপ।

অন্যান্য কাগজপত্তর উলটে তাঁর আর একটি বইতে ('স্মৃতি-কথা') চিন সম্পর্কে দুটি ছোট প্রবন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। একটি নাম 'চিনের স্মৃতি' ও অন্যটি 'চিনের নিদ্রাভঙ্গ'। কেদারনাথের নিজের কথা অনুযায়ী ভারতী পত্রিকায় প্রবাস থেকে 'চিন প্রবাসী' পত্র নামে দুবার লেখেন।

এই লেখা দুটি প্রবন্ধ আমার দেখা হয়নি, তবে 'চিনের নিদ্রাভঙ্গ' এখনও পাঠককে অভিভূত করবে। সরকারি ডিসিপ্লিনের চাপে, চাকুরে লেখক সব কথা বলতে পারেননি, তবু কিছু ভাববার জিনিস তিনি সাহসের সঙ্গে উত্থাপন করেছেন। সেই লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই আমাদের চিন অনুসন্ধান এবারের মতন শেষ করা যেতে পারে।

কেদারনাথ লিখছেন "ভীষণ শীতের দেশ। তাই পাড়ায় পাড়ায় গরম জলের স্নানাগার আছে।...যখনকার কথা বলছি তখন চিনা পুরুষদের অতি যত্নের পিগটেল বা টিকি থাকত, কেশবিন্যাস করিয়া আড্ডায় আড্ডায় উপস্থিত থাকত।...আমাদের দেশে লক্ষপতি বললে—বড়লোক বোঝায়। কোটিপতি না হলে চিনে বড়লোক হয় না। ১৯০২/৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর চিনে-টিনসিন ও পিকিঙে পৌঁছে সাধারণ লোকদেরই দেখেছিলুম ও হতাশ হয়ে ভেবেছিলুম, মধ্যবিত্তরাই তো শিক্ষায়-দীক্ষায়, চিন্তায় জগতের প্রাণশক্তি—এঁদেরও আমাদের দশা দ্রুত এগিয়ে আসছে!"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। ১৮৬৩ সালে জন্ম

নিয়ে তাঁর দেহাবসান ১৯৪৯ সালে। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন তিনি উত্তর চিনে। এই যুদ্ধের কথা পরবর্তীকালে তিনি কোথাও লিখেও থাকবেন। প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত সেই লেখাগুলি খুঁজে পেলে ভারত-চিন সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও কিছুটা স্পষ্ট হবে।